অতি বড় ঘরণী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলকাতা-৭০০০০৯

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

সকাল থেকেই মিনুর তর সইছিল না। কখন দুপুর আসবে। কখন সে কাটাকলের স্টপ থেকে চৌত্রিশ বি ধরবে। না পেলে বত্রিশ। নয়তো তেতাল্লিশ। এসব বাস এসপ্ল্যানেডে শেষ। সেখান থেকে বেহালার বাস। ট্রাম ডিপোয় নেমে সে হেঁটেই যাবে। পোলার ফ্যানের কাছে ছোটবাজার। তারপর দু'টো বাড়ি। শেষ বাড়িটার গা দিয়ে চৌধুরী বাড়ি যাবে। এ বাড়ির বড মেয়ের শ্বশুর বাড়ি। সেখানে অ‍্ি অবশ্য ছোড়দির সেজেগুজে রেডি হয়ে থাকার কথা।

তারপর দু'বোন মিলে সাত নম্বরে চেপে ফাঁড়ি। সেখান থেকে গড়িয়ার দিকে রাণীকুঠি পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। ওটা বড়দি আর সেজদির পাড়া। চাই কি ছোড়দা কাল রাত থেকেই ওখানে মজুত। নিশ্চয় আজ কাজে বেরোবে না ছোড়দা।

ঠিক রাণীকুঠি নয়। ওখান থেকে মিনিট পনের পায়ে হেঁটে তবে শ্রী কলোনী। সেখানে বিরাট জমজমাট কারবার। গলিতে গলিতে বাড়ি। চায়ের দোকানে গজল্লা। বোমা ফাটে মাঝে মাঝে। সরু সরু বাঁধানো পথ। বড় রাস্তায় এসে পড়তে পারলে চার চারটে সিনেমা হল। আর অনবরত রিক্সা সাইকেলের প্যাঁক প্যাঁক।, মিনুরা অবশ্য তাতে চড়ে না। চড়লেই একটাকা দেড়টাকা। একটা টাকা কি কম? এখন একটা ডিম কলকাতায় একটা টাকা। অথচ ওদের দেশে—সাগর বাজারে সেই ডিমই একটা সত্তর পয়সা। সেখানেও মিনুরা ডিম কেনে না। ডিম তো ওদের বাড়িতেই হয়। মিনুর মা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। যে হাঁসটা বা মুরগিটা তা দিতে বসলো তার খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠে যায়। সামনে পান্তা দিয়ে রাখলেও খায় না। তা দেবার নেশায় ঝিম মেরে বসে থাকে। জোর করে খাওয়াতে হয় তখন।

ও মিনু—চা দিবি না?

এই তো জল চাপাবো মেসো।

মেসো মেসো করবি না।

তাহলে কি বলে ডাকবো? তুমি তো বুড়ো!

এক চড় খাবি। মেলা বক বক করবি না। ত্যাখ তো মাসি উঠলো কি না—

মিনু হেসে ফেললো। উঠেছে। বাথরুমে। তোমার বউ যদি মাসি হয়—তুমি তো মেসো।

যা চা করে আন। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চায়ের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাবো বলে সেই কখন থেকে বসে আছি।

এই তো দিচ্ছি। বলে মিনু রান্নাঘরে এসে চায়ের কৌটো পাড়লো। এ বাড়িতে সে আজ মাস তিনেক। বড়দি সেজদির পাড়া থেকে এ জায়গা অনেক দূরে। তবু মিনুর ভাল লাগে। সে ফ্রকের একটুখানি দিয়ে সাবধানে গরম কেটলি নামালো। তারপর গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে চা ভেজাতে বসলো।

চা ভেজাতে ভেজাতেই মিনু জানালা দিয়ে আকাশে তাকালো। শ্রাবণ মাসের আকাশ। মেঘে জমজমাট। আজ ওখানে রাখী পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে কি করে?

ও মিনু—

আমায় এখন ডেকো না। চা করছি।

কাগজ এসেছে। চশমা দিয়ে যা—

মিনু একছুটে এসে বলল, এত যদি ডাকো মেসো তবে কাজ নষ্ট হয় না?

এটাও তো তোর কাজ। যা বারান্দায় কাগজ পড়লো এইমাত্র।

তেতালার ওপর এই ফ্ল্যাটটা খুব ভাল লাগে মিনুর। এর আগে সে এক মাড়োয়ারি বাড়ি ছিল। তারা মিনুকে দিয়ে খুব ইস্ত্রী করাতো। আর খেতে দিত নিরামিষ্যি। তবে তাদের রঙীন টি ভি ছিল। এ বাড়ীতে সাদা কালো টি ভি। তাই মিনু মাইনেটা দশ টাকা বাড়িয়ে নিয়েছে। বাবুকে সে মেসো ডাকে। বাবুর স্ত্রীকে মাসী। মেয়েরা শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে তাদের দিদি ডাকে। ওরা না এলে বাড়িতে লোক বলতে দু'জন। কথা আছে এবার পূজোয় সে নতুন কাজের লোক হলেও শাড়ি সায়ার সঙ্গে আলতা, চিরুনী, স্যাণ্ডেল ও পাবে।

ও মেসো। চা নাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে শেষে।

মাসীর চা এ ঘরে দে।

না মাসী বলেছে—তার ঘরে চা খাবে!

পাকামি করিস না। চা দিয়ে ডেকে দে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে চা খায়। তোর বিয়ে হলে তুইও বরের সঙ্গে বসে ভোরে চা খাবি।

ধ্যাৎ! তুমি বড্ড অসভ্য কথা বলো মেসো।

চায়ের সঙ্গে মাসী এলো এঘরে। কী ব্যাপার? বুড়ো বয়সে একি ঘোড়া রোগ?

কেন? কি হয়েছে? আমাদের বুড়ো হতে এখনো দশ বারো বছর দেরি আছে—

বিয়ের এতদিন পরে বউ'র সঙ্গে বসে চা খাওয়ার ইচ্ছে হলো যে বড়!

প্রথম জীবনে তো সময়ই পাইনি দীপু।

পঞ্চাশ পার হ'য়ে সেই বাসি সখ মেটাচ্ছো এখন!

এমন সময় মিনু জানতে চাইল, তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে মেসো?

তা প্রায় তিরিশ বছর।

দীপা তার স্বামী অশোককে এক ধমকে থামালো। বাড়িয়ে বলছো কেন? এই চব্বিশ বছর পুরো হয়ে গেল মে মাসে। তারপর দীপা মিনুকে ধরলো, তোর এতসব জানার ইচ্ছে কেনরে? খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে। তাই না?

ধ্যাস্!

ধ্যাস্ কি রে? বলে দিই তোর মেসোকে।

অশোক কাগজ থেকে চোখ তুললো। কি?

দীপা মিনুর চোখে চোখ রেখে হাসলো। মিনু তখন চোখ নামিয়ে নিল।

দীপা বলল, কাল তোমার ছোট জামাই ফোন করেছিল। বিল্ব তো মিনুকে দেখেনি। তাই বোধহয় ফোনে বলেছে—তুমি কে? তোমাকে তো দেখিনি। তাতে তোমার মিনুরাণী বলেছে—আমি মিনু—পাশের ঘরে শুয়ে সব শুনেছি—মিনু বলে যাচ্ছে বেশ হেসে হেসে—আমি বাইরে বলি আমার বয়স চোদ্দ—কিন্তু আসলে আমার বয়স ষোল—কলকাতায় কেউ তা জানে না—আপনি কে? নাম বলুন। শুনে আমি ছুটে এসে ফোনটা ধরি—ওপাশে তখন বিল্ব।

দীপার বলার ভঙ্গীতে অশোক ঘোষাল হো হো করে হেসে উঠলো। তাই বল! ফোনে অচেনা মেল ভয়েস মিনুকে উতলা করেছিল। তাই হিরোইন হয়ে গিয়েছিল!

কী হেসে হেসে কথা! ফোন ছাড়েই না।

মিনু মাথা নিচু করে খালি কাপ প্লেট নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

অশোক বলল, দাঁড়া। আজ রেডিওতে খবরের পর তোর বয়সটা যে আসলে ষোল তা অ্যানাউন্সের ব্যবস্থা করছি।

দু'কাপ হাতে মিনু ফিরে তাকালো। কালো। সিম্পিল। লাজুক। বাড়ির কাজ করতে আসা মেয়েদেরই মত। সামান্য ভিন্ন। তা চোখেই ধরা

পড়ে। আর সেই দু'চোখে এখন দু'টি গড়ানে ফোঁটা।

দীপা বলল, ভোরবেলাতেই চোখের জল ফেলোনা বাছা। তাতে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আমরা এমন কিছু তো বলিনি। বিয়ের ইচ্ছে তো সবারই হয়।

কাপ নিয়ে যাবার সময় মিনু পরিষ্কার গলায় বলল. না। সবার হয় না। আমাদের বিয়ের ইচ্ছে হয় না।

অশোক ঘোষাল আঠারো বছর বয়স থেকে ঘুরে বেড়িয়ে নানান কাজ নানান্ দালালী করা মানুষ। একসময় সে বাড়ি খুঁজে দিয়ে ভাড়াটেদের কাছ থেকে একমাসের ভাড়া দালালী পেত। সেসব অনেকদিনের কথা। এখন সে নিজে দালালী দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিতে পারে। সে দীপাকে বলল, থাক না। কাঁদুক খানিকটা। ওইটেই ওর রিলিফ।

বড্ড যে বেশি দয়ালু দেখছি!

তুমি তো আর অল্প বয়সে কাজ করতে বেরোওনি। এ কষ্ট তুমি জানবে কোত্থেকে? আমরা জানি।

আমরা কারা! তুমি আর মিনু?

নিশ্চয়ই। আরও যেসব মিনু আছে—তারাও। আরও যেসব বিপুল, মোহিন, কানাই আছে—তারা—তারা সবাই মিলে এই আমরা সবাই দীপু।

তুমি তো কবেই ওদের দল থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্দরলোক হয়ে গেছ। তোমার এই বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে মাখামাখি আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তুমিই ওদের নষ্ট কর। বকশিস দিয়ে অল্প দিনে মাথা ঘুরিয়ে দাও। এখনো ছ'মাস হয়নি—এর ভেতরেই দু'বার জ্ঞানপীঠ দিয়েছো মিনুকে। দু'বারের পনেরো পনেরো তিরিশ টাকা—

পুজোর কত দেরী এখনো—তাই ওর দু'টো জ্ঞানপীঠ দরকার ছিল। না হলে ফ্রক কিনতো কি করে? তিরিশ টাকার নিচে একটা ফ্রক হয়? ভোর বেলাতেই চোখের জল ফেললো। ছেঁড়া চটি পরে মাদার ডেয়ারির দুধ আনতে যায়। আজই ওকে একটা রবীন্দ্র পুরস্কার দিতে হবে—

আর মাথাটি খারাপ করে দিও না। মাস তিনেক হলো এসেছে। সামনে পুজো। তখন তো আবার মিনু পাবেই—

দশ টাকার রবীন্দ্র পুরস্কারটা পেলে—কিংবা আকাদেমি দিলেও হয়—ও স্যাণ্ডেল কিনে নিতে পারে—সস্তায় এক জোড়া—কাজ চলা গোছের।

আমিও তো কম বয়সে তোমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বউ হয়ে এসে হাঁড়ি ঠেলেছি। উপহার কোথায়! দু'টো মিষ্টি কথাও শুনিনি। ওইটুকু মেয়েকে

অত ঘন ঘন জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্রপুরস্কার দিও না বলছি। মোহিত, বিপুল কেমন বিগড়ে গেল মনে আছে? ঢেলে পাঁচ টাকার আনন্দ পুরস্কার দিচ্ছিলে ঘন ঘন—বিপুল খিদিরপুরে পালিয়ে গিয়ে পুরুত হয়ে গেল। পদ্মবিভূষণ দিলে—কানাই মুদিখানায় নিজের জন্যে ধারে মাল নিতে শুরু করে দিল। মনে আছে?

ছ'টাকায় পদ্মবিভূষণে কেউ বিগড়ায় না দীপু। অভাব ছিল তাই বিগড়ে গেল। আর জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় বৌদি ও হাঁড়ি ঠেলেছে। এ কিছু নতুন নয়। আজই মিনু প্রথম ছুটি পাবে আমাদের বাড়িতে। ছুটি নিয়ে রাখী-কঠিতে ওর ভাইকে রাখী পরাতে যাবে। দিদিরা থাকবে সবাই সেখানে। পুরস্কার দিতে না চাও কিছু টাকা ওর হাতে ধরে দাও। এই পাঁচ দশ—

সে তো মাইনের টাকাই আছে ওর হাতে।

সে টাকা ডাকঘরে জমাবে ঠিক করেছে। ছেলেমানুষ তো। দাও না ওকে পাঁচটা টাকা। মনে কর যুগান্তর প্রাইজ দিচ্ছ ওকে। সেই পয়সায় রাখী কিনবে। বাস ভাড়া দেবে। ওর মনটা ভাল হবে—অন্তত একদিনের জন্যেও সুখ পাবে মনে। একটা তৃপ্তি। এই ইনফ্লেশনের দিনে অত অল্প পয়সায় কেউ বিগড়ায় না দীপু।

বেশ। পরে আমায় কিছু বলো না কিন্তু। একথা বলে দীপা একদম চুপ করে গেল। তার মনের ভেতর যুক্তিগুলো ঠিক এইভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল—

কাজের মেয়ে হিসেবে মিনু আনকোরা নয়। কলকাতায় ওর তিন বছর হয়ে গেছে। ওইটুকু হলে কি হবে—,মিনু সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। পুরস্কার বল—বকশিস বল—যত পারো ঢেলে যাও। কোন রিটার্ন আশা করো না। মাসে পাঁচ টাকা বেশি পেলে ও ঠিক অন্য ডালে গিয়ে বসবে।

মিনু অন্য দিন এই সময় আরেক প্রস্থ চা করে। ছোড়দি-জামাইবাবু বা বড়দি-জামাইবাবু এলে তাদের বাচ্চা ধরে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটের, সাবান কাচা—কাচির লক্ষ্মী প্রায় ওরই বয়সী। সে এলে অনেক সময় দু'জনের কাজ এক অঙ্কে ফেলে দিয়ে ওরা ভাগ করে শেষ করে ফেলে। কাজগুলো এরকম—

বাসন মাজা; কুটনো কোটা, ঘর ঝাঁট ও মোছা; বাসি খাবার গরম বসানো, জল ও সাবান কাচা; জল খাবারের রুটি, দই পাতা ও বাটনা বাটা, খাবার জল আনা ও ময়লা ফেলা।

লক্ষ্মীতে মিনুতে মিলে হাতেহাতে জমা কাজ শেষ করে ফেলে। তারপর ওরা গল্পে বসে। এক একদিন লক্ষ্মী নিচের পানের দোকান থেকে দু'খিলি মিঠে

পান এনে পা ছড়িয়ে বসে এক পা আরেক পায়ের ওপর তুলে দেয়। কিংবা শিল ধুয়ে দিয়ে মিনুকে বলে—এ জনমটা হামরা বাটনা বাটলুম। সামনের জনমে হুস করে মোটরে চড়ে চলে যাব বেড়াতে।

মিনু খিল খিল করে হেসে ওঠে। তুই তো হিন্দুস্থানী লক্ষ্মী—

হু। হামরা তো হিন্দুস্থানী। হামার বাবা পাটনার, আর মা পরতাপগড়ের আছে। তুইও হিন্দুস্থানী।

নাঃ! আমরা তো সুন্দরবনের লোক। সাগর দ্বীপে আমাদের বাড়ি।

এদেশে যেখানেই বাড়ি হোক—আপসে তুই হিন্দুস্থানী।

তারপর এক একদিন মিনু ওদের কচুবেড়িয়া নদীতে কুমীর আসার গল্প করে। আবার এক একদিন লক্ষ্মী গঙ্গায় বান আসার গল্প বলে। ঢেউ কত উঁচু। সর্বমঙ্গলা ঘাটের জেটি পাটাতন ভাসিয়ে জল চলে এল কিনা তাও বলে।

আজ লক্ষ্মী আসেনি এখনো। মিনু তেতালার জানালার শিকে মুখ চেপে ধরে চারদিকে দেখছিল। ডান দিকে বড় রাস্তার ওপর রঘু ডাকাতের কালি-বাড়ি। বাঁ দিকে সাতকীরার জমিদারদের থামওয়ালা বাড়ি। সে বাড়ির সামনে ঝিল। ঝিলের পাড়ে কালো কালো মোষের বিশাল খাটাল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিনু চলে গিয়েছিল ওদের দেশে যাবার রাস্তায়। মনে মনে এই বেড়িয়ে আসা তার অনেকদিনের খেলা। তিন বছর কলকাতায় কাজ করতে এসে মিনু মনে মনে খেলার এই খেলাটা অনেক ভেবে চিন্তে বের করেছে। এ খেলায় ট্রেন, বাস, লঞ্চের টিকিট কাটলেও পয়সা খরচ হয় না। ভিড়ের বাসে উঠে দাঁড়ালেও গা ঘামে না। কচুবেড়িয়া থেকে বাসে শ্রীদামে গিয়ে পাক্কা তিনটি মাইল হাঁটলে তবে ওদের বাড়ি। কাছেই সাগর বাজার। খাবার জলের টিউকল। কপিল মুণির আশ্রম—আর মাঠকে মাঠ কাঁচা লঙ্কা, তরমুজের চাষ। খেলার ভেতর এই তিনটি মাইল মিনু এক একদিন মনে মনে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে এল ক্ষেতের পাশে ঢিবি করা তরমুজ দেখে বসে। দর করে, কিন্তু কেনে না। ওই ওর এক খেলা।

খোলা চোখের সামনে রঘু ডাকাতের কালিবাড়ি। কিন্তু মিনু সেসব কিছুই দেখছিল না। সে মনে মনে বড় একটা তরমুজ দর করছিল।

এই সময় লক্ষ্মী এসে বলল, এই মিনু। আজ সিনেমায় যাবি?

মিনুর জবাব না পেয়ে লক্ষ্মী তার গায়ে ঠোনা দিয়ে বলল, যাবি তো বল। টিকিট কাটতে দিচ্ছি।

আমার পয়সা নেই।

ঝুট বলিস না। বাবু তোকে পেরাইজ দেয়—সে টাকা কি করলি ?

আছে। বড়দিকে দিয়ে দিতে হবে। এই সনে আমাদের ঘরে চালের খড় বদলাতে হবে।

যে ঘরে তুই থাকিস না—তার খড় বদলাতে পয়সা দিবি ? কি বোকা রে।

কেন বাবা মা থাকে। নবান্নর সময় আমরা সবাই গিয়ে ক'টা দিন থাকি—

ক'দিন থাকিস ?

তা সাত আট দিন।

সেজন্য মায়ের হাতে চল্লিশটা টাকা তুলে দিবি। ব্যাস।

দুর ! তা কি করে হয় লক্ষ্মী ? মায়ের হাতে দেবো কি ? আমরাই তো পালা করে সব বোন এক একদিন বাজার করি। রান্না করি। তাছাড়া এবার আমায় একটা হালের গরু কিনে দিতে হবে বাবাকে।

হাত খালি করে কেউ কি ছুটি, মানায় রে ! চল আজ সিনেমা দেখবি। মনে জোস্ ফিরে পাবি।

তোর সঙ্গে সিনেমায় যাবো না। বাড়ি ফিরে শুনতে হবে—তোর বাবা তোকে খুঁজতে এসেছিল। আর হলের ভেতর হাফটাইমে তোকে ঘিরে এক জোড়া ছোকরা ঘুর ঘুর করবে—আমার ভাল লাগে না লক্ষ্মী।

মিনু কড়া কথাটা লক্ষ্মীর মুখের ওপর বলে দিয়ে কান খাড়া করলো।

নাঃ ! ওদিককার ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তার মানে মেসো খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আর কোমরে হাড়ের ব্যথা ওঠায় মাসি নিজের খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি যাচ্ছে। নয়তো অন্যদিন তো এই সময় একটা পান খেতে চায়। এখন যদি মাসীর কোমরে ব্যথা উঠে থাকে—তাহলে কে তাকে বেহালায় ছোড়দির কাছে পৌঁছে দেবে ?

লক্ষ্মী কিছু গায়ে না মেখে সোজা মিনুর গায়ের কাছে এসে হাসিমুখে জানতে চাইল, ছোকরাদের ভাল লাগে না তোর ? সাচ বলবি।

মিনু চমকে গিয়ে থমকে তাকালো। লক্ষ্মীর মুখখানা তার চোখের সামনে। মাছঘাটের কাছে গঙ্গার পাশেই বস্তিতে লক্ষ্মী থাকে। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে। এই বাবা বোধহয় ওর আসল বাবা নয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে ভীষণ ভালবাসে। সময় মত বাড়ি না ফিরলে খুঁজতে আসে। লক্ষ্মীকে নিয়ে লক্ষ্মীর মা বেলঘরিয়া থেকে এই কাশীপুর বরানগরে চলে এলে লক্ষ্মীর আসল বাবা একবার খোঁজও নেয়নি। তখন থেকেই লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে নিয়ে ওই লোকটার সঙ্গে আছে। এসব কথা মাসী একদিন মেসোকে বলছিল। তখনই সব শোনে মিনু।

নয়তো সে জানবে কি করে? লক্ষ্মী নিজে কি এসব জানে? হয়তো জানে না। কিম্বা সবই জানে। জেনেও কিছু গায়ে মাখে না।

সাচ কথা বলবি কিন্তু বললাম।

কি বলব বল?

ছোকরাদের দেখলে ভাল লাগে?

জানিনা। যাঃ!

লক্ষ্মী একগাল হেসে বলল, এই তো সাচ কথা বললি। সব মেয়েরই ভাল লাগে। নে পয়সা দে। রিজেণ্টে টিকিট কাটতে পাঠাবো। অ্যাডভান্স না কাটলে বেলাকে অনেক লাগবে—

তুই তো অনেক ইংরেজি জানিস। বেলাক—আর কিসব বললি।

কলকাতায় থাকলে অনেক কিছু শিখে নিতে হয়। নে পয়সা দে—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নারে আজ আমি যাবো না। বড়দির ওখানে সবাই যাচ্ছি।

ও। রাখী মাঙবি?

হ্যাঁরে, বলে মিনু লক্ষ্মীর গালটা একটু টিপে দিল। তার চেয়ে লক্ষ্মী পাক্কা তিন বছরের ছোট। সাত বছর বয়স থেকে কাজে লেগেছে। একেবারে গোড়ায় নাকি রাস্তার গায়ে আদাড় থেকে গেরস্থ বাড়ির ছাই ঘেঁটে কয়লা কুড়োতো লক্ষ্মী। কুড়োনো কয়লা রাস্তার গঙ্গা জলে ধুয়ে তবে ওকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে হতো। সেই সাত বছর বয়সে।

অশোক ঘোষাল বাড়ির ছবির অ্যালবাম নেড়েচেড়ে দেখছিল। আগে-কার অনেক ছবি-- হলদে, আবছা মত হয়ে গেছে। ছবিগুলোকে সে মনেমনে সাজিয়ে দেখতে লাগল।

বাবা ন' বছর হল নেই। মৃত্যুর আগে ইউনিট ট্রাস্ট কিনতেন। প্রথম বিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। সেই পক্ষে আমাদের কোন ভাইবোন নেই। কিন্তু সেই পক্ষের মামাদের দেখেছি ছেলেবেলায়। সবাই ব্রাহ্ম। দাড়ি রাখতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম বছরে আমাদের মাকে বিয়ে করেন। ওঁরা একসঙ্গে ছিলেন চুয়ান্ন বছর। আমার এখন বাহান্ন চলছে। আমি মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান।

মা সতের বছর হলো নেই। ভারত স্বাধীন হবার দিন মাকে আনন্দে

হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলতে দেখেছি। মায়ের এক বোনের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন মাস্টারদা—সূর্য সেন।

দাদা—আমাদের সেজো ভাই। সে আজ সাঁইত্রিশ বছর হলো নেই। থাকলে আজ তার বয়স হ'ত উনষাট। আত্মঘাতী হ'য়ে মৃত্যুর সময় মনে হয়েছিল, না জানি কী সম্ভাবনাময় একটা জীবন চলে গেল। থেকে যাওয়া আমাদের জীবনগুলো কতটাই বা সম্ভাবনাকে সফল করে তুলেছে! সম্ভাবনার কথাবার্তা মানুষ বড়জোর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ অব্দি ভাবে। তারপর সব অর্ডিনারি হয়ে যেতে থাকে।

কানুদা আমাদের জ্যাঠতুতো ভাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অষ্টম বাহিনীতে রোমেলের বিরুদ্ধে গোলা ছুঁড়তেন। কান নষ্ট হয়ে যায়। অসম্ভব নেভিকাট সিগারেট খেতেন। একদিন খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, কেওড়াতলায় তাঁর ছেলেরা তাঁকে দাহ করছে।

বেনুদা কবিতা লিখতেন। কানুদার সহোদর। যুদ্ধে রেলের গার্ড হন। টাঙ্গানিয়াকায় বদলি হয়ে গিয়ে সেখানে ট্রেন চালাতেন। যুদ্ধের পর অরবিন্দের ভক্ত হন।

বীণা বৌদি—কানুদার স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর একবছরের ভেতর চুপচাপ মরে গেলেন। সন্থ বিয়ের পর সেঁতার বাজিয়ে শোনান। আমরা তখন কিশোর হচ্ছি।

সোনামুচি—আমার দেওয়া নাম। আমাদের দাদার মত। সুরসিক ছিলেন। তার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় নকশালদের হাতে খুন হয়। সেই থেকে আধপাগল দশা। নার্ভের অসুখে ভুগে মারা গেলেন।

ভ্যাদড়দা—আমাদের পিসতুতো দাদা। ক্যান্সারে অকালে চলে যান। ভাল রাঁধতে পারতেন। আমায় খুব ভাল বাসতেন। নিজের কিশোর বয়সী বড় ছেলের মৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে যান।

বড়দা—একসময় রেডিওতে গাইতেন। কোনদিন টীকা নেননি। সারা দিন অসম্ভব হাঁটেন বলে সুস্থ। বড়দার যৌবনের কোন ছবি আমার কাছে নেই।

মেজদা—হাঁটাহাঁটির দরুন খুবই সুস্থ। ছেলেমেয়ে বিদেশে। সারাদিন পড়তে ভালবাসেন। রিটায়ার করে ওকালতি করছেন।

দীপা—এ ছবিটা দীপার ঠিক বিয়ের আগের। তখন রীতিমত সুন্দরী ছিল। নাতিনাতনীকে নিয়ে তোলা ছবিতে সেই ঝকঝকে ভাব নেই। নিজেই

বলে—পঞ্চাশ পেরোনো ক'জন মহিলা আমার মত আছে দেখাও তো।

আর ছবি দেখতে ভাল লাগছিল না অশোকের। সে বুঝলো, ক্যামেরা আবিষ্কারের আগেও অনেক মানুষ ভাবতে বসে দেখেছে, তাদের মা বাবা গত, আত্মীয়স্বজন অনেকে আর নেই। আমি অ্যাতোটা আচ্ছন্ন হব কেন ছবি দেখে?

দেখি দীপা কোথায়? ভেবে পাশের ঘরে গেল অশোক ঘোষাল। সেখানে খাটের ওপর দীপা বসে। পিঠে একটা বালিশ।

কি? ব্যথা বেড়েছে নাকি?

তেমন কিছু না। তবে একজায়গায় একভাবে বেশিক্ষণ বসতে পারি না। ব্যথা করে। তুমি একবার ডাক্তারের কাছে যাও।

কি বলবো গিয়ে?

সেই একইরকম আছি। কিছু কমে নি। এক্সরে প্লেটটা সঙ্গে নিও।

আমি বলছিলাম দীপা—আরেকটা ছবি তুললে কেমন হয়?

সেই তো একই ছবি উঠবে। বাঁদিকে কোমরের নিচে একখানা হাড় কেমন ঘুণ ধরা দশায় বেঁকে কাৎ হয়ে আছে। আর ছবি তুলে লাভ কি!

অপারেশনও করা যাবে না। মাসিভ অপারেশন তুমি স্ট্যাণ্ড করতে পারবে না। ওদিকে ডাক্তারকে যদি বলি, মশাই রোগটা কি বলুন তো?

কি বলেন ডাক্তার?

সেই এক কথা। আপনার জেনে কি লাভ! আমরা ওষুধ তো দিচ্ছি। যান না মিসেসকে নিয়ে কোন শুকনো জায়গায় ক'দিন বেড়িয়ে আসুন। —রোগের নাম কিছুতেই বলেন না।

এ বয়সে আর কাটাকুটিতে যাব না আমি। এভাবেই চালিয়ে দেব।

যদি পরে বাড়ে?

তা নিয়ে তোমায় আমি জ্বালাবো না দেখো।

এমন সময় মিনু এসে দরজায় দাঁড়াল। মাসি কখন যাবো আমরা?

ওঃ! তোকেও তো খুকীর শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

থাক না। আমি পৌঁছে দেব।

অশোককে থামিয়ে দীপা বলল, আমিই নিয়ে যাব মিনুকে। খুকীর জন্যে একটু পায়েস রেঁধে নিয়ে যাব।

বাসে এই শরীরে যেতে পারবে?

বাসেই যাবো। ঝাঁকুনীতে কোমরের ব্যথাটা কেমন আরাম হয়ে আসে।

বেলা দু'টো নাগাদ মিনুকে নিয়ে দীপা তার বড় মেয়ের শ্বশুর বাড়ি পৌঁছাল। সেখানে মিনুর ছোড়দি বিমলা কাজ করে। মিনুকে কাজের জন্যে দিয়েছিল খুকী। বিমলা রেডি।

মিনু তার ছোড়দিকে দেখে অবাক। মেসোর বড় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে থেকেই ছোড়দি সাজা শিখেছে। তাই ভাবলো মিনু। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

দীপা বলল, খুব সেজেছিস তো বিমলা—

আমায় ভালো দেখাচ্ছে মাসি?

খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন-কলেজে পড়া মেয়ে!

সত্যি? হেসেই ফেলল বিমলা। তারপর বলল, কলেজ কি বলছো মাসি, বাবা আমাদের হাতে খড়ি পর্যন্ত দেয়নি। পাছে পড়াতে হয়—তাই!

খুব গুণধর বাবা তোদের।

বাবা কিন্তু খুব ভাল গান গায়—জানো মাসি। মনসার গান গায়। সুন্দরবনের গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে বেড়ায়।

তাই বুঝি? তা তোরা গান জানিস নাকি?

নাঃ! শুধু বড়দি গাইতে পারে। বাবা নিজে শিখিয়েছিল।

দীপার বড় মেয়ে খুকী বলল, ওদের বাবা তো মাস পয়লার এক দু'দিন বাদেই কলকাতায় আসে। মেয়েদের মাইনের টাকা নিতে। তখন যদি আসো মা তাহলে গান শোনাতে পারি। বেশ খোলা গলা—

আমার কাজ নেই শুনে। মেয়েদের কষ্টের টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায় কোন্ আক্কেলে?

খুকী বলল, ওরা চার বোন কাজ করে। বড় বোন আট বাড়ি ঠিকে কাজ করে। যেমন লম্বা, তেমনি পার্সোনালিটি।

গুণধরের কয় ছেলে মেয়ে?

পাঁচ মেয়ে এক ছেলে। ছেলেটি শ্রীকলোনীতেই জোগাড়ের কাজ করে মিস্ত্রির সঙ্গে।

আরেক মেয়ে?

সে বিয়ে থা করে সুখেই আছে শ্বশুর বাড়িতে। তুমি বোসো মা। তোমার নাতির হাতের লেখা দেখাই। এখন ছোট হাত বড় হাতের এ বি সি ডি লেখাচ্ছে।

স্কুল থেকে আসবে কখন?

এই এলো বলে—

বিমলা আর মিনু ট্রাম ডিপোর দিকে বেরিয়ে গেল। তখনো আকাশের মেঘ কাটেনি। মিনু রাস্তায় পড়েই বলল, ছোড়দি আজ চাঁদ উঠবে কি করে ?

ওঠার জিনিস ঠিক ওঠে। আমি আনারস কিনছি ছ'টো। তুই মিষ্টি নে। ডিমও নিতে পারিস।

মিনু সেকথায় কান না দিয়ে বলল, চাঁদ ওঠবার জায়গা কোথায় ছোড়দি ? সবটাই তো মেঘ। অথচ আজই রাখী পূর্ণিমা।

চুপ কর ভেবলি ? সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না।

ওরা ছ'জনে যখন শ্রীকলোনীতে বড়দির ভাড়া করা ঘর বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল—তখন একেবারে বিকেল। ওদের লম্বা চওড়া বড়দি মাটির বারান্দায় বসে টালির ছাদের নিচে গান গাইছিল গুণ গুণ করে।

সুরটা বিমলার চেনা। চেনা মিনুরও। ওদের বাবা গেয়ে থাকে।

বেহুলা বলেন নেত তুমি মোর মাসী।
ছয় মাসের পথ আমি জলে ভেসে আসি॥
পুণ্যের কারণে পেনু তব দরশন।
জীয়াইব পতি মোর এই নিবেদন॥

এসব গান মিনু বিমলারা ছোটবেলা থেকে নিজেদের বাড়িতে শুনে আসছে। বড়দি শেষের ছ'লাইন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিল। কলোনী এলাকা। এবাড়ি থেকে ও বাড়ির ফারাক সামান্যই। লাউমাচা। বীজলাউ, মাটির কলসী, ধান ভিজানোর মাটির গামলা—যেকোন উঠোনেই চোখে পড়ে। অথচ এক মাইলের ভেতর মিনিবাস, ট্যাকসি, সিনেমা হল।

মিনু আর বিমলা কোন সাড়া না দিয়েই ওদের বড়দির গান শুনছিল। সুরেলা গলা। এ গান যে বড়দির কত প্রিয়—তাও ওরা জানে। মিনুর মনে হল—বড়দি, যদি এরই ভেতর শরীরের একটু যত্ন নিত তাহলে একদম ভদ্দর-লোকের বাড়ির গিন্নিবান্নির মতই খোলতাই, দেমাকী দেখাতো।

ওমা কখন এলি ?

এই তো। সেজদি আসেনি ?

আসবে। বোস তোরা। ও কি ? আনারস আনলি কেন ? ছ'খানা তো আমিও এনে রেখেছি। খুব টক। নুন দিয়ে মেখে চার বোন মিলে খাব ভেবেছি। এ নিশ্চয় বিমলার বাড়াবাড়ি। তোকে না বলেছি বিমলা—যা পাবি সব ডাকঘরে জমাবি। এখন তো কাঁচা বয়স। বিয়ের সময় সব লেগে যাবে।

মিনু খুব সাহস করে বলল, ছোড়দার জন্যে আমি মিষ্টি এনেছি।

আমাদের জন্যে কিছু আনিসনি?

এই যে ডিম এনেছি তিন জোড়া। রসুন পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধবো 'খন।

তুমিও খুব খরচে হয়েছো মিনু।

বাঃ। আমি এখন আয় করি বড়দি। আমি আনতে পারি না?

বড একখানা টালির ঘর। তার তিনদিকে মাটির ঘেরা বারান্দা। তাতে ইটের পটি। চারদিকে ইলেকট্রিক আলো জলে উঠলো। এ বাড়িতেও বালাই নেই। কিন্তু সব বাড়ির আলো, যে যেখান থেকে পেয়েছে, যতটা পেয়েছে, এখানে ছুটে এসে পড়েছে। তাতেই মিনুর তো মনে হল, যথেষ্ট—যথেষ্ট। আবার কি আলোর দরকার।

এমন সময় মিনু দেখলো, তার ছোড়দা একা একা হেঁটে আসছে।

কিরে? সেজদি এল না?

মিনুর এ কথায় তার ছোড়দা কোন জবাব দিল না। বিমলা বলল, কি রে ঝণ্টু? সেজদি ছুটি পায়নি?

ছুটি পেয়েছে। কাজের বাড়ির লোকজন খুব ভাল। কিন্তু আসার পথে কাঁটা।

ওদের বড়দি বলল, আয় তোরা সব ঘরে আয়। লোডশেডিং হলে নির্মলা ঠিক চলে আসবে। তখন তো আর কেউ পথে দেখতে পাবে না ওকে।

কেন বড়দি? সেজদির কি হয়েছে?

সে তোমার শুনে কাজ নেই। যাও চালটা ধুয়ে আনো মিনু। আমি আর বিমলা আলু পেঁয়াজ ঠিক করে নিচ্ছি। হ্যাঁরে ঝণ্টু—গুঁড়ো হলুদ আনিসনি বাজার থেকে?

গুঁড়ো হলুদ, সাদা জিরে, এসব তো সেজদির আনার কথা।

এইতো এক্ষুণি চারদিক অন্ধকার করে লোডশেডিং আসবে। এল বলে। এক্ষুনি নির্মলাও এসে পড়বে।

আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বিমলা খুব আস্তে জানতে চাইল—সেজ-জামাইবাবুর মা অ্যাতো দূরেও থাবা দিচ্ছে?

থাবা বলে থাবা! দু'দুটো ডাকাত পাঠিয়েছে এই শহর কলকাতায়।

আচ্ছা কেন বড়দি?

লোক দু'টো রোজ এসে নির্মলার ফেরার পথে বসে থাকবে। কথা ওদের একটাই। শশধরকে বশীকরণ করে রেখে দেছো ক্যানো? ছেড়ে দাও।

যদি ছাড়ো নগদ পাঁচশো টাকা আর একবিঘে জমি লিখে দেবে নিঃশর্তে। সুন্দরবনের চর জায়গায় পয়োস্তি জমি। সেসব জায়গায় অপরিযাপ্ত ধান ফলে।

কি চায় শশধরদার মা?

কি করে বলি বল বিমলা। নির্মলার শাশুড়ী যে সুন্দরবনের দারোগা মানুষ—আমরা জানবো কি করে?

সত্যি সত্যি দারোগা বড়দি?

মিনুর এ কথায় ধমক দিয়ে ওদের বড়দি বলল, চালটা ধুয়েছিস? এবারে একটু চা কর তো

সেজদি আসুক। তখন করবো।

তাহলে ঝণ্টু, তুই একটু চা করে দে। স্টোভ ধরিয়ে দেবে মিনু।

স্টোভ দেখেছি। তেল নেই বড়দি।—এই দুঃসংবাদটি দিল মিনু।

ও ঝণ্টু,—কেরোসিন আনিস নি?

আজ না আমার রাখীবন্ধন। তো অত কাজ করবো কেন?

বাঃ! তুই একজন জোগাড়ে। তোরই তো সব জোগাড় করে রাখার কথা।

এমন সময় বিমলা খুব আস্তে বলল, কি চায় শশধরদার মা?

চায় ছেলে কাছে বসে থাকুক। ওই তো এক ছেলে তার। বেওয়া মানুষ। তায় সুন্দরবনের জলে ডাঙায় পুলিশের চোখ এড়িয়ে—অন্য কারোবারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঠ চুরি—মধু চুরির ফলাও কারোবার চালায়—তার একমাত্র ছেলেকে কেউ কেড়ে নিলে সে সহ্য করবে কেন?

মিনু তার হাতের কাজ বন্ধ করে বলল, একে তুমি কেড়ে নেওয়া বল বড়দি?

না। বলি না। কিন্তু শশধরের মা তো ডাকাতে মেয়েমানুষ। তার ছেলে যে আর কাউকে ভালবাসতে পারে—বিয়ে করতে পারে—একথা মাগীর মাথায় ঢোকাবে কে! ওসব কথা থাক।

তিনবোন একভাই খানিকক্ষণ চুপচাপ। মিনুই চাল চাপিয়ে দিয়ে চা করতে বসেছে। ওদের বড়দি আনারস কেটে নুন মাখিয়ে রেখে দিল। নির্মলা এলে খাওয়া যাবে।

খানিক বাদে মিনু বলল, ও বড়দি তোমার লোডশেডিংও হবে না—সেজদি ও তার কাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে আসতে পারবে না।

আসবে। ঠিক আসবে। আজ সারা রাত আমরা গল্প করে কাটাবো।

কোন কাজ নেই আজ আমাদের। একথা বলতে বলতেই বড়দি গান ধরলো। মিন্নু বিমলা ওদের ভাই—সবাই জানে এসব মনসার গানের মূল গায়েনকে দম ফেলার সময় দিতেই ধুয়া।

ওদের বাবা মূল গায়েন নয়। মূল গায়েনের ধুয়া ধরতে হয় তাকে। করতাল হাতে। ক'বছর আগে লাক্স বাগানের ওদিকটায় গাইতে গিয়ে ফেরে শশধরকে নিয়ে। শশধরের গলাটি ভাল। সাকরেদি করতে এসে থেকে গেল।

মিন্নু সবার মাঝখানে পাশের বাড়িগুলোর ছড়ানো আলোয় বসে মনে মনে সেই খেলাটা খেলতে শুরু করে দিল। সে যেন দেখতে পাচ্ছে—শশধরদা নদীর পাড়ে ডিঙি উল্টে তার খোলের উল্টো দিকে গাবের আঠা মাখালো। সে দেখলো—এই মাত্র শশধরদা এক ডিঙি তরমুজ নিয়ে কচুবেড়িয়া পাড়ি দিচ্ছে। কাকদ্বীপ বাজারের লঞ্চে মাল তুলে দেবে। ওইতো শশধরদা পুকুর পাড়ে কুপিয়ে মাদা করে মানকচু বসাচ্ছে। বৃষ্টিতে পিঠ ভিজে গেল। সেজদি হাসতে হাসতে গামছা এগিয়ে দিল। ওই তো শশধরদা ধুপ ধুনো দিয়ে পটে বসে মনসার গান ধরলো।

বড়ই আনন্দ আজি চম্পক নগরে।
লখিন্দর অধিবাসে বসে ঘটা করে॥
সাজে লখাই বরবেশে মরিমরি হায়।
অপরূপ রূপ দেখে নয়ন জুড়ায়॥

পেছনে বাবার কোলে খোল। ঐই চাটি পড়লো। ধাই ধাই নে নে ধাই ধাই। আরও পেছনে সেজদির হাতে করতাল। দূরে সাগর বাজার থেকে গোলমালের একটা দলা পাকানো শব্দ ভেসে আসছে।

ও মিন্নু? মিন্নুরে? তোর কি হল। রা কাড়িস না কেন? বলতে বলতে ওদের বড়দি কেঁদে উঠলো, ও মিন্নু? কি হলো রে তোর? কথা বলবি না বোন?

হ্যাঁ।—বলে চমক ভাঙলো।

আর অমনি দপ্‌ করে লোডশেডিং স্বয়ং এসে হাজির হলো।

কি ভাবছিলি বোন?

কিছু না বড়দি। বলে অন্ধকারেই চোখের জল মুছলো মিন্নু। আচ্ছা বড়দি? শশধরদার মা ডাকাতি করে নাকি?

তা জানি না। তবে হয়তো কোন ডাকাতের বউ ছিল। সে মারা যেতে

তার দলের পাণ্ডা হয়ে বসেছে। লোকালয়ে বড় একটা আসেই না। শুনেছি —অজানা সব দ্বীপে ওনার চলাফেরা, ঘাঁটি। দলাদলি, খুনোখুনিও ওই সব জায়গায়। পুলিশের লঞ্চ তাড়া করলে দেশের বাইরে একদম অথৈ সমুদ্রে গিয়ে ভাসতে থাকে।

তা অমন জায়গায় শশধরদা জন্মালো কি করে ?

শশধর। শশধর আমাদের দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! এইতো নির্মলা এসে গেল। আমি ওর পায়ের শব্দ চিনি। কার ভয়ে যে সবসময় তুর তুর করে হাঁটে। নিজের খাটুনীর পয়সায় কলকাতায় আছিস। ডাকঘরে টাকা রাখিস —সুদ হলে তুলবি—দরকারে দোকানে গিয়ে খাবি—কাকে এত ভয় তোর—

নির্মলা বারান্দায় বসেই ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আন্দাজে বলছি —মিনুরাণী এসে গেছে। আমার জন্যে কি এনেছিস ?

খেতে বসেই দেখতে পাবে। এ কথা বলে মিনু জানতে চাইল—এবারে হেরিকেন জ্বালি বড়দি ?

জ্বালাবি যে কেরোসিন কোথায়! তার চেয়ে চল সবাই বারান্দায় বসি। এক্ষুনি পূর্ণিমার জ্যোচ্ছনা ঝরে পড়বে।

ওদের সেজদি ডাকলো, আয় ঝণ্টু। আজ তোকে আমরা জ্যোচ্ছনায় রাখী বাঁধবো।

ওরা পাঁচ জনই বারান্দায় খেজুর পাতায় পাটি পেতে বসলো। ওরা একই সঙ্গে দেখতে পেল—ওদের সেই জ্যোচ্ছনা মাটির উঠোন মাড়িয়ে সবে বারান্দার কানাতে এসে পৌঁছেছে।

যার সবচেয়ে বেশী চিন্তা ছিল—সেই মিনু আকাশের এক ঢালে পূর্ণিমার গোল চাঁদকে সনাক্ত করে এক গাল হাসলো। আমি বলি কি বড়দি—তোমার গলা তো ভাল—তুমি একটা গান ধর।

আর অমনি সারা পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ুক আর কি! স্বামী না থাকুক —লোহা সিঁদুর রেখেও নিস্তার নেই। কোন কোন বাড়ির বাবু এখনো হাত পা চেপে ধরে।

নির্মলা খুকখুক করে হাসলো। তার চেয়ে তুমি ফের বিয়ে করতে বসলে পারতে বড়দি।

এ সব মেয়েলী কথায় ঝণ্টু বড় একটা থাকে না। বিশেষ করে দিদিরা যখন কথা বলে। তাকে কাজের দিন মাথায় ইটের থাক নিয়ে বাঁশের ভারায় উঠতে হয়। দরকারে জল ভর্তি টিনও বয় সে। আর সিমেন্ট বালি মাখা

তো গাঁথুনীর সময় বয়ে দিতেই হয়। আঠারো থেকে কুড়ি টাকা রোজ তার। অন্যদিন এ সময় ঘরে ফিরে সে মড়ার মতো ঘুমোয়। দিদিরা কাজ থেকে ফিরে রান্না চড়ায়। থালায় খাবার দিয়ে তবে ডাকে।

আজ ঝন্টুর সে সব নেই। সে পরিষ্কার গলায় বলল, বড়দির সেই বরকে দেখলাম—ঢাকুরেতে বাসা নেছে। সে বাড়িতেই রান্নাঘর বানাতে ঢুকলাম।

তোকে দেখে চিনতে পারলো না?

চিনবে কি! সিমেন্টের ধুলোয় নক্শা করে নাক মুখ গামছায় বেঁধে নেছেলাম। তাই তো সব দেখতে পেলাম।

কি কি দেখলি শুনি?

কি হবে শুনে বড়দি? মিনুর এ কথায় একদম কান না দিয়ে ওদের বড়দি আবার বলল, কেমন দেখতে?

নতুন বউ তো! জলার পেত্নী। তোমার পায়ের ধারেও দাঁড়ায় না বড়দি।

তাইতো বলি। হারাণের চোখে পোকা পড়েছে। নয়তো ওই পেত্নীটাই হারাণকে তুক করেছে।

আহা! হারাণদা না জানি কোথাকার কার্তিক!

নারে নির্মলা। যখন সাগর বাজারে প্রথম দেখি তোদের হারাণদাকে তখন সত্যি তাকিয়ে থাকতে হত।

ঝন্টু চেঁচিয়ে বলল, এখন তো হাড়গিলের দশা।

এই বউটা নির্ঘাৎ রক্তচোষা।

থামো তো বড়দি। বিমলার গম্ভীর গলা সবাইকে থাতস্থ করল। বিমলা আবার মুখ খুললো, কেন তুমি হারাণদার জন্যে মিছি মিছি লোহা সিঁদুর বয়ে বেড়াচ্ছো?

এ তোর হারাণদার জন্যে নয়রে বিমলা—

তবে?

নিজের জন্যি। আট বাড়িতে ঠিকে কাজ করি। কে কেমন বাবু জানবো কি করে আগে থেকে? তাই এই লোহা সিঁদুরের তাবিজ। ডাকঘরে তো খাতায় লিখিয়েছি—পিতা নারাণ বিশেস। নাম—সন্ধ্যারাণী বিশেস।

ঝন্টু চেঁচিয়ে উঠলো, ওই তো জ্যোচ্ছনা এসে পড়লো।

ওরা চার বোন যার যার রাখী বুকের ভেতর থেকে বের করে ঝন্টু বিশ্বাসের হাতে বেঁধে দিল। মিষ্টির বাক্সটা মিনু জ্যোৎস্নার ভেতরেই খুলে ধরলো। এই

নে ছোড়দা—বেহালার চৌরাস্তার দোকানের—

ওরা রাতের খাওয়া সারলো জ্যোৎস্নার আলোতেই। ডিমের ঝোল আর ভাত। নির্মলা এনেছিল কয়েক খিলি পান। সেই পান খেয়ে সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস উঠোনে নেমে লম্বা করে পিক ফেলল। ফেলে বলল, সামনের জন্মে দেখিস- আমরা সবাই খুব বড ঘরের বউ হবো। স্বামীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবো। তারা একখানা করে গয়না দিয়ে মান ভাঙাবে।

বারান্দায় লম্বা করে মাদুর পেতে তাতে যে যা পেয়েছে তাই দিয়ে মাথা রেখেছে। চোখের সামনে খোলা আকাশে গোল চাঁদ। সারাটা পাড়া আবছা আঁধারে নিঃঝুম। ট্রানজিস্টরে ট্রানজিস্টরে যাত্রা পালার বিজ্ঞাপন। এর ভেতর মিনুর মনে হলো—বড়দিও যেন বিবিধ ভারতীর কোন বিজ্ঞাপনের গলা মাত্র।

লোডশেডিং চলে গেল রাত সাড়ে এগারোটায়। ততক্ষণে ঝন্টু, মিনু, সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস ঘুমের ভেতর একশো মাইল এগিয়ে গেছে।

নির্মলা আর বিমলা পাশাপাশি শুয়ে। দূরে বড় রাস্তায় লরির আক্রোশ, একাকী কারও হাসি, কোন রাতকানা কুকুরের সন্দেহ বাতিকের ঘেউ ঘেউ।

এরই ভেতর নির্মলা চাপা গলায় বলল, তুই কক্ষনো আর ভদ্দরলোকের ভালবাসায় ভুলিস না বিমলা।

বিমলা আরও চাপা গলায় বলল, কে? আমি? আমি কাউকে বিশ্বাস করি না সেজদি।

সেটাও কিন্তু ভাল না বিমলা। এই শ্রীকলোনীতেই তো আরও ছেলে ছিল। পল্টু তোকে নিয়ে বাল্টিতে সিনেমায় যাবার জন্যে সেজে গুজে মোড়ে দাঁড়াত। আমায় দেখে কী লজ্জার হাসি।

ওকেই তো একদিন দেখি সংহতি কলোনীর গুপ্তবাবুর কলেজে পড়া মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখছে—ওই বাল্টি হলেই। আমায় দেখে ভুত দেখার অবস্থা।

ত্যাখ্ বিমলা। তোর এই শ্রীকলোনী ছেড়ে বেহালার চৌধুরী বাড়ি চলে যাওয়া অনেক ভাল বলব আমি। জানি—একটা ভালবাসা ছিঁড়ে গেলে কেমন লাগে। কী তার যন্ত্রণা—

মিনুর ঘুম ভেঙে গেলেও সে চোখ খুললো না। তাহলে জাহুড়ি বাবুদের কলেজ ঘোরা ছেলে পল্টুদার সঙ্গে ছোড়দির প্রেম ছিল! কিছুই তো কোন-দিন টের পাইনি। আমার বোল হয়ে গেল। কলকাতাও তিন বছর দেখলাম।

হে ভগবান! কবে আমার প্রেম হবে?

চৌধুরী বাড়ির মেজদার জন্যে আমার কষ্ট হয় সেজদি।

আরও চাপা গলায় নির্মলা বলল, ওসব কষ্ট ফষ্ট ভাল না। চাকরি করতে গেছিস—চাকরি করবি। আমরা লেখাপড়া শিখিনি। নাচ গান জানি না। ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হবে। বড়দির মত টাকা জমা। যখন অনেক টাকা হবে—তখন সেলাই কল কিনে ব্যবসা করতে পারিস। কিংবা যাকে বিশ্বাস হয়—তাকে কোন ব্যবসাপত্তরে পুঁজির জন্যে টাকা দিয়ে—তারই সঙ্গে বিয়ে বসতে পারিস।

তাতে দু-কূলই যাবে সেজদি। যেমন আছি তেমনই ভাল। ও বাড়ির মেজদা একটা বিয়ে করেছিল। সে বউ কাটান ছাটান করে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে বসাব দু'মাস আগেও বেহালার বাড়ি খরচা নিতে আসত।

কি পাজি!

বিয়ে করেছে এমন বাড়ি—বৌ সুবাদে ওই বাসি বউয়ের নতুন পিসশ্বশুর বাড়ি পড়েছে বেহালায—আমাদের রাস্তার মোড়ে।

তুই দেখেছিস?

হ্যাঁ সেজদি। নতুন কুটুম্ব বাড়ি থেকে চৌধুরী বাড়ির দিকে আবার তাকিয়েও থাকে।

ছাখ্ বিমলা। তুই যেন চৌধুরী বাড়ির মেজবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকিস নে—

ছিঃ! তা কেন? বড ভাল লোক।

পরদিন ভোরে কড়কড়ে রোদ বেরোবার আগেই ঝণ্টু বাজার করতে চলে গেল। আজ সে বোনেদের জন্যে বাজার করবে। বেলায় কাজে যাবে আজ।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস তার ঢাউস এক স্যুটকেস খুলে বসেছে। শ্রাবণ মাসের সকালে এক অলীক ঠাণ্ডা থাকে—যা কিনা ঘণ্টা খানেকের ভেতর আগুনে গরমে উবে যায়।

তোমার এত শাড়ি বড়দি।

আরও আছে মিনু। তুই নে না একখানা মিনু।

এসব শাড়ি তুমি পরনি একদম।

আট বাড়ির ঠিকে কাজ করি। আটখানা করে শাড়ি তো পাবোই। তা সব তো আর পরা হয়ে ওঠে না। তাই রেখে দিই। একখানা একখানা করে পরি।

বেশি রাত অব্দি গল্প করে নির্মলা আর বিমলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আজ চার বোনই এ বেলাটা এভাবেই কাটাবে। তাই-ই সবাই কাজের বাড়ি কড়ার করে এসেছে। বিকেল বিকেল আবার যে যার কাজের জায়গায় ফিরে যাবে। মিনু কাল অনেক রাত অবধি ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কালই সে প্রথম টের পায়—জ্যোৎস্নার নিজের একরকমের ঠাণ্ডা আছে। তা অনেকক্ষণ চোখে পড়লে সকালের দিকে চোখ ফুলে থাকে।

বড়দি তোমার কাপড় জমিয়ে কী লাভ।

রেখে তো দিচ্ছি। তোদের বিয়ের সময় চুটিয়ে পরবো।

আমাদের বিয়ে হবে বড়দি ?

ওমা! কেন হবে না ? আমরা কি দোষ করলাম।

মিনু খানিকক্ষণ কোন কথা বলল না। তারপর একসময় জানতে চাইল, মেজদি কেমন আছে ?

খুব ভাল। ওরা তো কলকাতায় এলে এখন এখানে ওঠে। শান্তার শ্বশুর বাড়িটাই পড়ে গেছে একদিকে। কারও খাওয়া হয় না। ভাবছি দু'-দিনের ছুটি নিয়ে ঘুরে আসব। শোন। বাবা কি টাকা নিতে গিয়েছিল ?

না তো। এই নতুন কাজের বাড়ি তো বাবা চেনেও না।

চিনে কাজ নেই। নিজে জঙ্গলে গান গেয়ে বেড়াবেন। আর মাস পয়লায় আমাদের টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে যাবে। আমি এখন হাত টেনে চলি।

ছিঃ। বড়দি। তাহলে বাবার চলবে কিসে ?

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস একদম ওদিক দিয়েই গেল না। ধমকে বলল, চুপ কর ভেবলি। বাবা তোর কাছে একটা চাষের বলদ কেনার টাকা চেয়েছে না ?

হুঁ।

পুরো টাকা দিবি না। টিপে টিপে তিনবারে দিবি।

তা কেন বড়দি ? নিজের বাবার সঙ্গে চালাকি ?

এটা চালাকি নয়। কি দামে কিনছে ? আসলে বলদ কেনার দরকার আছে কি না ? এসব জানতে হবে না ?

হালের বলদ একটা মারা গেছে তাই—একটা দরকার—এ তো আমরা সবাই জানি।

জানো শরৎ—আমি তো অবাক হই—যখন দেখি ব্যাংকের দশ লাখ টাকার

দেনা মাথায় নিয়েও তুমি দিব্যি ঘুমোও—লেক গার্ডেনসে গিয়ে টেবিল টেনিস কম্পিটিশনে ম্যাচ খেল।

শরৎ চৌধুরী এ-বাড়ির মেজো ছেলে। বাড়িটা বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে মাইলখানেক ভেতরে। সেখানে যেতে সারাটা রাস্তা রিক্সা সাইকেলের এক বিরাট খেলাধুলো। কিন্তু চৌধুরী বাড়িতে একবার পৌঁছতে পারলে ভীষণ ভাল লাগে অশোক ঘোষালের। শরৎ হ'ল গিয়ে খুকীর মেজো ভাসুর।

শরৎ বিছানায় উঠে বসলো. কখন এলেন তা ঐ মশায় ?

এইতো খানিকক্ষণ। তোমার ভাই কোথায় ? আমার জামাই ?

হেমন্ত ? দেখছিলাম তো নিচে গল্প করছিল।

এখন তো বেলা চারটে। ভাদ্র মাসের বিকেল বেলা। ছায়া ছায়া আকাশের নিচে পৃথিবীর গরমের কিছু কম নেই। শরতের মাথার কাছে একখানা বাঁধানো বই কথা বলতে বলতে অশোক বইটার মলাট খুলে দেখে তাতে লেখা—

শরৎ কুমার চৌধুরী

চৌধুরী বাড়ি

বেহালা, কলি : ৬৪।

অশোক ঘোষাল বুঝলো, শরৎ তাদের এই বাড়ি, যৌথ পরিবারটিকে মন দিয়ে ভালবাসে। নইলে আজকাল তো কেউ বাড়ির নাম দিয়ে ঠিকানা লেখে না।

শরৎ নিজেই বলল, তাঐ মশায়—ভাল ঘুম না হলে আমি কাজ করতে পারি না। ব্যাংক মোটে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিল। তাতে চিংড়ি মাছ রপ্তানির ব্যবসা চলে না। রোজই তো গলের সময় দেড় দু' লাখ টাকার মাছ কিনতে হয়। টাকা দেবে কম—হাত খুলে ব্যবসা করতে পারবো না—আর সব সময় টাকার তাগাদা। এভাবে ব্যবসা করা যায় ?

আমি টাকার জন্যে বলে দেখবো শরৎ ?

কাকে বলবেন ?

তা জানি না কাকে বলবো। তবে দরকার হলে অর্থমন্ত্রী অব্দি যাব।

তাঁকে চেনেন ?

না। তবে দেখা করে সত্যি কথা বলবো।

কি বলবেন ?

বলবো—দেখুন, এ ব্যবসায় দশ লাখ টাকায় কিছুই হয় না। তাও সময়মত দেননি। এখন বাড়ি বন্ধক দেওয়ায় সুদ সমেত টাকা ফেরৎ চাইছেন। বাড়ি

যদি নিয়ে নেন তো আমার বড় মেয়ে যাবে কোথায় ? দাঁড়াবে কোথায় ? বরং আরও বিশ লাখ দিন। শরৎ ব্যবসা করে সব ফেরৎ দিয়ে দেবে।

তাঐ মশায়। ব্যাংক কি এত সরল কথা বুঝবে !

আমি তো শরৎ সারা জীবন সরল কথা বলে এসেছি। তাছাড়া ব্যাংকের বসানো কনসালট্যাণ্ট ফার্মও তো বলেছে—তোমায় আরও বিশ লাখ টাকা দিক ব্যাংক, তাহলে তুমি আবার দাঁড়াবে। সেই কথাই বলব অর্থমন্ত্রীকে।

একথা বলতে দিল্লী যেতে হবে আপনাকে।

কেন ? অর্থমন্ত্রী তো কলকাতায় আসেন মাঝে মাঝে। তখন গিয়ে দেখা করবো। দেখা করে সব বলবো।

শরৎ দোতলার জানলা দিয়ে বাড়ির পুকুরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অশোক ঘোষাল জানে—ষোল কাঠার পুকুর। খুব মৌরলা জন্মায়। ভরাট করে বেচে দিলে এখুনি চার লাখ টাকা পাওয়া যায়।

হঠাৎ শরৎ বলল, দেখুন আমাদের মা মারা গেছেন ছোট বয়সে। বাবা থাকতেন কুমিল্লায় শ্রীপুর। তারপর চলে এলেন ত্রিপুরায়। আমরা হেলাফেলায় বড় হয়েছি। তাই আর কোন বিপদকেই বিপদ ভাবি না। এ ব্যবসা টাকা ছাড়া হয় না। আমাদের তো জমানো টাকা কিছুই নেই। তাই ধরেই নিয়েছি ভাল কিছু আমাদের জীবনে হবার নয়।

তা কেন শরৎ ? জীবন একবার না একবার সবারই দিকে হাসিমুখে তাকায়।

আমাদের দিকে তো তাকায় না তাঐ মশায়। হেমন্ত জন্মালো। মা, আমরা সবাই তখন জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশাই মস্ত ঠিকাদার। জেঠিমা বললেন, তোরা আসানসোলে তোদের পিসি বাড়ি গিয়ে থাক্। ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ক'দিনের জন্যে নাকি সেণ্টারের কোন্ মন্ত্রী এসে থাকবেন। আমরা চলে গেলাম আসানসোলে। তা সে মা তো চলে গেল।

বেয়ানের কোন ছবি নেই কেন তোমাদের বাড়িতে ? মায়ের ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে।

জানেন—মা কবিতার ভাষায় চিঠি লিখতেন। একবার কুমিল্লার শ্রীপুর থেকে চিঠি লিখলেন—তোমাদের দেখিতে আমার মন পাখী হইয়া উড়িয়া যায়। আমি আর হেমন্ত তখন কলকাতায় কাকুর বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ি।

মা সবার চিরকাল থাকে না শরৎ। বলে অশোক ঘোষাল চুপ করে গেল। বাতাস নেই কোন। কলকাতার ভেতর বাড়ির সামনে পুকুর ঘেরে গাছ-

পালা। একটা পাতাও নড়ছে না। শরৎ ঘুম দিয়ে উঠলেও তার চোখের নিচে ক্লান্তি। মাথায় থাক থাক কোঁকড়ানো চুল। পোশাকে আশাকে সব-সময় টিপটাপ থাকার ছেলে শরৎ। অশোক ঘোষালের মনে হলো শরতকে যেন অনেকটা মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানীর মত দেখতে। বার্গম্যানের হিরো।

শরৎ বলল, ব্যাংক টাকার জন্যে লিগাল নোটিশ দেবে। তা দিক না। মামলা চলবে দশ বছর। ততদিনে অন্য ব্যবসা করে আরেকটা বাড়ি বানিয়ে নেব। সেখানে উঠে যাব আমরা।

অশোক ঘোষাল বুঝতে পারছিল—মোটা টাকার দেনার বোঝা শরতকে বেপরোয়া তিরিক্ষি করে তুলেছে। তাই আবহাওয়া ঠাণ্ডা করতে সে বলল, বেয়ান বেঁচে থাকলে তোমার ফের বিয়ে দিতেন।

নাঃ। আর বিয়ে করব না।

সব মেয়ে তো খারাপ নয় শরৎ।

ওকেও তো আমি খারাপ বলছি না তাঐ মশায়। বিয়ে হয়ে এসে ও এখানে থাকতে পারেনি। আমাদের মা নেই। ওর সঙ্গী কেউ নেই। ইলেকট্রিক নেই। ট্যাপ ওয়াটার নেই।

তাহলে রাগ কোরো না শরৎ—আমার বড় মেয়ে খুকী যখন এসেছে—তখন কি এসবই ছিল?

খুকী? খুকীর মত মেয়ে ক'জন হয়। আপনার ওই ছোট্ট মেয়ে এসেই তো এতবড় বাড়ির হাল ধরলো। এখন তো আমরা সব ভাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি। জানি বাড়িতে খুকী আছে। আসলে জানেন কি তাঐ মশায়—বাড়িতে একজন মহিলা না থাকলে বাড়িটা ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে!

তা তুমি আবার বিয়ে কর।

দাঁড়ান। ব্যাংকের এ ঠেলা সামলাই। তারপর ব্যবসা করে আবার দাঁড়ানো আছে।

জীবনে সবই আছে—সবই থাকবে শরৎ। হয়েও যাবে সব। কিন্তু বিয়ের বয়স পার করে দিয়ে বিয়ে, সে যেন জেনে শুনে—

শরৎ তার ছোট ভাইয়ের শ্বশুরকে প্রায় ধমকে থামালো, শুনুন। আমার জন্যে আমি অল্পবয়সী পাত্রী স্থির করে রেখেছি।

জানি শরৎ। শুনেছি মেয়েটি তোমার চেয়ে একুশ বছরের ছোট।

হোক না ছোট।

শুনলাম মোটে ক্লাস এইটে পড়ে।

হ্যাঁ। যৌবনে পা দিয়েই দেখবে আমিই তার জীবনে একমাত্র পুরুষ।

সে হয় না শরৎ।

হয় তাঐ মশায়। আমি চাই এমন একটি মেয়েকে বউ করতে—যে কিনা শুধু আমাকেই ভালবাসবে।

ওভাবে কি ভালবাসা হয়। স্রেফ একসঙ্গে থাকা যায় শুধু।

হয় না ?—বলে এমন করে তাকালো শরৎ—যেন অশোক ঘোষাল এই মাত্র শরতের হাত থেকে শেষ অস্ত্রটিও কেড়ে নিল।

বার বার জীবন জটিল কোরো না শরৎ।

শরৎ মাথা নিচু করে হাঁটুর ওপর কোলবালিশটা ধরলো দু'হাতে। অশোক ঘোষাল আবার বললো, তোমার জীবন তোমারই।

পড়ন্ত বিকেলের আলোতেও গরমের ভাপ। ভাগ্যিস মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছিল। চৌধুরী বাড়ির দোতলায় এই সিঙ্গল্ বেডের ধামসানো বিছানা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন নয়। উরুভঙ্গের পর ওখানে দুর্যোধনও বসে নেই। ওটি কোলবালিশ—গদা নয়।

আজ সকালে আকাশবানী কলকাতায় ভোরবেলা সুভাষিত বাণী পাঠ হচ্ছিল মহাভারত থেকে। অশোকের খানিকটা খানিকটা এখনো মনে আছে।

ধর্মরাজ বলছেন, মনে সন্তোষ রাখো। তোমাকে দেখে কেউ যেন ভয় না পায়। তুমি যেন কাউকে দেখে ভয় পেয়ো না। বিদ্বেষ ও কাম জয় করো। তাহলে প্রশান্তি আসবে। আত্মদর্শন হবে। অর্থউপার্জয়ী বিদ্যা অর্জন কর। স্ত্রী হোক প্রেমময়ী। পুত্র বাধ্য। তবেই জীবনে পাবে সন্তোষ। এই সন্তোষই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় পৌঁছে দেয়।

মেজদা। তোমাকে খেতে দেব ?

দে—

বিমলা চলে যাচ্ছিল। অশোক ডাকলো, এই শোন—তোমার নাম বিমলা ?

হুঁ।

একতলা থেকে খুকীকে ডেকে দাও তো।

খুকী বিমলাকে নিয়ে ওপরে উঠে এল। তোমরা কথা বলছো বলে ওপরে আসিনি।

সবই বুঝলাম। তুই এবাড়ির বউ। তোর ভাসুর এখনো খায়নি ?

মেজদা তো অমন দেরি করেই খায়। খেতে ডাকলাম। ঘুমোচ্ছিল।

বিমলা বলল, আমিও ডেকেছিলাম। আমায় এমন ধমকে উঠলো মেজদা—

অশোক ঘোষাল কিছু না বলে বিমলাকে দেখলো। চব্বিশ ছাব্বিশ বয়স হবে। খুকীর দেওয়া কোন শাড়ি পরে আছে। মাথায় বড় একটা খোপা। তাতে বাড়িরই করবী গাছের একটা ফুল বসানো।

এই গাছটিকে অশোক ঘোষাল কতবার তার জামাই হেমন্তকে বলেছে, কেটে ফেল। কেটে ফেল হেমন্ত। এর বিচি বেটে খেলে মানুষ পাকাপাকি পাগল হয়ে যায়

গান্ধী কলোনীর সাত নম্বর স্কয়ার্ডে চোদ্দ নম্বর বাড়িতে ঘরমোছার কাজটা কিছু ঝামেলার। বাড়ির গিন্নি নিজে ফারনিচার তুলে তুলে রোজ ধুলো খোঁজে। মাজা বাসন চোখে চশমা দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। নির্মলারই বয়সী। নির্মলা তাকে দিদি ডাকে। অনেকবার বলেছে—দিদি তুমি একটু বিশ্রাম কর। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।

মানুষ খুব ভাল। কিন্তু মোছা মেঝে এক একদিন নির্মলাকে দিয়ে কেরোসিন পালিস করায়। দাদাবাবু এল আই সি. করে বেড়ায়। গরম ভাত খেতে ভালবাসে। দুটি বাচ্চাই ভোরবেলা স্কুলবাসে বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই সন্ধ্যে। ওদের দেখে দেখে নির্মলার মনে একটাই প্রশ্ন: এরা ঘুমোয় কখন? বাঁচবার জন্যে যদি ছুটে বেড়ানো—তবে এরা তো ছুটতে ছুটতে খাটতে খাটতেই একদিন রাস্তায় মুরে পড়ে থাকবে। দরকার নেই আমার ভদ্দরলোক হয়ে। ঘরদোর পরিষ্কারের বাতিকে দিদির চেহারা যে কি হয়েছে তার খেয়াল নেই। এদিকে নির্মলা দাদাবাবুর রুমাল কাচতে বসে এক একদিন এক একরকমের সুগন্ধী পাচ্ছে।

সন্ধ্যারাণীর মতো অত বাড়ি ঠিকে কাজ না করলেও ক'বাড়ির কাজে নির্মলার প্রায়ই বেলা বারোটা বেজে যায়। আজ আসছি বলে সে এইমাত্র রাণীকুঠির ডাকঘরে চলে এসেছে। আঁচলের গিট খুলে আটখানা দশ টাকার নোট পাশবই সুদ্ধ কাঁচের ফোকরে দিতেই কে যেন তার কনুইয়ে ইলেকট্রিক চালিয়ে দিল।

উঃ! কে রে পাজি?

ফিরেই নির্মলা দেখলো, তার শাশুড়ির পাঠানো সেই হারামজাদা দুটো দাঁত বের করে হাসছে। গায়ে বেশ ভদ্দরলোকদের জামা কাপড়।

চার পাশে পাবলিক। পাছে সবাই সজাগ হয়ে তাকায়—তাই খুব সাবধানে নির্মলা যেন চেনাপরিচিতের সঙ্গেই কথা বলছে, এইভাবে ভদ্দরপোশাকে ঢাকা সুন্দরবনের নদীনালা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো- তার শাশুড়ির দুই পোষা কুকুরকে হেসে হেসে বলল, ডাকঘরেও এসে উঠেছিস শুয়োর --

তুই শশধরকে ছেড়ে দে। আমরাও তোকে ছেড়ে দেব।

তা শশধরকে গিয়ে বল না। তোমারই তো মায়ের আদেশ। মাতৃআজ্ঞা পালন করুক।

করবে কি করে? তুই তো বশ করেছিস।

তা তোরা পাল্টা বশীকরণ কর।

বেশি ঢ্যাঙাটা বলল, বশীকরণ নয়। এবারে তোর ছেলেকে তুলে নেব।

ভালোই তে ! নাতি তার ঠাকুমার কাছে যাবে! সর, নে সর—রাস্তা দে—

প্রায় ঠেলা দিয়েই রাস্তায় এসে পড়ল নির্মলা। ভিড়ের ভেতর বড় রাস্তায় কোন ভয় নেই। চড় চড করছিল রোদ। আঁচলে মুখ মুছে নির্মলা শ্রীকলোনীর পথ ধরল। এসব সময় যদি বড়দি সঙ্গে থাকে তো খুব ভাল হয়। কোমরে আঁচল পেচিয়ে এতক্ষণ লোক জড়ো করে ফেলত। শাশুড়ির লোক দু'টো পালাবার পথ পেত না।

শশধরকে বিয়ে করে তো আচ্ছা বিপদ হয়েছে। কে জানতো ওর মা এত ডাকাবুকো। নৌকোয় নৌকোয় ভাসে। খালে খালে ঘোরে। নতুন গজানো দ্বীপে গিয়ে নাকি ভাটার সময় বিশ্রাম নেয়'

অথচ শশধর কি ঠাণ্ডা মানুষ। এসেছিল তার বাবার সাকরেদি করতে। এখন ঘরের ছেলে। বলে, না আমি আর মায়ের কোলের পুতুল হয়ে নৌকোয় টহল দিতে পারব না। বাঘ পাহারার পুলিশের তাড়া খেয়ে কত আর লুকো-চুরি খেলবো নিমু?

নির্মলা বলেছিল, তোমার মায়ের কত পয়সা। কাঠ বিক্রি, মধু বিক্রি, চোরা শিকারের চামড়ার পয়সা—এসব কে খাবে!

মায়ের জিনিষ মা সামলাবে।

আর তুমি এখানে মনসার গান গাইবে! নৌকো উল্টে গায়ের আঠা মাথাবে!

খুব গম্ভীর হয়ে শশধর বলেছিল, শান্তি জিনিসটে নিমু সব জায়গায় থাকে না। এই ইচ্ছে হলো—সাগর বাজারে গিয়ে বসে থাকলাম—দু'টো লোকের

সঙ্গে কথা হ'ল। কিংবা কপিলমুনির মন্দিরের বারান্দায় বসে থাকো। চাদ্দিক চুপচাপ। শান্তি শান্তি। আমি তখন গলা খুলে গান ধরি। কেউ কিছু বলার নেই—না ?

সে তুমি বোঝ আমার জন্যে তুমি মায়ের কোপে পড়লে।

নদীর দুধারে সুন্দরী, গরাণের জঙ্গল। ভাদ্র যায় যায়। ছ'খানা নৌকোর দলটা নাদাভাঙার মুখ পার হয়ে সপ্তমুখীর দিকে এগোচ্ছিল। সকালবেলা। সামনেই সাতটা নদী এসে এক জায়গায় মিশেছে। বর্ষায় ভরা নদী। মাঝে মেঘ উঠে বৃষ্টি ঝরায়। আবার হারিয়ে যায়।

ছয়দাঁড়ির নৌকোখানার গলুই থেকে একখানা কাঁচা পাকা মাথা উঁকি দিল। রোদ্দুরের ঝলক গরাণের জঙ্গলের শান্ত ছায়ার ভেতর গিয়ে পড়েছে। সেখানে ভোর বেলাতেই বক। একটা টিয়ার ঝাঁক ছররা হয়ে এসেই আবার জঙ্গলে ফিরে গেল।

এইবার মানুষটিকে দেখা গেল। মেয়ে মানুষ। লাল পেড়ে গরদের আঁচল কোমরে প্যাঁচানো। পাটাতনে বন্দুকের বাট লাঠির কায়দায় ঠেকিয়ে চাপা গলায় ডাকলো, লক্ষ্মণ—

বনমানুষের ধাঁচের একটি জন্তু-প্রায় মানুষ দাঁড় থামিয়ে ভরাট গলায় বলল, কি বড়দি—

এদিকে তো একটা খাল থাকার দরকার ছিল। ভেতরে ঢুকে দিনটা কাটাবো।

খাল যে ফেলে আলাম বড়দি।

আর কি খাল নাই তোদের সোঁদরবনে !

আরেকটু যাই। নিশ্চয় পাবে।

বড়দি মানুষটি চল্লিশ হতে পারে। পঞ্চাশও হতে পারে। ভাদুরে রোদে ঘামের ফোঁটা মুখের দাগদাগালি ধরে নেমে আসছিল। সপ্তমুখীর দিকটায় শুধু জল আর জল। দূরে টালি আর চুণের মেদিনীপুরী মাল্লাই বজরা ফুটকির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে না। দুটো গাদাবোট টানতে টানতে একটা বাংলাদেশী ষ্টীমার ইণ্ডিয়ায় ঢুকছে। পতাকা দেখে বড়দি চিনতে পারলো।

তোদের জলপুলিশ যদি আসে এখন ?

আমাদের তো তুমি আছ বড়দি।

আমি থাকলে হবে লক্ষণ ? আমাদের তো একটা ডাঙা চাই। পা রাখবো কোথায় ?

লক্ষণের পাশ থেকে ভজেন বললো, কেন ? নয়া দ্বীপ।

বেশ তো দেখি বিশ বছর ধরে জাগছেই ওগুলো। জোয়ারে পা ডুবে যায়। চুলো নিভে যায়। কামট ঢুকে পড়ে। ওখানে তো পাকাপাকি থাকা যায় না রে—

তার চেয়ে চল বড়দি—আমরা সবাই মিলে কলকেতায় গিয়ে উঠি।

সে পোড়ার দেশে পঞ্চা আর শশী গেল। ফেরার নাম নেই।

শশধরের বউটারে ঝেড়ে ফেলে আমার কথা। ওদেরও বশীকরণ করেনি তো ডাইনীটা—

তা করতে পারে বড়দি। নিশ্চয় জলপড়া জানে।

নয়তো আমার ছাবাকে ময়না করে রাখে কি করে ? শশীরে বলা আছে—আর যাই করাব করবি—কিন্তু প্রাণে মারবি না। হাজার হোক আমার নাতির মা তো।

সে লোবাজি তো তোমার বিয়ানের চোখের মণি।

বিয়ান না ছাই। শশধরটা পর হয়ে গেল। আমি কার ভক্তি ভেসে বেড়াই বল তো ?

দাঁড়িরা সবাই একসঙ্গে মাথা নীচু করলো। বাঁদিকে খাল পড়তেই দু'খানা নৌকো এক সঙ্গে বাঁক নিল। কয়েকটা বক সংগে সংগে ঢিমে তালে উড়ে জায়গা বদলালো। নৌকো থেকে দশ জনের হাতের ভিতর।

অনেক দিন বগার মাংস হয় না। মারতে পারবি ?

খুব বড়দি। এখনি ফান্দা বসাই ?

খানিকক্ষণের ভেতর দেখা গেল, ছ' ছ'খান। নৌকো থেকে জনা সাত আট তাগড়া তাগড়া খালি গা লোক বকের চেয়েও বিজ্ঞ পায়ে বক ধরারই ফাঁদ বসাতে লেগে গেল। জোঁক, গোড়াকাটা গরাণের ছুঁচলো জলে ডোবা ডগা কিংবা পিছলে যাওয়া সাপ—কোন কিছুই তাদের আটকাতে পারলো না।

গাছপালার আড়ালে সাত সাতটা নদী তাদের সব জল নিয়ে এসে সপ্ত-মুখীতে পড়ছিল। গরদে ঢাকা বড়দি নামের সেই মেয়েমানুষটি হাতের বন্দুকটা পাটাতনে শুইয়ে দিয়ে আর আটজন মেয়ে মানুষের মতই দুটো হাত পেছনে পাঠিয়ে মাথার চুল দশ আঙুলে চিরুনী চালিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছিল, আর ভাবছিল. এমন একটা দ্বীপ পাওয়া যায় না, যেখানে এখন আর জোয়ারের

জল উঠতে পারে না, একেবারে আলাদা করে নিজের করে একটা দ্বীপ, যেখানে পা ফেলে ডাঙা টের পাবো, খানিক জিরোবো ?

অশোক ঘোষাল তার বইয়ের র‍্যাক থেকে মনসার বই তিনখানা পেড়ে এনে মিনুর বাবার সামনে ধরলো।

পদ্মপুরাণ

বা

মনসামঙ্গল

কবিবর ৺বিজয় গুপ্ত প্রণীত

বাকী দু'খাতা—

মনসার ভাসান

শ্রীকেতকানন্দ দাসের সহযোগিতায়

শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক

বিবিধ ছন্দে বিরচিত

মনসামঙ্গল

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত

তিনখানাই নেড়ে চেড়ে রেখে দিল মিনুর বাবা। তারপর বলল আমি তো পড়তে পারি না—

অশোক ঘোষাল বলল, আমার চশমাটা দেবো ?

দিয়ে কি হবে ? বলে হেসে ফেললো লোকটা—আমি তো পড়তেই পারি না।

মিনুও কাছে এসে বলল, আমার বাবা তো পড়তে পারে না।

অশোক ঘোষাল অবাক হয়ে বলল, তাহলে সুন্দরবনের লাটে লাটে গেয়ে বেড়াও কি করে ?

সব গানই তো শুনে শুনে মুখস্ত। আর আমি তো মূল গায়েন নই। আমি ফিরতি ধুয়ো ধরি। হ্যাঁ—বলতে পারেন, আমি করতালে এক নম্বর—খোলে দুই নম্বর।

মিনুর বাবার কথা বলার ধরণে তৃপ্তি, আরাম ঝরে ঝরে পড়ে।

যেমন মুখের ভেতর সরেস পাটালি টাঁটা দুধ দিয়ে নরম করে নিয়ে খেতে হলে !

কথা বলতে বলতে চোখও বুজে আসছিল লোকটার।

সাদা দাড়ি একটা গিট দিয়ে চিবুকে বাঁধা। গায়ে নীল রংয়ের ফতুয়া। বুক পকেটে টিনের কৌটোয় থাক থাক বিড়ি, সঙ্গে চকমকি। মাথার পাগড়িও পেছন দিকে একটা গিটে বাঁধা। পায়ে রবির টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। এই হ'ল গিয়ে মিন্টুর বাবা।

দীপা বলল, একখানা গান করেন না কেন। শুনতাম বসে বসে।

মিন্টুও বলল, হ্যাঁ বাবা। গাও।

তবে গাই—বলে গান ধরলো লোকটা। গলাটা শান্ত, ঠাণ্ডা। ছোট ছোট ফাঁকতালে ছোট ছোট মিঠে কাজ। সেই সঙ্গে মানানসই ধুয়ো ধরার লম্বা তান।

গাইতে গাইতে সে বলল, এসব নদীর দেশের গান মা। বড্ড সাপ তো। তাই আমরা ওনার তোয়াজ করি।

রাজারে না খাইও নারিকেল।
—না খাইও নারিকেল॥
বিষম বাঙ্গালী লোকে
প্রকারে মারিতে তোকে
তার লাগি আনিয়াছে বিষফল।

গান থামতে অশোক ঘোষাল জানতে চাইল, মেয়েদের বিয়ে দেবে না?

হবার হলে হবেই বাবু।

অশোক নাছোড়বান্দা। সে তো ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হল!

আমরা ধরবার কে বাবু! ও তো বড় অহং হয়ে যায় নাকি?

একটু বাদেই মিন্টুর বাবা বেরিয়ে পড়ল। অশোক ঘোষাল সিঁড়িতে নেমে যাওয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবল—ওর পকেটে এখন মেয়ের সারা মাসের মাইনেটা। হাতে পানের খিলি। আর পেটে মিন্টুর কাজের বাড়ীর ভাত। কত নিশ্চিন্ত! মেয়ে ক'টাকে পৃথিবীতে এনেছো কিজন্যে? লোকটা স্বার্থপর? না, দার্শনিক? কিংবা ওর মাথায় এসব চিন্তা আদৌ আসে না। ফিরে নিজের বাড়ীতে ঢুকতে যেতে দেখলো, মিন্টু দাঁড়িয়ে, চোখে জল।

এই বাবার জন্যে তোরা কাঁদিস? তোরা কিরে?

ভাল হচ্ছে না কিন্তু মেসো। আমার বাবা—আমারই।

আচ্ছা যা। কাঁদ গিয়ে—বলে আর ঘাটালো না মেয়েটাকে। সে মিন্টুর বাবা শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের সিঁড়ি ধরে নেমে যাওয়া ছবিটা ভাবছিল। কী

তৃপ্তি! কী সন্তোষ! এই সন্তোষের কথাই কি মহাভারতে বলা হয়েছে?

কত লোক কত সহজে সন্তোষ পেয়ে যায়। এই যেমন শরৎ হেমন্তর বাবা রণজয় চৌধুরী। চৌধুরী মশায় সম্পর্কে অশোক ঘোষালের বেয়াই। একটা স্ট্রোকের পর মনে করা হয়েছিল, ভদ্রলোকের দিন ফুরিয়ে এল বুঝি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে—রণজয়বাবু আরও অনেকদিন বাঁচবেন।

বাড়ির বাগান লোকজন দিয়ে, নিজে সবসময় পরিষ্কার করাচ্ছেন। আর ক্লান্ত হলেই বিছানায় শুয়ে ইতিহাস পড়েন। নেপোলিয়ানের রণসজ্জায় কি কি ভুল, তাই একদিন বোঝাচ্ছিলেন অশোককে।

অশোকের চেয়ে চব্বিশ পঁচিশ বছরের বড। অশোক পাল্টা বলেছে, বেয়াইমশাই আপনার কয়েকটা ভুল ধরি রাগ করবেন না—

আমার ভুল ধরবেন কি। আমার তো পৃথিবীতে আসাই ভুল হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো হেমন্ত আর শরৎ এক সঙ্গে বলে উঠেছে প্রায়—তোমার তো মঙ্গলগ্রহে থাকার কথা!

ওদের থামিয়ে দিয়ে অশোক বলেছে, বাচ্চা হবার সময় কুমিল্লার গাঁয়ে বেয়ানের জন্যে হাতুড়ে ডাক্তার ডাকা উচিৎ হয়নি আপনার। হাসপাতালে থাকলে বেয়ান মরতেন না।

পাকিস্তানী হাসপাতাল। কোথায় যাবে?

বাঃ। কলকাতার কলোনীতে ছেলেমেয়েদের রেখে আপনি ধান চাষ করতে পারলেন পাকিস্তানে—আর নিজের বউ হাসপাতালে দিতে পারলেন না? ভাল ভাল ছেলেদের পড়াশুনোয় মন না দিয়ে আপনি ওখানে আয়ুবের জামানায় পুকুরের পাড় বাঁধিয়েছেন।

তাও তো বাবা থাকতে পারেনি। পাঞ্জাবী অফিসাররা পেছনে লেগে গেল। খুনই হতেন। সামান্য ডাকাতির ওপর দিয়ে বেঁচে গেছেন।

রণজয় চৌধুরী খাটে উঠে বসে দেখলেন, তার মেজো আর সেজ ছেলে দিব্যি বেয়াইয়ের দিকে চলে গেছে। দেখে তার সেদিন ভালই লেগেছিল। কেননা, তার মুখে ছিল তৃপ্তি, সন্তোষ। হয়তো ভেবেছিলেন, এই বেয়াই লোকটা তার ছেলেদের ভালবাসে। অশোকের মনে হয়েছিল, চৌধুরীমশাই-মহাপ্রস্থানের যুধিষ্ঠিরের প্রশান্তিই বা পেলেন কোত্থেকে?

প্রেমময়ী স্ত্রী তো স্বর্গে—ভুল ইঞ্জেকশনের দরুণ। ছেলেরা বাবাকে খুবই

ভালবাসে—কিন্তু সমালোচনায় মুখর—আর কিছুটা অবাধ্য তো বটেই। রণজয় বাবু বার্দ্ধক্য পর্যন্ত কোন বিদ্যা তো অর্জন করেন নি। দেশে ধান চাষ করেছেন। কলকাতায় এলে বড়লোক বড়ভাই খাতা লিখতে বসিয়ে দিয়ে সামান্য টাকাই হাতে দিত। তাহলে এই প্রশান্তি—এই সন্তোষ কোত্থেকে পান বেয়াইমশাই? কোন্ ছেলে কি পড়লো—কোথায় চাকরি পেল—কোত্থেকে চাল ডাল আসে কী করে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়—তার কোন খবরই বেয়াইমশাই জানেন না। ভাবেনও না।

একবার অশোকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বিশ্বকোষ আবার ছাপা হয়েছে কিনা। তার নিজের বিশ্বকোষ কুমিল্লায় শ্রীপুর গাঁয়ের বাস্তুবাড়ির দক্ষিণের ঘরে পড়ে আছে। আসার সময় জানলা বন্ধ করা হয়নি। এই আট বছরে নিশ্চয় রোদে, জলের ছাঁটে নষ্ট হয়ে গেছে তু'ভল্যুমের বিশ্বকোষ। অমন বই আর হবে না।

আরেকবার বলেছিলেন, ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস বিশদে পাওয়া যায় রাজতরঙ্গ মালায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কি রাজতরঙ্গমালা আছে?

অশোক ঘোষাল জানতে চেয়েছিল, থাকলে কি হবে?

তাহলে ট্যাকসি করে গিয়ে একবার পড়ে দেখতাম। বছর দুই লাগতো পড়তে।

কেন?

বুঝলেন না? কুমিল্লা তো আগে ত্রিপুরার রাজার রাজ্যে ছিল। ১৮৯১-তে ইংরাজরা কেড়ে নিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভেতর অন্যায় করে কুমিল্লাকে ঢুকিয়ে দেয়। সেই থেকে আমরা বাধ্য হয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বিদেশীর প্রজা হলাম। বলতে বলতে চোখ মুছে ছিলেন রণজয় চৌধুরী। নয়তো আপনারা যখন বরিশাল, খুলনা, বর্ধমান; বাঁকুড়ায় ইংরাজের হাতে পরাধীন, তখন তো আমরা স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন প্রজা।

আমি তো তখন জন্মাইনি বেয়াই—

আমিও জন্মাইনি। আমার জন্ম ১৯০৯-এ। আমি আমাদের স্বাধীন বাপঠাকুর্দার কথা বলছি। আপনাদের বাপঠাকুর্দা তখন পরাধীন।

আপনি এখন কার প্রজা?

দিল্লির।

আপনি এখন পরাধীন ? না, স্বাধীন ?

পরাধীন।

কেন ? এখন তো স্বদেশী সরকার।

তাতে কি ! কাগজে দেখি যা—তা তো দিল্লি এখনো মোগলাই চালে চলে ! বলতে পারেন আমরা করদ রাজ্যে আছি। সমানে সমানে ছাড়া বন্ধুত্ব হয় ? ভালবাসা হয় !

বেয়াইমশাই একটা রহস্য একটু খুলে বলবেন ?

কিসের ?

দেশ বিভাগ হল। বেয়ান চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা বড হল। কেউ কেউ বিয়ে করলো। নাতিনাতনী হল। আপনার একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল। কিন্তু আপনার ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি আর মনের সন্তোষে তো কেউ বাদ সাধতে পারল না ? রহস্যটা কি ?

মৃত্যু, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশান্তরী হওয়া এসব তো বাইরের ব্যাপার। আমার ভেতরকার শান্তি বলেন, সন্তোষ বলেন, তাতে বিঘ্ন ঘটায় কার সাধ্য ? আপনি এক গ্লাস আঙুরের রস খেলেন—তাতে আঙুর ক্ষেতের কোন উনিশ বিশ ঘটে ? দুনিয়া তো দশদিকে।

কচুবেড়িয়ার বাস জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে এসে শ্রীদামে নামিয়ে দিল নারায়ণ বিশ্বাসকে। এখন এই তিন তিনটে মাইল সাবধানে যেতে হবে। পথ বলতে দু'ধারে থোড় ভর্তি গাভিন ধান চারার মাঠকে মাঠ চিরে চলে যাওয়া এক চিলতে সরু হাঁটা পথ। দূরে দূরে লোকালয়—কুপির আলো দেখে বোঝা যায়। মাঝে মাঝেই সরু খালের ওপর ইরিগেশনের সরু সরু পোল। নয়তো বাঁশের সাঁকো।

গম্ভীর আকাশ। আরও গম্ভীর ধানক্ষেত। জ্যোৎস্না পড়েও এদের হাসাতে পারছিল না। তার ভেতর দিয়ে ফিরছিল নারায়ণ বিশ্বাস। গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে—

> সাজিল হাসান হোসেন
>
> ও-ও-ও—সাজিল হাসান হোসেন—
>
> সাজ সাজ বাদ্য বাজে   লড়ালড়ি কাজী সাজে

হুড়াহুড়ি হোসেন নগর।

ও-ও-ও—সাজিল হাসান হোসেন—

নারায়ণের মনে পড়লো এইখানটাতেই গোলে তেহাই পড়ে। আর সাজানো থালায় ধুপধুনোর ভেতর প্যালা পড়ে। সিকিটা আধুলিটা। সঙ্গে বড় বাতাসা।

কে যেন অন্ধকার ধানক্ষেতের ভেতর পরিষ্কার গলায় বলল, আয়! এবার তোরে সাজাই—

নারায়ণ বিশ্বাস ঠিক তখনই একটা বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছিল পাশের ধরতাই বাঁশ ধরে ধরে। ওপারের ডাঙায় উঠে সাবধান হবার আগেই কে বা কারা—বেশ শক্ত হাতে তার পা দু'খানা ধরে টুপ করে নিচে পেড়ে নিল।

চেঁচাতেও পারলো না নারায়ণ বিশ্বাস। মুখের ভেতর গামছা গুজে দিয়েছে।

তারপর কোত্থেকে একটা রাত চলে গেল। গলুইয়ের ভেতর ভ্যাপসানি গরম। হাত পা পিছমোড়া করে কচ্ছপ বাধা—বাধা হয়েছে তাকে। তবে এখন সেই ভাত সেদ্ধর গরমানিটা আর নেই।

বকের মাংস রান্না হচ্ছিল বড় ডেকচিতে। প্যাজ রসুনের রান্না। ভুরভুর করে গন্ধ চারিয়ে যাচ্ছিল ঠাণ্ডা বাতাসে।

বড়দি চেঁচিয়ে বলল, ভাত বেড়ে তোদের বেয়াইকে ডাক।

তিনি কি খেতে পারবেন এখন? সারা রাত কচ্ছপ হয়ে পড়ে থেকে থেকে এখন অনেকটা বেঁকে গেছে বড়দি।

পাছায় গোটাকতক লাথ্‌ কষা ভাল করে। তাহলেই সোজা হয়ে খেতে বসবে।

হাজার হোক কুটুম্ব তো বড়দি। লাথি কষাবো?

ভারি কুটুম্ব আমার! কষা লাথি বলছি। সিঁধে করে তবে নিয়ে আসবি। এনে আমার সামনে গরম ভাত বেড়ে দিবি।

কথা মত কাজ হল। নারায়ণ বিশ্বাসের গোঙানিতে ছায়া ছায়া জলা জায়গায় ছড়ানো ভয়ঙ্কর বনভূমির একটি লতা কি একটি পাতা আলাদা করে কাঁপলো না। বরং জল আর গাছগাছালির নিজের সুরের সঙ্গে সেই কান্না-কাটি, গোঙানি মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেল।

দুটি দাঁড়ি চ্যাং দোলা করে নারায়ণকে এনে পাটাতনে গরম ভাতের সামনে থেবড়ে বসিয়ে দিল।

ভাত মাখার মত হাতের অবস্থা নেই। সারা রাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখায় হাতটা এখনো বেঁকে আছে। অসহ্য ব্যথা। মাথার পেছনে কে যেন আধমন লোহা চাপিয়ে রেখেছে। সেই অবস্থায় চোখ তুলে চাইল।

সামনে যে তালুইতে বসে—তাকে কোনদিন দেখেনি নারায়ণ বিশ্বাস। তবে শুনেছে কেমন দেখতে। পায়ের পাতায় গরদের পাড়। মাথার চুল এলো করে ছাড়া, বাতাসে সর্বক্ষণ উড়ছে। মুখে কোন প্রশ্রয় তো থাকবারই কথা নয়। বরং সেখানে সামনের ভ্রূ কোঁচকানি। আর চোখের মণি—একেবারে সোঁদরবনের বুনো জাম। গাছতলায় পড়ে থাকলে হরিণেও খায় না। খেলে পাছে পাগল হয়ে যায়।

আপনিই বেয়ান ঠাকরুণ।

কোন রা পড়লো না লক্ষণ ওদের বউদির।

ডাকলেই আসতাম। এতসব দরকার ছিল না বেয়ান—

ওসব ডাকাডাকি থাক। কেওড়া কিচ্ কিচ্ আমি একদম পছন্দ করিনে।

ভাত এখনো গরম। সাবধানে ভেকে নারায়ণ বলল, জানি। বলি দেবার আগে পেট ভরে খাইয়ে নিচ্ছেন!

বলি নয়। শূলে চড়াবো। ছেলেটারে যদি ফেরৎ না পাই। আমি তোমায় পাঁচ বিঘে জমি লিখে দেব। আমার ছেলেটারে ফেরৎ দাও।

আপনার তো নাতি হয়েছে।

জানি। শশধরের সঙ্গে সেটাও চাই।

এক গরাস গরম গরম মুখে তুলে নারায়ণ বিশ্বাস রসিকতা করে বলল, সেই সঙ্গে নাতির মাকেও পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।

ধমকে দাঁড়িয়ে উঠলো শশধরের মা। তাতে নৌকা দুলে উঠলো। ও আপদ আমি ঘরে নেব না।

আপনার ছেলের বউ তো।

কে বলেছে? লুকিয়ে চুরিয়ে বে দিলে কি ছেলের বউ হয়?

আমরা আপনাকে আনার জন্যে বিয়ের সময় শশধরকে পই পই করে বলেছিলাম।

আমায় নিতে এলে তো শশধরকেই যেতে দিতাম না। আমি তখন পাথির আলায়। দু'দিন পরে খবরটা এল। তখন আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তুমি ফিরে যাও নারায়ণ। ফিরে গিয়ে আমার ছেলে—নাতিকে ফেরৎ পাঠাও।

আমি কেন শশধরকে বে দেব—

তাহলে আমার মেয়ের কি' হবে?—ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নারায়ণের। নির্মলার শাশুড়ির পায়ের কাছে একটা বন্দুক শুয়ে।

কেন শুধু শুধু কেওড়া কিচ্ কিচ, জুড়েছো? তোমার মেয়ে তুমি দেখবে। তুমি তার বাপ—তুমি দেখবে তাকে। আমার এই কারোবার শশধর এসে না দেখলে কে দেখবে?

অ।—বলে থম মেরে গেল নারায়ণ বিশ্বাস। থালার পাশেই বাটি ভর্তি বকের মাংস ধোঁয়া উড়িয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল। কারোবার মানে এই লুঠতরাজ চুরি চামারি আর কি! কিন্তু জোর গলায় বলাও যাবে না। কারোবারের সঙ্গে আরও একটি জিনিষ আছে। জঙ্গপুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। মধু বা কাঠ আনতে গিয়ে বাঘের পেটেও পড়া আছে। তা থেকে শশধর যদি সরেই আসে—তাতে মা হ'য়ে ফের বিপদের ভেতরে ডাকা কেন?

কি আমার কথাগুলো কানে গেল? পাঁচ বিঘে পয়োস্তি জমি লিখে দিচ্ছি। তোমার মেয়ের জমির ধানে জেবনটা চলে যাবে ভালো মত। কবে নাতি পাঠাচ্ছো?

সে জানে আপনার ছেলে।

অ। তা আমার ছেলেকে ফেরৎ দিচ্ছ কবে?

আমি তো আটকে রাখিনি। তার ছেলে বউ সেখানে। যা ঠিক করবার শশধরই করবে।

অ। তুমি তাহলে নিজের থেকে কিছু করছো না। আর বারবার নিজের মেয়েকে আমার ছেলের বউ বলে প্রিতিষ্ঠে দিতে চাইচ?

তা আমি তো মেয়ের বাবা। আমি নিজের হাতে নিজের মেয়ের গলা টিপে ধরি কি করে?

অ। বলেই বড়দি উঠে দাঁড়ালো। মুহূর্তের ভেতর বন্দুক তুলে কী তাগ্ করলো। সঙ্গে সঙ্গে গড়াম। পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিশাল এক পাখি দূরে জলা আর জঙ্গলের ভেতর অনেকটা জল ছিঁটিয়ে পড়লো।

সেদিকে না তাকিয়েই ঠাণ্ডা গলায় ওদের বড়দি বলল, কদ্দিন ধনেশ পাখি পড়েনি গুলিতে?

কাছেই পাশের নৌকায় একটা বিশাল লোক ছোট্ট উনুনে আলু ভাজছিল। সে একগাল হেসে বলল, আষাঢ় মাসে একটা পড়েছিল আপনার গুলিতে।

যা। ঢুকিয়ে নে আয়। আশপাশে শ্যালের বাসা থাকে।

এ কথার মানেটা নারায়ণ বিশ্বাস বোঝে। সে একটা বয়সে এইসব জঙ্গলঘেরা নদীর গায়ের জলা জায়গায় একা মাছ ধরে বেড়াতো। তখন দেখেছে, নদীর গায়ে মাটির নিচে চাপা পড়া ঘরবাড়ির মাথা। কোন এক-সময় হয়তো লোক বসতি ছিল। এখন সেসব জায়গায় গর্ত করে শেয়াল, বনবেড়াল, খট্টাস এমনকি গুলবাঘও থাকে। বিষধর সাপের তো কথাই নেই। ওখান থেকে ধাড়ি একটা শেয়াল বেরিয়ে এসেই টুক করে জখম ধনেশটা মুখে করে পালাতে পারে।

সেই বড়সড লোকটা হাঁটু জল ভেঙে এগোচ্ছে। হাতে কোচ। পথে মাছ চোখে পড়লে গেঁথে তুলে নেবে।

বাটি উল্টে বকের মাংস সবটাই ঢাললো পাতে। তারপর এক এক গ্রাস মুখে দেয় নারায়ণ বিশ্বাস—আর নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে থাকে। কি স্বাদের জিনিস। কতকাল বগার মাংস খাইনি। ভাগ্যিস বেয়ানের লোক টুপ করে আমায় বাঁশের সাঁকো থেকে পেড়ে নিয়েছিল। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই নারায়ণ বিশ্বাস একখানা শক্ত হাঁড় চিবোতে চিবোতে নিজেকে বলল, এ-দুনিয়ায় সহজে কোনদিন কিছুই পায়নি। এমনকি গাছের একটা ফলও। কিংবা কানে হাঁটা কোন ভোমা কই। তাই আপাততঃ যা পাওয়া যাচ্ছে তা বেশ সুখ করে খাই না কেন?

ও লক্ষণ ভাই। আর দু'টি ভাত দাও গরমা গরম। কতকাল বগার মাংস খাওয়া হয় না।

নৌকার পাটাতনে দাঁড়ানো বডদি চেঁচিয়ে বলল, ভাত দে। মাংস দে। ভাল করে সাটাক।

এটা শশধরের মায়ের ঠাট্টা?' না, কুটুম্বকে যত্ন আত্তি? ঠিক বুঝে উঠতে পারল না নারায়ণ বিশ্বাস। এটা তার ফাঁসির খাওয়া নয়তো? যা থাকে কপালে থাক না। মাথা নিচু করে খুব মন দিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল নারায়ণ বিশ্বাস। সুন্দরবনের নদী-নালায় গাছগাছালির ভিজে ছায়ার ভেতর ভাদ্র মাসটা ততটা কষ্টের নয়। বরঞ্চ এসব সময় পচা ভাদ্দরও আরামের।

নিজের বাবার কথা কিছু বলতে পারেনি শশধর। কেননা খুব ছেলে-বেলায় সে একবার মোটে ওর বাপকে দেখেছিল। চাদ্দিক জল। তার ভেতর পুলিশ এসে তাদের নৌকায় ওঠে। সে তখন তার মায়ের কোলে বসে। দু'পাশের জল দেখেছিল। এমন সময় আচমকাই পুলিশ এসে হানা

দেয়। মায়ের চেয়ে বাবা নাকি বড় ছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বাবা। নিচের চোরা ঘূর্ণি তাকে তলিয়ে নিয়ে যায়। কোনদিন আর ভেসে ওঠেনি শশধরের বাবা। স্বামীর জায়গা নিতে নিতে শশধরের মায়ের বছর তিন কেটে যায়। তারপর থেকে শশধর মায়ের সঙ্গেই পালাতে পালাতে বেড়ে উঠেছে। মায়ের সঙ্গে লুঠপাট, চোরাগোপ্তা শিকারের সঙ্গেই শশধর কিশোর হয়ে ওঠে। ততদিনে তার মায়ের নামে বিশ দফা হুলিয়া। এখন তো পুলিশ, পুরুষ, হরিণ, মৌচাকের মৌমাছিও শশধরের মাকে ডরায়।

খাবার পর নারায়ণ-কে কিছুটা ঘুমে ধরেছিল। জেগে উঠে দেখে শশধরের মা বড় নৌকাখানার ছইয়ের ওপর উঠে বসে দূরে কী দেখার চেষ্টা করছে। চারদিকে জল আর জল। কখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে টের পায়নি নির্মলার বাবা।

আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি বেয়ান?

নারায়ণকে ভ্রূক্ষেপও না করে শশধরের মা চেঁচিয়ে হালের সিঁড়িতে-লোকটাকে বলল, এখন তো ভাটা। সন্ধ্যের আগে ভেড়াতে পারবি সবাই মিলে?

ছ'ছখানা নৌকো থেকে একসঙ্গে পাখির ঝাপটার ঢঙে গলা উঠে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ক'খানা নৌকোতেই পাল তোলা হল।

নৌকো তখন খর গতি। সূর্য এসব জায়গায় সরাসরি আলো দেয়। অন্তহীন জল সেই আলোয় কোটি কোটি বোতল ভাঙা তরল কাচ হয়ে গিয়ে নতুন নতুন ঢেউয়ে গা এলিয়ে দিচ্ছিল। তারই ভেতর নারায়ণ আবার জানতে চাইল, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি বেয়ান?

আঃ। আবার কেওড়া কিচ্‌ কিচ্‌? ও লক্ষণ—বলেছিলাম না এটাকে বেঁধে রাখো নৌকোর খোলে।

না না বেয়ান। অমন হুমকি আর দেবেন না। এখনো আমার বাঁ হাতখানা ঝাল ব্যাল করছে।

লক্ষণ তখন ভারি গলায় জানালো, উনি তো তখন ঘুমোচ্ছিল। বাঁধলে জেগে যেতো।

একথায় ওদের বড়দি একবার কটমট করে তাকালো। আর কথা বলিস না। সন্ধ্যের আগে পৌছতে পারবো তো? দেখিস কিন্তু—

ছ'খানা নৌকো থেকে একসঙ্গে অনেকজন—হ্যাঁ—হ্যাঁ বলে উঠলো। নৌকোগুলো আরও খরগতি হয়ে উঠলো।

শশধরের মা নিজে নিজেই বলল, রাতটা আজ মাচায় কাটবে কিন্তু—

আস্তে আস্তে চারদিক জলের ভেতর সন্ধ্যের আবছা আলোয় গাছপালা সমেত একটা ডাঙ্গা ভেসে উঠলো। অন্ধকারে নৌকায় বসেও নারায়ণ টের পাচ্ছিল, নতুন গজানো এ-ডাঙ্গার ওপর দিয়ে দিব্যি জল খেলে যাচ্ছে।

খানিক বাদে গোড়ালি ডোবা—কোথাও বা আরও বেশি জল ভেঙে হাঁটতে হল নারায়ণকে বেশ খানিকক্ষণ—অনেকের সঙ্গে। পুরো দঙ্গলটার আগুপিছু একা‍া করে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। নৌকাগুলো খাড়ি-খালে গাছ-পালার আড়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে এই যাত্রা। বাইরে থেকে নৌকোর ছই বা কিছুই চোখে পড়বে না।

ডেরায় পৌঁছে নারায়ণ স্বস্তি পেল। জায়গাটা মাটি কেটে উঁচু করা। ওপরটায় ভাল করে গোলাপাতায় টানা ছাউনি হবে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। ছাউনির নিচে ডেরা বলতে বাঁশের মাচা। রান্না থাকার জন্যে ওরই ভেতর চ্যাচাড়ির দেওয়াল ঘেরা ঘর।

হাত পা তুলে একটা মাচায় বসে নারায়ণ বলল, এভাবে বসে রাত কাটাতে হবে নাকি? এর চেয়ে নৌকোয় থেকে গেলে পারতাম।

চ্যাটাই ঘেরা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল বড়দি। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তাই নাকি! যা তো কেউ ওকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে আয় তো।

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ মাচায় উঠে বসলো হাত পা তুলে। সবাই রীতিমত ক্লান্ত। কেউ তাই অন্য কাউকে আর দেখতে পেল না। ভোর ফুটে ওঠে এখানে অনেক ভোরে। সারা গায়ে ব্যথা নিয়ে নারায়ণ যখন উঠে বসলো —তখন সে প্রথমেই দেখতে পেল—শশধরের মা জল ভেঙে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে শুধু জল আর জল। ডাঙ্গায় আর জল নেই। তবে ভিজে পাঁকে আগাগোড়া দই হয়ে আছে। পা না পিছলে বেয়ান অতটা এগোলো কি করে? আশ্চর্য!

রোদ উঠলে সবই দেখতে পেল নারায়ণ বিশ্বাস। অনেকটা মাটি কাটিয়ে তবে ডেরা বাঁধা হয়েছে। এ তবে কোন আনকোরা দ্বীপ। কতটা বড় বোঝা যাচ্ছিল না। ঘরের পেছনে ঠেকনো দিয়ে একখানা জালি বোট দাঁড় করানো। বেয়ান বোধহয় একা একা বেয়ে বেড়ান। বারান্দা মত জায়গায় একটা কেরোসিন ইঞ্জিন ত্রেপলে ঢেকে রাখা। নারায়ণ চিনতে পারলো। এরকম ইঞ্জিন বোটে বসিয়ে ঝড়ের গতিতে ঘোরা যায়।

গাইয়ের ডাক শুনে নারায়ণ তো অবাক। এখানে গাই বাছুরও মজুত।

ঘুরে দেখতে গিয়ে দেখলো—উঁচু জায়গায় ছ'সাতটা গটে বাছুরের বাথান। গোটা দুই ষাঁড়। খড়ের বড় মজুত। বেয়ান কি এখানে চাষ লাগাবে? হালও রয়েছে। এতসব নৌকোয় করে কতদিন ধরে এনেছে তাহলে? এসব দেখতেই কি শশধরকে কাছে চাই বেয়ানের?

গোয়ালের পেছন দিককার ডাঙা জায়গা যেন ওপর দিকে উঠে গেছে। সেদিকটার জমিও চষা। লোকজন সব যে যার কাজে ছবির মতই ঘুরে বেড়াল।

নারায়ণ বিশ্বাস শশধরের মায়ের এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তো থ। একা মেয়েছেলে হয়ে কত কাণ্ডকারখানা করে বসে আছে। এর পরও তার নিজের নির্মলা নামে একটা সামান্য মেয়েকে মেনে নিতে পারছে না বেয়ান? দুনিয়ার সব ভাল হতে হতে পুরো ভাল হয় না কেন? এ এক আশ্চর্য কাণ্ড। সব জায়গাতেই নারায়ণ এ অবস্থা দেখে আসছে।

শশধরের মা কাদা পায়ে ফিরে এসেই প্রথমে জানতে চাইল, আমার ছেলেকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি তো তোমার মেয়ের জন্য পাঁচ বিঘে জমি দিচ্ছি।

ছ্যাখেন আমি মনসার গান গাই। সাগরে ভাসা জাল ফেলে মাছ ধরি। আমার ভাগ্য কোনদিনই খুব ভাল না। মনসার মত পুজো পত্তনের জন্যি জেদের বসে আমারে যেন চাঁদ বেনের দশা করবেন না। আমি সামান্য লোক। আমায় ছেড়ে দেন বললাম।

দিচ্ছি বলে নিজের চ্যাটাই ঘরে ঢুকে গেল শশধরের মা।

একা বসে বসে যতদূর চোখ যায় দ্বীপটা দেখছিল নারায়ণ। এমন সময় দুই খালি গা লোক—পাচন হাতে এগিয়ে এল। ও বিশ্বেস মশাই—চল তোমার ডাক হয়েছে।

অবাক হয়ে তাকাল নারায়ণ। এই মাত্র হাল চষে অমন চেহারা। দ্বীপের ওদিকটা তা হলে উঁচু। কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কোথায়?

হাল চষানী ছ্যাখবা না? একদম ওলানী মাটি! চল—তুমি-তো আমাদের কুটুম ছ্যাক্কাৎ!

হেই মা মনসা! মনের মধ্যে এই ডাকটা তুলে দিয়ে নারায়ণ বিশ্বাস ভাবলো, এই বুঝি তার ভাগ্য ফেরার শুরু। অত বড় জমির সামনে থেকে শশধরের মা ভোরবেলা ঘরে ফিরেছে নিশ্চয় বদলে যাওয়া মন নিয়ে। নয়তো কাজ কর্মের লোক অত ভাল কথা বলে?

. গোহালের দিককার উঁচু জমি ধরে ওপরে উঠে নারায়ণ বুঝলো—দ্বীপটা এদিকে উঁচু। এখনো দুরে দুয়ে উড়ে আসা পাখির বয়ে আনা বীজে নানান কিসমের গাছ গজাচ্ছে। নানা দেশের গাছ। ভাল করে ঘাস হলে তবে না এখানকার মাটি দানা বেঁধে সরেস বসতির যোগ্য হবে!

হঠাৎ চোখে পড়ল—চষা মাটিতে ভোরের রোদ্দুর একদম ঝলকাচ্ছে। আর তার মাঝখানে হালে মইয়ে জোতা দুই পেল্লাই সাইজের বলদ। বেয়ান করেছে কি? কতদিন ধরে এখানে আবাদ বসাচ্ছে!

এসো। ইদিকে এসো।

মইয়ে দাঁড়িয়ে ঢেলা মাটি গুঁড়োনোর আগে ওরা দু'জন নারায়ণকে ডাকলো।

কেন?

এসোই না। তুমি হলে গিয়ে আমাদের কুটুম্ব। এই খোলসটা কোন সাপের বল দিখি? বলে ওদের একজন সাপের একটা ফেলে যাওয়া খোলস দ্বীপের বাতাসে তুলে ধরতেই সেটা ফর ফর করে উড়তে লাগল। যেন বাতাসে উড়ে বেড়ানো পোকামাকড় ধরার ফাঁদ।

এই রে! অমাবস্যা কবে গেল খেয়াল নেই তো। —এ কথা মনে মনে বলে ঢেলা ওল্টানো চষা জমির ওপর দিয়ে ওদের কাছে কোনমতে টালমাটাল হয়ে গিয়ে পৌঁছালো নারায়ণ বিশ্বাস। তারপর দম নিয়ে বলল, এ নিশ্চয় দাঁড়াস—মেটে দাঁড়াসের ছাড়া খোলস --

তার কথা শেষ না হতেই খালি গা তাজা দুই জোয়ান নারায়ণ বিশ্বাসকে কবজা করে ধরলো। এই তোমায় কুটুম্ব জুৎসই করে পালাম- এবার মজা স্তাখো—

কর কি? কর কি তোমরা?

তখন ওরা ভাল করে বাঁধছে নারায়ণকে। দিনটা ভাল করে শুরু হয়নি তাহলে আজ। বাধা দিতে গিয়ে এক চড় খেয়ে বুঝলো, আজ কিছু তার কপালে আছে। ছেড়ে দাও বলছি—

পেছন থেকে শশধরের মায়ের গলা ভেসে এল। মইয়ের সঙ্গে বেঁধে ভাল করে মই দিয়ে দে --

রোদে সারা গা ভিজে যাচ্ছিল নারায়ণের। সেই অবস্থায় গরুর দড়ির শক্ত গেরোয় হাত দু'খানা বাঁধা। বেশি লম্বা লোকটা হঠাৎ এগিয়ে তার পাছায় লাথি কষাতেই নারায়ণ এবড়ো খেবড়ো চষা জমিতে হুমড়ি খেয়ে

পড়লো। আর তখনি কঞ্চি পড়লো বলদের পিঠে।

বুকের চামড়া, তলপেট, মুখ—পায়ের দিকটা—নারায়ণের সবটাই ঢেলা মাটিতে ছড়ে যাচ্ছিল। বাঁচাও। ওঃ। মরে গেলাম। বাঁচাও—

নারায়ণের মরণ চীৎকার শোনার কেউ নেই। তার বদলে দুই খালি গা দাঁত বের করে হাসছে। কিছু শুনতে পাচ্ছে না নারায়ণ বিশ্বাস। এক সময় দেখলো, শশধরের মা ওদের কি বলে ভাঙ্গা জায়গা থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে।

বলদ দুটো তখনো হয়তো ভাবছে—যদি ভাববার ক্ষমতা থেকে থাকে—ঢেলা গুঁড়োনোর জন্যে স্রেফ একটা ওজন চাপানো হয়েছে মইয়ে। নারায়ণ বিশ্বাস তখন মই থেকে পিছলে ঢেলা মাটিতে। তার নাক ফেটে গিয়ে ডান চোখে মাটি মাখানো রক্ত ঢুকে গেল। যেন ছোট জায়গার গা দিয়ে ঢোকানো কাঠের কোন বাটাম। উঃ। সে যন্ত্রণার কোন নাম নেই।

নারায়ণ বিশ্বাস চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমি মরে যাচ্ছি! আমায় ছেড়ে দাও—

মই যখন থামলো—তখন নারায়ণ অচৈতন্য। ওরা ধরাধরি করে এনে চ্যাটাই ঘরের বারান্দায় শুইয়ে দিল। জলের ছিটেয় চোখ মেলেই নারায়ণ শশধরের মায়ের গলা শুনলো, একটু চাঙ্গা করে ফের নিয়ে যা। সিধে হবে তাহলে—

শুনেই নারায়ণ চোখ বুজে ফেলল। আর জ্ঞান হারালো। বাঁ চোখের ভ্রূ ছেচড়ে উড়ে গেছে। গায়ের জামাটা গোসবায় বর্মণ বাড়ি গান গেয়ে পেয়েছিল। সেটা ছিঁড়ে ফালা ফালা। ধুতি জট পাকিয়ে ট্যানার দশা। তারই ভেতর সে স্বপ্নে দেখলো নেতা ধোপানীর ঘাটে এসে পৌঁছালো বেহুলা আর তার ভেলা। তাতে লখীন্দর চোখ বুজে শুয়ে।

পরদিন শ্রীদাম যাবার বাস ডিপোয় এসে যখন শশধরের মায়ের নৌকো তাকে নামিয়ে দিতে গেল—তখন নারায়ণ বিশ্বাস জ্বর গায়ে থর থর করে কাঁপছে। ব্যথা বেদনার জ্বর। সেই অবস্থাতেই সে বাস রাস্তায় বসে পড়লো। বসতেই ঢলে পড়া। তারপর আর তার কিছু মনে নেই। রাস্তার লোকজন দেখলো, আরে! মনসার গান গায় নারায়ণ বিশ্বাস—মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

কেউ বললো, নারাণ তো মারপিট করার মানুষ নয়। তাহলে? কেউ নিশ্চয় মেরে ধরে ফেলে রেখে গ্যাছে। কারা মারতে পারে? নারাণের

তো কোন শত্তুর নেই। তাহলে কে মারতে পারে? কোথায় গাইতে গিয়েছিল? সঙ্গে তো কেউ নেই নারায়ণের।

খবর রটে বাতাসের আগে। শশধর ছুটে এল। বাঁশের ডোঙা করে—লোক করে যখন বাড়ি পৌঁছালো—তখন নারায়ণ যায় যায়। শ্রীদাম থেকে তিন তিন মাইল হাঁটা পথের হাঁটুরে ঝোঁকে একটা ঝাঁকুনিও তো আছে। সাগর বাজার থেকে ডাক্তার এল। ওষুধ এল।

শশধরের শাশুড়ি সেক তাপ দিয়ে চলল। সেই সঙ্গে বাড়ির ভিমটা। পুকুরের মাছটা। গাছের ফল পাকুড়টা। দিন দশেক বাদে নারায়ণ বিশ্বাস উঠে বসলো বারান্দায়। আশ্বিনের আকাশে ছেঁড়া মেঘ। দূরে তাকালে সাগরের অন্তহীন ঢেউ ভাঙাভাঙি। একটা জাহাজ যাচ্ছিল কলকাতায় খিদিরপুরে। সেটা তো দিন। সকালবেলায় যেন বড় সমুদ্দুরের হাঁস।

নির্মলার ছেলে বছর ছয়েকের। জানতে চাইল, কারা তোমায় মেরেছে দাদু?

জানি না।

তোমার গানের বায়না নিয়ে এসেছিল কারা। দিদ্‌মা টাকা নেয়নি। তাদের ফেরৎ পাঠিয়েছে।

নারায়ণ কোন কথা বলল না। তখনো তার মাথা ঘুরছিল। চোখের সামনে সব সময় যেন কী কাঁপে। নারায়ণ বুঝলো—তার নিজের অসুখে নির্মলার ছেলের দিকে এতদিন বিশেষ কেউ নজর দিতে পারেনি। যেন একটা চাপা দুঃখ ওইটুকু মানুষের মুখে, চোখে জমে আছে। একবার ভাবলো—কাছে ডাকে। ছেলেটা একখানা কঞ্চি হাতে উঠোনের গায়ে কচু গাছে পেটাচ্ছিল। ডাকতে গিয়েও ডাকলো না নারায়ণ বিশ্বাস। কি হবে জেনে? শত্তুর। শত্তুরের নাতি। ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে খচ্ করে লাগলো। এখনো চোখ বুজলে নারায়ণ স্পষ্ট দেখতে পায়—দশাসই দুই বলদের আটখানা পা উঠছে—পড়ছে। ওল্টানো মাটির চাঙড়ের এবড়ো খেবড়ো গা। আর আড়াআড়ি শোয়ানো একখানা মই। সব কিছু থেকেই যেন রক্তের শুকনো গন্ধ উঠে আসে।

মাছ ধরবে না দাদু? ক'দিন ওরা মাছ ধরলে তোমায় দিয়ে গেছে।

তাই নাকি।

অনেক তুপসে মাছ পড়েছিল। বাবা একটা বড় শংকর মাছ পেয়েছিল। খুব খেলাম।

তোর বাবা কোথায় রে?

এই তো নৌকোর পিঠে গাবের আঠা মাখাচ্ছিল।

কেন? কেন রে?

বাবা বলছিল, এবার থেকে সওদা নিয়ে বাবা নিজেই কচুবেড়িয়া অব্দি যাবে।

তোকে নিয়ে তোর বাবা এ ক'দিন বেড়ায়নি?

কি করে যাবে। তোমার তো এখন তখন অবস্থা গেল।

খুব কথা শিখিছিস। নেঃ। যাঃ। পালা এখান থেকে। কথা বলতে বলতে নারায়ণ বিশ্বাস দূরে কপিল মুনির মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল। হাত মাথায় ঠেকিয়ে উঠোনে নেমে একা একা দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পারলো না। এখনো দুই হাঁটু কাঁপে। চালের খুঁটি ধরে টাল সামলালো নারায়ণ। যে জীবনে সে এখনো চোখে দেখতে পাচ্ছে—সে জীবনের আর সে কেউ নয়। এটাই বুঝতে পেরে নারায়ণের ভীষণ এক অজানা কষ্ট হল। সমুদ্রের জলের পা দিয়ে উঁচু বেলে জায়গায় তরমুজ তোলার পর মাদা করা জায়গা পড়ে আছে। মাছ ধরতে দশ গাঁয়ের জোয়ান বুড়োরা চলেছে ভাসা লম্বা জালের গোছা বগলে নিয়ে—দুলতে দুলতে। জালের ভারি কেঠো কাঠি ঝুলে পড়েছে। আজ এখন অনেকটা জায়গা জুড়ে জাল বসাবে। কাল এই সময় জোয়ার ভাটা পার করে দিয়ে তবে জাল তোলা হবে। নারায়ণ বিশ্বাসের পক্ষে আর কি ওই ভারি কাজে যাওয়া সম্ভবপর হবে। বুকের ভেতর হাড় একখানা দু'খানা কি আর ভাঙেনি। নয়ত এত ব্যথা কেন? সে আর কোনদিন বোধ হয় ওদের সঙ্গে জলে যেতে পারবে না।

ঠিক এই সময় নির্মলার ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে বলল, দাদু? মাছ ধরতে যাবে না?

ধমকে উঠলো নারায়ণ বিশ্বাস। চুপ কর। বলতে বলতে বারান্দায় বসে পড়ল। তার নিজের চোখের বড় ফোঁটার জল নির্মলার ছেলের কচি আদুরে চেহারাটা ঝাপসা করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বলল, আহা! কাকে বললাম। আমি যদি এ দুনিয়াতে আর নাই-ই থাকি—যদি বিমান ঠাকরুণ আরেকবার দয়া করে ডেকে নেন তো ফিরে আসার কোন পথই থাকবে না— তাহলে তো এই কচি মুখখানাই এই দুনিয়ায় আমার সবেধন চিহ্ন।

এসো দাদুভাই। এসো। এবার যখন আবার তরমুজ উঠবে—তোমায়

নিয়ে সাগরের ধারে বসে দু'জনে খাব।

হ্যাঁ দাদু। একদম তরমুজের বুকের মাংস খাব।

বেশ তো। তরমুজ উঠবে তো আবার। বলতে বলতে নারায়ণ বিশ্বাস বাতাসে মাছের সেই স্বাস্থ্যকর আঁসটে গন্ধটা পেয়েই বুক ভরে নিঃশ্বাস টানলো।

এমন সময় শুকনো উঠোনে নির্মলার মা এসে দাঁড়ালো। নাকে আগেকার কালো ঝোলা পাথর। কানে মাকড়ি। নারায়ণের দেখেই মনে হল—এ বুড়ি তো সমুদ্দুরের বয়সী। উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে হাসছে যেন—সাগরকে জন্মাতে দেখেছে। কত জানে! কত গুপ্ত কথা জানে বলে সারা গায়ে একটা দেমাক ছড়ানো।

তার কাছে এগিয়ে এসে নির্মলার মা বলল, সে তোমায় অমন মার মারলো? কেন মারলো? বললে না তো।

চুপ কর। খালি এক কথা। জানি না!

ধমকানিতে নাকের পাথর দুলিয়ে নির্মলার মা সাগরের দিকে মুখ ঘোরালো। আবার বড় সাগরের একটা হাঁস এখন এই জল দিয়ে যাচ্ছে। যাবে কলকাতার খিদিরপুরে

নারায়ণ বিশ্বাস অবাক হল। কোথায়—শশধর তো একবারও জানতে চায়নি—কে তার শ্বশুরের এমন দশা করলো।

গান শোনবেন তো আগে বলেননি কেন? এখন তো যাবার সময় হল।

নারায়ণ বিশ্বাসের এ কথায় অশোক ঘোষাল বলল, একটু আস্তে গাইলে ভাল। ফ্ল্যাট বাড়ি তো!

মিঠু চা দিয়ে বলল, বাবা সেই গানটা গাও। যেখানে মা মনসা—

চেয়ারে বসে ছিল দীপা। তেতলার ওপরে ফ্ল্যাট। নভেম্বরের সকালের রোদে সামান্য তাপ। ইলেকট্রিক জেনারেটিং স্টেশনের পোড়া কয়লার গুঁড়ো নিয়ে লরির সারি চলেছে—যাবে কলকাতার বাইরে।

দীপা বলল, তোর বাবাকে নিজের ইচ্ছে মত গাইতে দে না। বাবা গান জানে বলে খুব গর্ব—না?

মিঠু আনন্দে হেসে ফেলল।

অশোক এই মেয়েটার মুখে হাসি দেখলে খুব খুশী হয়। ক'বছর হল

কলকাতায় এসে এবাড়ি ওবাড়ি খেটে বড় হচ্ছে। কোন কথা না বলে বাড়ির কাজ করে যায়। দীপার কথায় ওকে অশোকের জ্ঞানপীঠ দেওয়া বন্ধ। কেন না, টিপস্ দিলে নাকি কাজের লোক বয়ে যায়। ওর মুখের হাসি এখন অশোকের কাছে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। যাক—এরকম একটা মেয়ে তো খানিকক্ষণের জন্যে সুখী।

নারায়ণ বিশ্বাস মাসকাবারী আদায়ে বেরিয়ে এখানে এসেছে। পায়ে পাম্পসু। গলায় চাদর। গায়ে লাল একটা বেঢপ সোয়েটার। কলারওয়ালা শার্ট।

দীপা বলল, এ সোয়েটার কেনা হয়েছে?

না। আমরা সোয়েটার কিনবো কোত্থেকে। সন্ধ্যারাণী দিয়েছে। কাজের ফাঁকে বুনেছে। তা মা গান শুনতে চেয়েছেন—এক কাপ গরম চা দিন।

অশোক ঘোষাল আবার বলল, একটু আস্তে গাইলে ভাল। চারদিকে ফ্ল্যাট বাড়ি তো।

জোরে আর গান বেরোয় না আমার।—বলেই একটা সিগারেট ধরালো নারায়ণ বিশ্বাস। বসার ভঙ্গী—কথায় চাল—বৈঠকী মেজাজ দেখে কে বলবে এই মানুষটির চারটি মেয়ে কলকাতায় বাড়ি বাড়ি কাজ করে। একটি ছেলে রাণী কুঠীর দিকে শ্রীকলোনীতে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে।

নারায়ণ বিশ্বাস সিগারেটে সুখটান দিয়ে বলল, গানও জোরে গাইতে পারি না আর—সিগারেটও আগের মত আর টানতে পারি না—

মিনু ধোঁয়া ওড়ানো চা দিতেই সুপ সুপ করে খেয়ে ফেলল নারায়ণ বিশ্বাস। দীপা মিনুকে ফিস ফিস করে বলল, তোর বাবার গলা কি চিনে মাটির?

কেন?

একটুও গরম লাগে না—

ও:! আমার বাবা সব পারে।

ততক্ষণে গান ধরে ফেলল নারায়ণ—

আমার বিষের তেজে, নীলকণ্ঠ দেবরাজে,
আপনে হইল অচেতন।
কিসের না বরবাও, মাথা তুলিয়া চাও,
যুদ্ধে হারিলা রবির নন্দন॥

বেশ খোলা গলা। তবে গ্রাম দেশে চেঁচিয়ে গাইতে হয় বলে জায়গায় জায়গায় চিরে যাচ্ছিল। ওসব জায়গায় তো মাইক নেই। এই গানই শুনতে

শুনতে মিনু চোখ বুজে ফেলেছে। নারায়ণ বিশ্বাসও চোখ বুজে গাইছিল।

এই গলা—আর বাপ মেয়েতে চোখ বুজে ফেলায় দীপা হাতের বইতে মুখ ঢেকে হাসছিল। হাসছিল না অশোক। ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিনবার গেয়ে নারায়ণ বিশ্বাস চোখ খুললো।

বাঃ! বেশ পাকা গলা—

উৎসাহ পেয়ে নারায়ণ বিশ্বাস বললো, আমি তো মূল গায়েন নয়। হাসবেন বই কি। আমি তো স্রেফ ধুয়ো ধরি।

ওমা! কখন হাসলাম? বলে দীপা আরেক তোড হাসির ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকল। লোকটা চোখ বুজেও দেখতে পায় তাহলে। দারুণ ঝগড়াটে তো মিনুর বাবা।

ধুয়োটা শোনেন মা। খারাপ লাগবে না আপনাদের—

যম রে কেন আইলা যুদ্ধ করিবারে—

বিজয়গুপ্ত কহে এবার মোর গতি নাহি আর,

সভাসদে কর সম্মান॥

লম্বাটানে ধুয়া শেষ করে দিয়েও থামল না নারায়ণ। হাতজোড় করে অশোক দীপাকে নমস্কার করলো। তারপর বলল, সবাই হাতজোড করুন—নিন এবার গলা মেলান—

মণিগণ-মণিগণ ভূষিতে নমস্তে

খরতর বিষধর কঙ্কণ হস্তে।

বহুজন জননী জয়ধ্বনি হস্তে

ভগবতী বিষহরী দেবী নমস্তে॥

অশোক বা দীপা তখন তখনই গলা মেলাতে পারলো না। মিনু কিন্তু দিব্যি মেলাচ্ছিল। নারায়ণ বিশ্বাস বলল, বাজার থেকে একটা ফুল এনে কাছে পিঠে পুকুরে ভাসিয়ে দেবেন। তারপর নিজেই বলতে লাগল—

মনসে বরদে মাতঃ রোগ শোক বিনাশিকে।

প্রসীদ মম সর্ব্বেশে দেবী তুভ্যং নমহস্তুতে॥

নারায়ণ থামলে অশোক ঘোষাল জানতে চাইল, কী ফুল আনবো?

যেকোন একটি ফুল।

পুকুর তো নেই। গঙ্গায় ফেললে চলবে?

সে তো আরও ভাল। বলে নারায়ণ বিশ্বাস উঠেছিল, এমন সময় সদরে কলিং বেল বেজে উঠলো। মিনু গিয়ে দরজা খুললো—ওমা! মেজদা—

দীপা চেয়ারে বসেই বলল, শরৎ এসেছে—

শরৎ ঘরে ঢুকেই বলল, কী নারায়ণ—তোমাদের ওখানে এখন বড় বাগদা উঠছে কেমন ?—পাওয়া যাচ্ছে ? এখন তো সিজনের শেষ—

আপনারা বিদেশে চালান দিয়ে দিয়ে তো ফুরিয়ে দিলেন। আমি উঠি যে মিনু। ওই ঠিক থাকলো—

হু। সাবধানে যেও। আমি দিদিদের সঙ্গে নবান্নে যাচ্ছি। আর তো ক'দিন বাদেই।

এক বিঘের চাষা আমরা মা। আমাদের আবার নবান্ন কিসের!

নারায়ণ বিশ্বাস চলে গেল। মিনু আর দীপাও উঠে গেল। শরৎ হাতের অ্যাটাচি ব্যাগটা মেঝেতে রেখে সোফায় বসলো। অশোক দেখলো, খুকীর ভাসুর রীতিমত রোগা হয়ে গেছে।

তা ঐ মশায় আজ তো উনি আসছেন। বেলা আটটার ফ্লাইটে। সাড়ে দশটায় নিজাম প্যালেসে এসে উঠবেন। নয়তো আলিপুরে মিনিস্ট্রির নিজের গেস্ট হাউসে গিয়েও উঠতে পারেন।

ওঃ! ফাইনান্স মিনিস্টার ? বলেই অশোক নিজেই একটা ঝাঁকুনী খেল। এতক্ষণ এ ঘরের সবাই নারায়ণ বিশ্বাসের মনসার গানের জগতে ছিল। সেখান থেকে মন্ত্রী, গেস্ট হাউস, প্যালেস, এরোপ্লেনের ফ্লাইট। এ এক বিরাট লাফ। ঝাঁকুনিতো লাগবেই। সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু বলতে পারলো না সে। চাঁদ সওদাগরের জন্যে মা মনসা দুর্ভাগ্যের পাহাড় নিয়তি করে সাজিয়েছিল। আর শরৎ সওদাগরের জন্যে ব্যাংক তার হাসিমুখখানা এখনো দেখায় নি। অথচ না দেখানোর কোন কারণ নেই। ভুল সময়ে কম টাকা দিয়েছো তোমরা। ভুল শুধরে শরৎ সওদাগরকে আবার চাঙ্গা করে টাকা ফেরৎ পেতে হলে ব্যাংককেই ফের টাকা ঢালতে হবে। অন্তত দশ লাখ। নয়তো সবটাই ভরাডুবি। এটা অশোক ঘোষাল বোঝে। আর ব্যাংক বোঝে না ? হতে পারে না তা। ইচ্ছে করেই মুখ ঘুরিয়ে আছে। বাঁকা মুখ সোজা করতেই অর্থমন্ত্রীর কাছে যাওয়া দরকার।

আমি কিন্তু চিনি না ওঁকে। তবে সামনে গিয়ে সত্যি কথা বলবো।

হ্যাঁ। আবার কি ? দেশের মানুষের টাকা নিয়েছি। দেশের মন্ত্রীকে বলবেন। লজ্জা কিসের ?

আমার কোন লজ্জা নেই শরৎ। আমি যেকোন লোকের জন্যে যেকোন লোককে বলতে পারি। তাতে যদি তার কিছুটা ভাল হয়। এই বলাটাকে

অনেকে বিরাট কাণ্ড বলে মনে করে। মনে করে দারুণ একটা অবলিগেশনে চলে যাওয়া হল। না জানি অন্যের জন্যে কী করে দিলাম। তারা ভুলে বসে থাকে শরৎ—অন্যে তার জন্যে এমন কতবার অবলিগেশনে গেছে! মনে করিয়ে দিলে স্মৃতিটা তাদের অস্পষ্ট লাগে। ভাবখানা—আমি যা আজ-তার সবটাই আমারই করা।

শরৎ চুপ করে গেল। এমন ব্যাপারে আপনাকে টানায় হেমন্ত তো খুব বিরক্ত আমার ওপর।

নিশ্চয় বলেছে—এর ফলে অশোক ঘোষালের ইমেজ, ইনট্রিগিটি, পার্সোনালিটি সব ধসে যাবে!

হু। আপনি জানলেন কি করে তা ঐ মশায়?

আমি এদের জানি শরৎ। ওকে বোলো, এখন থেকে পঁচিশ বছর পরে ওর মেয়ের জন্যে যদি ওকে কোথাও যেতে হয়, তখন কি ইমেজ এটসেটরাকে বাঁচাবে? না, মেয়ের দিকেই যাবে?

আমি আর কি বলবো বলুন। আমাদের জন্যে কি বাবা মাকে অভাবের দিনে দু'টো ডিমের জন্যেও পয়সা বাকি রাখতে গিয়ে ডিমওয়ালার কাছে অবলাইজড্ হতে হয়নি? আমি তো আমার বেড়ে ওঠার, বড় হয়ে ওঠার সবটা জানিনা তা ঐ মশায়।

ভাখো শরৎ আমার মা ক্লাশ থ্রি তেও পড়েননি। তাঁর ভাইবোনেরা ভাল ভাল জায়গায় ছিলেন। মা যে কতজনের জন্যে বলেছেন—করে গেছেন, তাঁরা সব আমাদের অনাত্মীয়-কিন্তু, আজও তাঁরা আমাদের পরমাত্মীয়। মা তো ইমেজ হারাননি। ইনট্রিগিটি ধসে যায়নি তাঁর।

তা চলুন। রেডি হোন।

বেলা এগারোটা নাগাদ আলিপুরের গেস্ট হাউসে পৌঁছে অশোক ঘোষাল আর শরৎ চৌধুরী জানলো, একটু আগে মিনিস্টার এসেছেন। বাড়ির সামনে ওয়্যারলেস ভ্যান। এক গাড়ি সিভিল ড্রেসের লোক। তাছাড়া আছে উর্দি। পার্টি থেকে সেক্রেটারি। সরকার থেকে সচিব। একান্ত সচিব। বিশেষ সচিব। জেলার লোক। ব্যবসায়ী। প্রাক্তন মন্ত্রী। এখনকার এম এল এ। বিরাট ব্যূহ পেরিয়ে অশোক ঘোষাল ডাক পেল স'এগারোটায়।

আমি যাবো তাঐ মশায়?

নিশ্চয়। সেই কাগজখানা নিয়েছো?

এই তো।

কাগজখানা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো অশোক। পেছন পেছন শরৎ। লাখ দশেকের দেনার চাপে চিন্তিত। ভাসতে হলে আরও অন্তত দশ লাখ চাই। ব্যাংকের কনসালটেন্সি ফার্ম আরও দশ লাখ দেবারই সুপারিশ করেছে সেই জোরেই শরতের কেসটা অশোক ঘোষাল ছোট্ট করে লিখে টাইপ করিয়ে নিয়েছে।

মন্ত্রীমশাই সুপুরুষ, হাসিমুখ, ভদ্র। সব শুনলেন। শেষে বললেন, কেস তো ভালই। নিরাশ হবার মত কিছু নয়।

আপনি দেশের মন্ত্রী। অনেক বেড়া ডিঙিয়ে সাহস করে এসেছি। আপনি ইচ্ছে করলে ভাল করতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে খারাপও করতে পারেন।

খারাপ করবো কেন? দিন কাগজখানা। বলে কাগজটা নিলেন। নিজের ছোট অ্যাটাচিতে রাখলেন। ভাববেন না—

অশোক বলল, ব্যাংক তো লিগাল অ্যাকশন নেবে বলে চিঠি দিয়েছে। দশ লাখ টাকা এখন কোত্থেকে দেবে? বরং ব্যবসা ফের চালু হলে—প্রত্যেক শিপমেণ্টে দিয়ে দিয়ে তিন চার বছরে সবটাই শোধ করে দেবে—

এ ব্যবসা শিখলেন কি করে?

মন্ত্রীর এ কথায় শরৎ বলল, আমার ছোট মামা এ ব্যবসা করেন। তাঁর কাছে ছিলাম।

অশোক ঘোষাল ঘরখানা দেখছিল। কলকাতায় এলে মন্ত্রী এ ঘরে ওঠেন। অনেকগুলো টেলিফোন। গেস্ট হাউসের মতই সিঙ্গিল খাটের বিছানা দু'খানা পাশাপাশি। লেখার টেবিল। জামা কাপড় রাখার বিল্ট-ইন অয়ারড্রোব। সত্তর কোটি লোকের টাকা পয়সার হিসেব রাখতে হয় ভদ্র-লোককে।

পরের ভিজিটর দরজায় এসে গেছেন। অশোকদের উঠতে হল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শরৎ বলল, সত্যি কথার মার নেই কোন। ভদ্র-লোকের ব্যবহারও ভাল।

এখন ভাগ্যে কি আছে ছাখো।

খুব খারাপই যদি হয় তো—ঠুক ঠুক করে একটা ফ্রিজার বসাবো। তার-পর যেমন যেমন শিপমেণ্ট হবে তেমন তেমন টুক টুক করে শোধ দেব। দশ বছর লাগুক।

সুদও তো অনেক টানতে হবে শরৎ।

তাই তো দশ বছর চলে যাবে শোধ করতে। আমি গোছাবার লোক নই।

গেস্ট হাউসের বাইরে শীতের দুপুর। অলস ট্রাম জাজেস কোর্ট রোডে বাঁক নিচ্ছিল। এ পাড়ায় কয়েকজন শিল্পপতির বাড়ি। কে কোনটায় থাকে তা জানে না অশোক। মাঝে মাঝেই হাই রাইজ বাড়ি। ঝাকড়া বিরাট বিরাট গাছ। ওরই ভেতর সাধারণের খাবার হোটেল।

চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেল রিকসায় রাস্তায় পড়তেই ঠিক উল্টোদিকের বাড়িটা—শরতকে ছেড়ে যাওয়া বউয়ের এখনকার স্বামীর পিসির বাড়ি। একথাও বিমলা জানে। বউকেও সে চেনে। আলাপ নেই। চেহারাটা চেনা।

বাড়িতে তেমন কাজ না থাকায় বিমলা বিকেলে গিয়ে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের সামনে সেই বউ নতুন স্বামী নিয়ে পিসশাশুড়ির বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নামলো।

দেখেই বিমলা শিউরে উঠলো। এই পাড়ায় এক সময় বউ হয়ে এসেছিল বাছাধন। আবার এই পাড়াতেই আরেকবাড়িতে বউ হয়ে আসা। গলার হারটা হয়তো মেজদারই দেওয়া। মেজদা মানে শরৎ।

বিমলা বিড় বিড় করে বলল, ধম্মে সইবে না। কিছুতেই না।

নতুন বউকে নিয়ে তার স্বামী তখন দোতলায় উঠছিল। শাড়ির পাড়টা দারুণ। পায়ে আলতা দেবার ঢং! স্বামীটা কি মেজদার মত সুন্দর নয়। এই বউটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে বিমলার নিজের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

ফের বিয়ে করার দু'মাস আগেও ওই বউ মেজদার কাছ থেকে হাতখরচা নিতে চৌধুরী বাড়িতে নাকি এসেছিল। তখন ওকে দেখেনি বিমলা। তখনো আলাদা হওয়ার মামলা চলছিল। পারলে দু'হাতের নখে বিমলা বউটার মুখ দাগী করে দিত। বিশ্বাসঘাতক! শ্রীকলোনীর পন্টুও তাই। এখন এক ভদ্দরলোক বাড়ির দু'তিনটে পাশ দেওয়া মেয়েকে নিয়ে খুব ঘুরছে। যত পারো ঘুরে নাও। দিন ঘনিয়ে এল বলে। বিশ্বাসঘাতক!! আমি দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতকদের চরম শিক্ষা দেব। কঠিন বদলা নেব। আবার বিড় বিড় করে বলল—

মা মনসা।

তুমিই ভরসা।

দোতলার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। ভক্তিমতী বউ এখন হয়তো পিসশাশুড়িকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। মা মনসা—তুমি তোমার একটা লতা আজই রাতে ওবাড়িতে পাঠাতে পারো না?

ওই তো মেজদা হেঁটে ফিরছে। মাথাটা ক্লান্ত শরীরে ঢলে পড়েছে। রাস্তা দেখতে দেখতে হাঁটছে। ব্যবসায় ঠিক এই সময়টায় লাট খেয়ে না জানি মনটা কত খারাপ। মেজদার জন্য তার মনটা টন টন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিমলা এক ছুটে বাড়ি চলে এল। মেজদা আবার মোড়ে দাঁড়ানো একদম পছন্দ করে না। ভাগ্যিস শীতের সন্ধ্যেটা ঘোলাটে, নয়তো মেজদা ঠিক দেখে ফেলতো।

মন্ত্রী ভরসা দিলেও ব্যাংকের অফিসাররা ফাইল নাডানাড়ির খেলা দেখাচ্ছে প্রায় মাসখানেক ধরে। বলছে মার্জিন মানি আগে। পার্টনার দেখাও। কত কি! এত সব যদি দিতেই পারবো তো মন্ত্রীর কাছে যাবো কেন? কিছু নেই বলেই তো এত দৌড়োদৌড়ি।

মাথার ওপর পাহাড় সাইজের এই দেনাটা না থাকলে চৌধুরী বাড়ী আসলে শান্তি বাড়ি। গেট খুলে বাঁহাতে পুকুর। পাশেই কাঠালী চাঁপার গাছ। এক একটা ফুল বাতাস মাতিয়ে রাখে। হেমন্তর ছেলে মেয়েও বাড়ি মাতিয়ে রাখে। দাদার মেয়েও হামা টানে এখন। কলকাতার ভেতর এতখানি জায়গা, বাড়ি, পুকুর—ব্যবসা করতে নেমে ব্যাংকে মর্টগেজ করা ঠিক হয়নি। ইদানীং তাই মনে হয় শরতের।

অল্পদিন হল মায়ের একখানা ছবি খাবার টেবিলের সামনে দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। খেতে বসে চুপচাপ দেখছিল শরৎ। মায়ের কোলে হেমন্ত। সে নিজে পাশে দাঁড়িয়ে। ছবিখানা অনেকদিন ট্রাঙ্কের ভেতর পড়েছিল। তাঐ মশায়ের কথায় শরৎ ছবিখানা বের করে ফটোর দোকানে দিয়ে এনলার্জ করে তবে টাঙিয়েছে। মা দেশের বাড়ি থেকে চিঠি লিখেছিল—তোমাদের দেখিতে আমার পাখি হইয়া উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে। এখন এখানে সারাদিন বৃষ্টি হইতেছে। তোমরা ওখানে ঠাণ্ডা লাগাইও না। ছোটো মাসির কথা শুনিয়া চলিবে। এক একদিন সারা আকাশ জুড়িয়া এখানে এমন মেঘ করে মনে হয় আর হয়তো কোনদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে না।

মায়ের কথাই সত্যি হয়েছিল। ভাই হতে গিয়ে হাতুড়ে ডাক্তারের ইঞ্জেকশনে মা কয়েক ঘণ্টার ভেতর মারা যান। আমরা তখন কলকাতায়। কলোনীর স্কুলে পড়ি। ওদেশে আয়ুব খাঁ তখন নতুন প্রেসিডেন্ট। হেমন্ত

বছর এগারো। আমি তের। যে আমাদের শুধু চোখের দেখার জন্যে পাখি হতে চেয়েছিল—সে এখন কোথায়! শরৎ আচাতে গিয়ে অন্ধকার টিউবয়েলের তলায় পরিষ্কার বুঝলো, আমাদের বাঁচার চেষ্টা—আমাদের সফল হওয়ার চেষ্টা অনেক সময় আমাদেরই তৈরি জটিলতায় জড়িয়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ঠিক এখন ফের বেঁচে উঠে আমাদের এতটা বড় দেখে মা কি চিনতে পারবে?

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো শরৎ। আজকাল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তার কথাই বলা হয় না। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে সে দেখল—বাবা রণজয় চৌধুরীর সঙ্গে তার প্রচণ্ড তর্ক হচ্ছে।

আপনি হাতুড়ে ডাক্তার আনতে গেলেন কেন?

গ্রাম দেশে ওই ডাক্তারই সবার চিকিৎসা করে শরৎ।

হাসপাতালে দিতে পারতেন মাকে—

তুমিও ওই ডাক্তারের হাতে জন্মেছো শরৎ।

ঘুম ভেঙে গেল শরতের। বালিশে চাপা কানের ভেতর কার কান্না ভেসে আসছে। আবার ভাল করে শুনলো। তড়াক করে উঠে পুকুরের দিকে দোতলার খোলা বারান্দার দরজা খুলে ফেলে তো শরৎ অবাক।

তুই এখানে? কাঁদছিস কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওঠা হয়নি।

খাসনি বিমলা? কেউ খেতে ডাকেনি তোকে?

না। উঠে দেখি অনেক রাত্তির—

ঘুমিয়ে পড়েছিলি না খেয়ে? তা উঠে ডাকলি না কেন? ঠাণ্ডায় তো কাল সকালেই জ্বর আসবে। একটা চাদর টাদর নিয়ে শুবি তো। সবাই ভুলে গেল তোকে!

উঠে দেখি দরজা বন্ধ। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমোচ্ছে।

বাড়ি কিরে! হোল ইণ্ডিয়া এখন ঘুমোচ্ছে। ভেতরে আয়।

ঘরে ঢুকেও বিমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলো।

আবার কাঁদে! যা নিচে গিয়ে শুয়ে পড় জায়গা মত।

তবু দাঁড়িয়ে থাকলো বিমলা। শীতের ঠাণ্ডায় পুকুরপাড় থেকে ঝরা শিউলির গন্ধ আসছিল। বিমলা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

এখন আর কে খেতে দেবে তোকে। আর তো মোটে কয়েক ঘণ্টা রাত্তির আছে। পেটে খিল দিয়ে শুয়ে থাকগে।

তবু বিমলা কাঁদছে দেখে রেগে গেল শরৎ। বিমলাকে ছোট দেখেছে

সে। ছোট মাসীর বাড়ীতে শ্রীকলোনীতে প্রথম কাজ করতে আসে। নারায়ণ বিশ্বাসের বড় মেয়ে সন্ধ্যা ওপাড়ার ঘাগু ঠিকে ঝি। সে-ই এনে দিয়েছিল বিমলাকে—ছোট মাসীর বাড়ীতে।

রেগে গিয়ে শরৎ বলল, মাঝ রাতে এ কি ন্যাকামি? মারবো এক চড়; নিচে যা, সারাদিন পরে কোথায় এখন ঘুমোবো।

তবুও বিমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। কুয়াশা মাখানো আলো খোলা বারান্দা থেকে ঘরে এসে পড়েছে।

তোমার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে মেজদা।

আমার জন্যে? অবাক হ'য়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো শরৎ। কি হয়েছে? কেন?

তোমার সেই বিশ্বাসঘাতক বউ আজ সন্ধ্যে বেলা এসেছে দেখলাম।

বিশ্বাসঘাতক তাতে তোর কি? তুই কাঁদবি কেন? কোথায় এল আবার?

মোড়ের মাথায় তার নতুন পিস্‌শাশুড়ির বাড়িতে।

পিস্‌শাশুড়ীর বাড়ী থাকলে আসবে না? তাতে তুই কাঁদবি কেন?

এবার আলোর ভেতর বিমলা একদম চুপ করে গেল।

শরৎ আবার বলল, নতুন কুটুম্ব বাড়ি। বিয়ে হয়ে একবার দু'বার তো আসবেই নতুন বউ। দোষটা কি করলো শুনি। আর তুই-বা মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁদছিলি কেন? তোর কি?

এক পা এক পা করে পিছিয়ে বিমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পর একতলায় নামার সিঁড়িগুলোকে তার পা অন্ধকারে দিব্যি খুঁজে পেতে লাগলো। ততক্ষণে শরৎ তার ঘরের আলো নিভিয়ে ফেলেছে।

বালিগঞ্জ ষ্টেশনে এসে চার বোন, এক ভাই ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন ধরলো। খুব ভোর ভোর। এত কুয়াশা যে চার হাত দূরের লোকও দেখা যায় না। জানলার ধারের সিট দখল করে ঝণ্টু ডাকলো, আয় বড়দি। তুই বোস।

পাঁচ ভাইবোন রোদ পেল বারুইপুর ছাড়ার পর। বিমলা নিয়েছে ঘরকন্নার টুকিটাকি আর মায়ের জন্যে একখানা শাড়ি। নির্মলার ব্যাগ থেকে রেডিমেড দুটো শার্টের মোড়ক বেরিয়ে। হাতে একখানা চেক লুঙ্গি—শশধরের জন্যে। মিনু কিনেছে একখানা দেওঘরী চাদর। নারায়ণের জন্যে।

সন্ধ্যার হাতব্যাগে নগদ টাকা। মন্টু, স্রেফ খালি হাতে।

ডায়মণ্ডহারবারে নেমে কাকদ্বীপের বাসে ওঠার স্ট্যাণ্ডে মন্টু, ভিম রাখার তারের ঝোলা কিনলো একটা। কিন্তু বাসে উঠে সেটা ভিড়ের চাপে চট্‌কে যাবার দশা।

নামখানায় ওদের লঞ্চ ছাড়লো ঠিক সাড়ে দশটায়। শীতের নদী। সারেং ঘরে এক ছোকরা সুখানী বিমলাকে দেখে রীতিমত চঞ্চল। তাই দেখে, নির্মলা সন্ধ্যার গা টিপল।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস বয়সে সবার বড়। চেহারায়ও সবচেয়ে বড়। সে বলল, ভালই তো। ছোকরা দেখতে শুনতে তো ভালই। বিমলার সঙ্গে হলে এ লাইনে আমাদের বাড়ী যাবার সময় লঞ্চ ভাড়া লাগবে না।

নির্মলা ফোঁস করে উঠলো, এইজন্যে বড়দি তোকে হাবলি বলে ডাকে মা। দেখা নেই, শোনা নেই, চোখের ভাল লাগায় তুই এখুনি অচেনা ছেলেটার গলায় বিমলাকে ঝুলিয়ে দিতে চাস্? শুধু লঞ্চভাড়া লাগবে না বলে? ছেলেটার তো বিয়ে থা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

তা তো ঠিক বলেছিস।

মিন্টু লঞ্চের লেজের দিকে জলকাটা ঢেউয়ের ওপর মেছো বক উড়তে দেখছিল। তিনটে বক যেন নেশার টানে লঞ্চের লেজে লেজে উড়ে চলেছে। নদীর পাড় দিয়ে কাটা বিচুলির বোঝা নিয়ে গো-গাড়ি চলেছে তিনটে। গেরস্থ বাড়ি পৌঁছে তবে ঝাড়াঝাড়ি।

কচুবেড়িয়ার লঞ্চঘাটায় পৌঁছে সুখানী ছোকরা বিমলাদের বাস না ছাড়া অব্দি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলো। বাস যখন ছাড়লো, ছোকরা দৌড়ে এসে একটা লাল ফুল বিমলার হাতে গুঁজে দিয়ে এক ছুটে লঞ্চে ফিরে গেল।

সন্ধ্যা আর নির্মলা এক সঙ্গে বিমলার হাতখানা চেপে ধরলো। দেখি দেখি।

বাসসুদ্ধ সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে। মিন্টু মনে মনে বলল, ফুলটা দেবার সময় অন্তত একটু হাসা উচিত ছিল ছোড়দির। ওকি সব সময় গোমড়ামুখো হয়ে থাকা! আর বিড় বিড় করে বলা, বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!!

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাসেরই আগ্রহ বেশী। দেখা না বিমলা। কি ফুল দেখি।

কিছু না বড়দি।

তবু দেখা না—

দেখবি? তবে ভাখ—বলে মেলে ধরলো বিমলা, 'প্ল্যাষ্টিকের', বলতে

বলতে সেটা হাত থেকে গড়িয়ে নিচে পড়লো। অমনি বিমলা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিজেই ভেঙে দিল।

ভাঙলি? তুই কি রে বিমলা? আমি ভাব করি আর না করি তুলে রাখতাম।

প্ল্যাষ্টিকের।

হোক না প্ল্যাষ্টিকের। তবু তুলে রাখতাম। এ জিনিস কি বারবার আসে বোকা!

সরু পিচরাস্তায় বাসের টায়ারের বিজ বিজ আওয়াজ। একদম পেছনের সিটে বসে মিনু জানলার বাইরে মুখ দিয়ে বসে। সে জানেও না, কেন এখন তার চোখে জল আসছে। কোন কারণ নেই—তবু জল এসে যাচ্ছে। বাসের বাইরেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ওখানে একটু আগে ফেলে আসা ডাঙার কিনারায় লম্বা জলের ওপর সুখানী ছেলেটা সারেংয়ের পাশে বসে দড়ি ধরে টান মারে। তাতে লঞ্চের খোলে কোথায় যেন টুঙ্ করে ঘন্টি বাজে। সেই ঘন্টি শুনে দু'জন লোক সব সময় ইঞ্জিনের তেল দেখে, দেখে খোলে জল ঢুকছে কিনা। কিংবা সুন্দরবনের মজা চড়ায় লঞ্চের গা ধাক্কা মারবে কিনা। উঃ! ছেলেটা যদি আমায় প্ল্যাষ্টিকের লাল ফুলটা দিত! আমি জানি না আমি কি করতাম। মরেই যেতাম হয়ত।

বাস এসে ওদের পাঁচ ভাই বোনকে শ্রীদামে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল। বেলা দেখে ঝণ্টু বলল, এই সময় আমরা টিফিন করি বড়দি। ঠিক সাড়ে বারোটা বাজে এখন।

নির্মলা বলল. আমার কাছে মুড়কি আছে। সেই কোন ভোরে সবাই উঠেছি। খেয়ে নিই খানিকটা। তারপর দেখতে দেখতে এই তিন মাইল রাস্তা কাবার করে দেব।

বাদ সাধলো বিমলা। এখন কোন খাওয়া দাওয়া হবে না! শেষে মুড়কি খেয়ে জলের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে। সাগর বাজারের আগে টিউকল নেই কোন।

মিনুও বাদ সাধলো। সে বলল, জল পেটে পড়লে এই ভরদুপুরে হাঁটা যাবে না বড়দি। শরীর ভার হয়ে যাবে।

ঝণ্টু বলল, তবে তাই হোক। আজ তোদের আমি একটা নতুন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব।

বিমলা বলল, সে রাস্তা চিনি। কিন্তু পথে জল শুকিয়েছে তো? নইলে

জল ভাঙতে হবে কিন্তু।

এতদিনে শুকিয়ে গেছে ছোড়দি। চল—সমুদ্দুর—সমুদ্দুরের জাহাজ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

জানিরে জানি। এপথ দিয়ে সেজ জামাইবাবু একবার নিয়ে গিয়েছিল আমায়—

ওদের বড়দি হাসিতে ভেঙে পড়ল। কে? নেপেন? নেপেন নিয়ে গিয়েছিল। সে তো মহা অলস। এতটা পথ হাঁটলো তোর সঙ্গে?

হ্যাঁ বড়দি। জল ভাঙতে হয়েছিল অনেকটা। পথে আমায় একটা তরমুজ কিনে দিয়েছিল। মেজ জামাইবাবু—মেজদি নিশ্চয় সকালবেলা এসে পৌঁছে গেছে।

তাইতো আসার কথা। সেরকমই চিঠিতে লিখে দিয়েছি শান্তাকে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে আসতে বলেছিস তো বড়দি?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। ওর মেয়ের জন্য ফ্রক—ওর জন্যে শাড়ি, সবই এনেছি সঙ্গে করে।

মিনুও এনেছে। দুটো গেঞ্জি। কলার-ওয়ালা। মেজদির নাম শান্তা মণ্ডল। বিয়ের আগে ছিল শান্তা বিশ্বাস। মেজদি একবার মিনুকেও বলেছিল, কলকাতা থেকে একটা নেটের গেঞ্জি আনিস তো তোর মেজ জামাইবাবুর জন্যে। বড় সখ গায়ে দিয়ে সমুদ্দুরের সামনে দাঁড়াবে বিকেল বেলা। বিদিশী জাহাজ থেকে সাহেব মেমেরা কি এক যন্তর চোখে লাগিয়ে আমাদের দেখে। সেই সময় নাকি নেটের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে দাঁড়ালে ওকে খুব ভাল দেখাবে।

তা এনে দিয়েছিল মিনু সেবারে। তখন সে মাড়োয়ারি বাড়ি কাজ করতো। মেজ জামাইবাবু বড্ড অলস। কোন কাজ করবে না। বসে বসে খাবে। অথচ ভাখো শশধরদাকে। সেজ জামাইবাবু বাড়ি বাড়ি জন খেটেও পয়সা কামায়। অবিশ্যি যখন মনসার গান থাকে তখন বসে বসে জিরোয়। তা গান গাইলে খারাপ গায় না শশধরদা।

এখানকার যেখানেই যাও—ঘুরে ঘুরে সেই সমুদ্দুর। ডাঙা থেকে যেন জল আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। শেষের দিকে আকাশের সবটাই যেন ছেয়ে বসে আছে জল। ওরা ভাইবোনও একসময় সেই জলের সামনে এসে পড়ল।

নির্মলা বলল, গঙ্গা সাগরের সময় এসব জায়গা মানুষের মাথায় ভরে যায়।

বিমলা হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দু' হাত শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠলো। ওর পেছনে দূরে সাগরের জলে পর পর তিনটে জাহাজ। পতাকা উড়িয়ে চলেছে। যেন তাদেরই দেখে বিমলা নাচতে শুরু করে দিল। শূন্যে দু' হাত—মাথার চুল সাগরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে। সারা শরীরটাও বালির ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস হাতের বোঝা বালিতে নামিয়ে রেখে বিমলার দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তালুতে নিজের মাথাটা কাৎ করে রাখলো। কাছে পিঠে কেউ নেই। দূরে দূরে ভাসা জালের শুকোতে দেওয়া শরীরটা অবিকল সাপের খোলস হয়ে পড়ে আছে। সাগরের জল গড়িয়ে এসে পায়ে লাগছিল সবারই। কি হোল? হোল কি তোর বিমলা? বল না এই ভরা দুপুরে কিসে ভর করলো?

বিমলা খচ করে নাচ থামিয়ে এক গাল হাসলো, এই দিদি। আয় খুঁজি।

সন্ধ্যারাণী, নির্মলা - এমনকি মিনুও একসঙ্গে বলে উঠলো এখন?

হ্যাঁ। এখুনি। আয় না খুঁজি।

বিমলা যেন এতবড় সাগরের পাতালটা এইমাত্র সবটা জেনে ফেলেছে। বিমলাই বলল, আয় না বড়দি—আয়না সেজদি—খানিকক্ষণ খুঁজে দেখি। গঙ্গাসাগরে স্নানে আসা মানুষজনের হারানো সব জিনিস—একদিনে তো ফেরৎ দেয় না জল—

লোভও হচ্ছে—আবার ভয়ও হচ্ছে। শীতের বিকেল এসে গেল—মানে ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। আর খোঁজা মানে জলের ভেতর দু' হাতে মাটি খুবলে খুবলে এগোতে হয়। অনেক সময় সোনার দুল, নেকলেস অব্দি উঠে আসে হাতে। পুণ্যস্নানে আসা মানুষজনের জিনিস পত্তর। তাই খুঁজতে খুঁজতে নেশা ধরে যায়। মনে হয় আর হাতখানেক এগোলেই নিদেন পক্ষে একটা সোনার তাল উঠে আসবে। তার মানে কম করেও কলকাতার যে কোন কাজের বাড়ির দু' বছরের মাইনে। কম নয়। বিশেষ করে নির্মলা বিমলাদের কাছে।

নিমরাজি সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস বলল, বাড়ি যাবি না—

বাড়ি তো পড়েই আছে বড়দি।

বিমলার একথায় নির্মলা বলল, সাগরও তো পড়ে আছে—বাড়ি চল।

বিমলা বলল, মেজদি আজকের জল কাল থাকবে না। কোথাকার

জিনিস কোথায় গড়িয়ে নিয়ে যাবে—খুঁজেও পাবি না আর কাল—

বাতাসে শীত। আলোয় অন্ধকারের ছিটে। জাহাজ তিনখানা চোখের বাইরে যাবার জন্যে উঁচু জল ঠেলে ওপরে উঠে নেমে যাচ্ছে। মিনুর খিদেও পেয়েছে। সে বলল, কাল না হয় সবাই মিলে খুঁজবো। এখন চল ছোড়দি—

না। এখনই খুঁজবো সবাই। জল সবসময় হারানো জিনিস গড়িয়ে এনে ফিরিয় নিয়ে যাচ্ছে।

সে তো সব সময়েই ছোড়দি। তুই যা এখন পাবি ভাবছিস—তা হয়তো এখনই ফিরিয়ে নিয়ে গেল জল। আর কোনদিন হয়তো ফেরতই আনবে না।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস রায় দিল, ঝণ্টু। আমাদের জিনিসগুলো ভাখ। আয় বিমলা, আয় ছুটকি—আয় নির্মলা।

ঝণ্টুর পায়ের কাছে চার পাঁচটা চুপড়ি। বিমলা দু' হাত তুলে নাচতে নাচতে—চুল উড়িয়ে জলের দিকে এগিয়ে গেল। সন্ধ্যা আর নির্মলা কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিল। তারপর হাঁটুজলে চারবোন মিলে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলো। যেন সাগরে ধান বুনছে।

ঝিনুক ওঠে ওদের হাতে। ওঠে রংধরা বড় পেরেক। জল ভর্তি, ছিপি আঁটা শিশি। ওদিকে শীতের সন্ধ্যাও ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে। অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঝণ্টু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকছে—ও বড়দি চলে আয়। চলে আয়—

এ এক নেশা। সন্ধ্যা সাগরের পাগলা বাতাসের ভেতর চেঁচিয়ে বলল, আরেকটু দেখিনা কেন—

বাইরের ভাবুক কেউ ওদের এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চয় বলতো—ভাসান গাইয়ে নারাণ বিশ্বেসের রোজগেরে চার চারটে মেয়ে জল ঘেঁটে নিজেদের ভাগ্য খুঁজছে। পৃথিবীর কররেখা বরাবর—

নয়াদ্বীপের গা দিয়ে আরও দক্ষিণে যাবার রাস্তা। সেদিককার জাহাজ-গুলোকে পথ দেখাতে বাতিঘরে আলো জ্বলে উঠলো। অমনি মিনু লাফিয়ে উঠলো, পেয়েছি—আমি পেয়েছি বড়দি।

বাকি তিনজন ছুটে এল। কিরে?

একটা হাতঘড়ি।

ওঃ! কবে বন্ধ হয়ে গেছে ভাখ্‌ গিয়ে।

মিন্নু কানে চেপে ধরে বলল, না চলছে। এই তো।

বাকি তিন দিদি পর পর ভিজে ঘড়িটা কানে চেপে ধরে বলল, তাইতো। তাইতো।

বিমলা বলল, আজই হয়তো বেড়াতে এসে কেউ ফেলে গেছে।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস আবছা আলোয় ঘড়িটা উঁচুতে তুলে ধরে দেখলো, সোনার ঘড়ি বিমলা। লেডিজ ঘড়ি নির্মলা। আমি হাতে পরবো।

বেশ তো বড়দি। আমার খোঁজা সার্থক।

মিন্নুর একথায় বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিমলা বলল, মিন্নুটার ভাগ্য ভাল। আমাদের মত নয়।

ধমকে উঠলো সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস। ও কি কথা রে? দেখিস—মিন্নুর খুব ভাল বে হবে।

ছিঃ! আমি বিয়েই করবো না বড়দি। ছাখোতো তোমার ঘড়িতে কটা বাজে?

হাত তুলে পাকা ঘড়িওয়ালীর মতই সময় দেখতে গেল সন্ধ্যা। তারপর ঝপ করে হাতখানা নামিয়ে নিয়ে বলল, এখানে আলো নেই। দেখতে পাচ্ছি না। একটু থেমে সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস সবাইকে খুশির হাসি হাসিয়ে দিয়ে বলল, এবার কলকাতায় ফিরে ঘড়ি দেখাটা শিখে নিতে হবে।

নির্মলা বলল, রোজ সকালে নাকি চাবি দিতে হয়। নয়তো চলেনা নাকি—

বিমলা বলল, সকালের চা আর কি! চা না খেলে আমি কাজে হাতই দিতে পারি না।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস অন্ধকারের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে হাই তুলে বলল, পা আর চলছে নারে। তার ওপর আরেকটা ঠিকে কাজ বাড়লো আমার।

কি করে?

কেন! রোজ ভোরে উঠে এনাকে চাবি দেওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে তিন বোন হো হো করে হেসে উঠলো। আজকের দিনটাই হাসির। আজকের দিনটাই আনন্দের। তাই মনে হচ্ছিল মিন্নুর। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম? ট্রেন ধরিয়ে দেবার জন্যে বাবু ডেকে দিয়েছিলেন অন্ধকার থাকতে থাকতে। নিজে নিচে নেমে এসে বালিগঞ্জের বাস ধরে উঠিয়ে দেন মেসো। তাই বলেই মিন্নু বাড়ির বাবুকে ডাকে। তার বউকে ডাকে মাসি। মাসির নামটা বেশ! দীপা।

কী একটা মনে পড়ে গেল মিন্নুর। ও বড়দি, ভাল কথা। সব ঘড়িতে চাবি দিতে হয় না। আমি মাসি আর মেসোর ঘড়ি দেখেছি। ওরা তো দম দেয় না। ঘড়ি ঠিক চলে। রোজ নাকি হাতে রাখলেই ঘড়ি আপনা আপনি চলবে। এর একটা আলাদা নামও আছে। মাসি বলেছিল—ভুলে গেছি।

চার বোনই একসঙ্গে বালির ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। নির্মলা বলল, তাহলে হয়তো এ ঘড়িও তাই। জলের নিচেও বন্ধ হয়নি।

বিমলা বলল, তবে তো অনেক দাম।

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস আবার হাই তুলে বলল, নতুন ঠিকে কাজটা গেল তাহলে!

বাকি তিনবোন তাদের বড়দির কথায় হেসে কুটিকুটি। মিন্নুর তো এখন বড়দির জন্যে গর্ব হয়। বড়দির মত সোয়েটার বুনতে পারে ক'জন? বাবাকে কী সুন্দর করে দিয়েছে দেখার মত।

ঝণ্টু এতক্ষণ চার বোনের চুপড়ি, ব্যাগ, প্যাকেট বয়ে বয়ে শেষ। সে গম্ভীর গলায় বলল, কাল বোঝা যাবে। কাল দুপুর অব্দি যদি আপনা-আপনি চলে ঘড়িটা, তবে বুঝবি মিন্নুর কথাই ঠিক।

ওদের খেয়াল নেই—পেছনে অন্ধকারে এতবড় একটা জল পড়ে আছে। তার গা ধরে বালি আর বালি। ওরা পাঁচজনে এখন ঘাস পেয়েছে পায়ের নিচে। দূরে সাগর বাজার থেকে অনেক লোকের কাথাবার্তার একটা সরবৎ ভেসে আসছে বাতাসে। আলাদা করে কোন কথা চেনার উপায় নেই।

বারান্দায় কুপির আলোর পাশে নারায়ণ বিশ্বাস বসে। উঠোনে শশধর। সারাদিন পর মাড় ধরানো সুতো গুটিয়ে খুলছিল শশধর। দিদিমার কোলে মাথা রেখে নির্মলার ছেলে ঘুমোচ্ছিল। পাশেই শান্তার ছেলেমেয়ে বসে।

ওরা পাঁচজনে উঠোনে পা দিতেই শশধর তাড়াতাড়ি সুতো গোটানো শেষ করতে লাগলো। তার মুখে খুশি খুশি ভাবটা নির্মলা ঠিক ধরে ফেলল। এগিয়ে এসে বলল, গান বাজনা ছেড়ে দিয়ে সুতো গোটাচ্ছো?

ধান তোলায় ব্যস্ত সবাই। এখন তো ভাসানের গানের ডাক পড়ে কম। বস আগে—

খোকা কোথায় ?

ওই তো।

দেখতে পেয়ে নির্মলা ছুটে গেল।

ভাইবোনের গলা পেয়ে শান্তা উঠে এল। ওরা আজ আর আসবে না ভেবে মন খারাপ করে শুয়েছিল। নৃপেন মণ্ডল এখন উঠতে পারবে না। সন্ধে সন্ধে শুয়ে পড়া স্বভাব। এখন তার মাঝরাত। সেই কাল সকালে তার ঘুম ভাঙবে। উঠোনে নেমে শান্তা সন্ধ্যার হাত ধরলো। রোগা হয়েছিস ?

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস শহুরে দেমাকী চাল নকল করে গা ঝাড়া দিল, ডায়েটিং করছি।

উঠোনসুদ্ধ সবাই সেই নকল চালে হেসে উঠলো। শান্তার পুরো নাম শান্তনা। নৃপেন একজন রাম কুঁড়ে। লম্বা নাম মুখে সরতে সময় লাগে বলে শান্তনাকে সে ছোট করে শান্তা করে নিয়েছে। শান্তা নিজে তার বোনেদের মুখে শান্তনা নামটা শুনতেই বেশি ভালবাসে।

আবার সন্ধ্যার হাত ধরতে গিয়ে চমকে উঠলো শান্তনা। এ কি ? ঘড়ি ? কবে থেকে পরছিস বড়দি ?

আবার সেই দেমাকী চালে সন্ধ্যারাণী বলল, ছাখো শান্তনা—কথায় কথায় আমার হাতধরা পছন্দ করি না।

নির্মলার ছেলেও ঘুম চোখে উঠে বসে মাসির এই কাণ্ডকারখানায় হেসে ফেলল।

শান্তনা একটু ঘাবড়ে গেল। সে নিজে কিছু আয় করে না। তার স্বামীও বিশেষ কিছু কামায় না। জমিজমা থাকায় শ্বশুরবাড়িতে কোনরকমে চলে যায়। সে তার বড়দির কথায় কিছুটা মিইয়ে গেল। তাই সরে দাঁড়াল। বাকিরা কিন্তু আবার হো হো করে হেসে উঠলো।

সেই চালেই সন্ধ্যা বলল, একটু আগে তোমার ছোটবোন মিনুরাণী সাগরের জলঘেটে পেয়েছে। তখন থেকেই হাতে পরে আছি। শোনা যাচ্ছে-খুবই দামী ঘড়ি।

নারায়ণ চেঁচিয়ে বলল, তোদেব মাকে আগে দেখা। বুড়ির তর সয় না। একথা বলে নারায়ণ বিশ্বাস তার বউকে বলল, ও আয়না। তুমি এগিয়ে গিয়ে ছাখো না।

আমারে ঘিরে তিন তিনটে নাতি নাতনী। আমি টপ করে উঠোনে নামি কি করে।

সন্ধ্যা সেই চালেই আয়না বিশ্বাসের কাছে গিয়ে মায়ের চোখের সামনে হাতটা তুলে ধরলো, ভাল করে দেখুন আয়না বালা দেবী।

আয়না ভাল দেখে না চোখে। সে হেসে বলল, শহর কলকেতায় গিয়ে তো অনেক কিছু শিখেছিস। তোদের বাপের তো খেয়াল নেই—কুপির কেরাচিন কিন্তু ফুরিয়ে যাবে এট্টু পরে।

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ বলল, তোরা খাওয়া দাওয়াটা করে নে আগে। কেরাচিন পাওয়া যাচ্ছে না একদম।

মিনু বলল, ভয় কি বাবা। উঠোনের আথায় ভাতে ভাত চাপাবো। চাল এনেছি। ছোড়দির ব্যাগে ঘি আছে। উঠোনময় তো এখানে জ্যোচ্ছনা—

পারবি তোরা? ভাতে ভাত ফুটিয়ে নে আজকের মত। শেষরাতে শশধরকে নিয়ে মাছ ধরতে যাব। জাল তুলে তোদের মাছ খাওয়াবো কাল।

বিমলা হেসে বলল, আমরা তো কলকাতায় এ কাজই করি বাবা। সেখানে আছে আবার লোডশেডিং।

সেটা কি?

মায়ের এ কথায় সন্ধ্যা বলল, একদিনে সব শেখে না আয়না দেবী! কাল সকালে বলবো লোড্‌শেডিং কাকে বলে। এই বিমলা, নির্মলা, মিনু—কেউ এখন কোন জিনিস বের করবি না। কাল সকাল হলে সব দেখাবো।

বাঃ। বড়দি - চাল বের করবো না?

হু। শুধু চাল বের করতে পারো মিনুরাণী। বিমলা তুই ঘি বের করে দে—

কাপড় চোপড় বের করবো না এখন?

না। সব বাঁধা ছাঁদা থাকুক। কাল সকালে সবাই দেখবে। খেয়েই হাত পা ছড়িয়ে গপ্‌পো করবো শুধু।

মিনু উঠোনের ধান সেদ্ধর চুলোটা ধরাবার জন্যে এদিক ওদিক শুকনো নারকেল পাতা খুঁজছিল। সে উঠোন থেকেই বলল, তখন তো বড়দি তুমি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাবে।

নিজের খোঁজার আনন্দেই মিনু গোহালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও বাবা! এই বলদটা কিনেছো?

কুপি নিয়ে নারায়ণ বিশ্বাস এগিয়ে আসতে আসতে বলল, বদরাগী। অত কাছে যাসনে মা। চুসোয় খুব।

কুপি কাছে এলে মিনু অবাক হয়ে তাকালো। কী বড় বলদ। কালো চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। এমন সুন্দর বলদ বড় একটা চোখে পড়ে না। সে জানতে চাইল, কেমন চষে বাবা ?

খুব ভালো। তবে জিদি আছে। কিনতে প্রায় সবটাই তুই দিয়েছিস মিনু।

মিনু তাকিয়ে দেখলো, তার বাবা শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসও খুব সুন্দর দেখতে। আরও ভাল দেখাচ্ছে—বড়দির বোনা সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে।

নারায়ণ বিশ্বাস তখনো বলদের স্বপ্নে বিভোর। সে তার ছোট মেয়েকে বলে যাচ্ছিল, ভাখ মিনু—বলদটা এমনিতে ভাল—কিন্তু একবার জেদ করে বেঁকে বসলে ওকে দিয়ে কেউ একটা ঢেলাও গুঁড়োতে পারবে না—চষানো তো দূরস্থান !

বাবা। তোমায় না কারা খুব মেরেছিল ? দাদা কলকাতায় গিয়ে বলে-ছিল।

ও কথা থাক মিনু ?

মিনু দেখলো, কুপির আলো বাবার মুখের একদিকে পড়েনি। সেদিকটা অন্ধকার। ছাচি কুমড়োর মাচার নিচে একটা বেড়াল বসে। সারাটা উঠোন তকতক করছে। মা না জানি এই বয়সে কত খাটে।

নারায়ণ আবার বলল, ওকথা থাক।

তোমার কি কষ্ট হয় কোন ?

হাঁটতে গেলে বাঁ পা-টা টেনে হাঁটি।

গাইতে গেলে ?

গলা ওঠে না মিনু।

তোমায় এমন মার কে মারলো বাবা ?

ও কথা থাক।

রাতে খাওয়াদাওয়া মিটতে মিটতে জ্যোৎস্নায় সারা উঠোন ভরে গেল। কুপি নিভু নিভু। বিমলা জানতে চাইল, বড়দি তোর ঘড়িটা দেখ না। ক'টা বাজলো।

দেখতে জানলে তো বলবো!

এরপর আর সাড়া পাওয়া গেল না সন্ধ্যারাণীর। নিমেষে এমন ঘুমিয়ে পড়তে তার আর জুড়ি নেই।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি বলতে মাটির একখানা বড় ঘর। সেই

ঘর ঘিরে চারদিকে ঘোরানো বারান্দা। তার ওপর ছই। বারান্দা খুড়ে ভেতরে পাতিহাঁসের খোয়াড়। শীত ঝাঁকিয়ে পড়ায় আয়না এসে গোয়ালের দোরে মোটা একখানা কাঁথা ঝুলিয়ে দিল। দিতে দিতে নিজেই বলছিল, এই নই বলদটা বড্ড জিদি। বড্ড জিদি—

সাগরবাজারের দিক থেকে মানুষজনের চেঁচামেচি আর ভেসে আসছে না। তার বদলে সাগরের জলভাণ্ডার অবিরাম আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক জোরালো।

নাতি নাতনীকে নিয়ে ঘরে শুলো নারায়ণ। বিমলা আর মিনুকেও ঘরে নিয়ে গেল আয়না। সন্ধ্যারাণীকে কেউ জাগাতে না পারায় সান্ত্বনা এইমাত্র ঘর থেকে একখানা কাঁথা এনে তার বড়দির সারা গা ঢেকে দিল। ঘড়িবাঁধা হাত খানা ঠিক কাঁথার বাইরে—ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় ভেতর ঝুলে থাকলো— বারান্দার বাইরে। পাশেই গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছিল ঝণ্টু। দু'জনেই মোটা মোটা বস্তা পেতেছে নিচে।

কিছু করার নেই তার। এই ভেবে বারান্দার কোণের চ্যাটাই ঘেরা আড়ালে গিয়ে সান্ত্বনা নৃপেনের পাশে শুয়ে পড়লো।

এর ঠিক উল্টোদিকে বারান্দার ওপাশের কোণে ছইয়ের নিচে নির্মলা আর শশধর শুয়েছিল। সেদিকটাতেও চ্যাটাইয়ের আড়াল। ফাঁকে ফোকরে মোটা মোটা বস্তা। সাগর বাজারের রেশন দোকান থেকে কেনা। ভাসান গানেও শশধরকে এসব পেতে শ্বশুরের সঙ্গে বসতে হয়। ভিজে গেলে রোদে দিয়ে শুকিয়েও রাখতে হয় তাকে।

সবাই ঘুমোলে নির্মলা জানতে চাইল, তুমি তো এখানে থাকো। বাবাকে অমন করে কে মারলো জানো না?

আমাকেও বলেননি।

কে মারতে পারে বলে মনে হয় তোমার?

আমার তো অনেককিছু মনে হয় নির্মলা। আমার মায়ের পক্ষে কিছুই কঠিন না।

বিছানায় উঠে বসলো নির্মলা, কি বলছো?

ঠিকই বলছি। যে কলকাতায় তোমার ওখানে লোক পাঠাতে পারে— তার কাছে কিছুই অসাধ্য না। আমার মা সব পারে। সব পারে নির্মলা।

এ কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার?

তোমার বাবা কারও নাম না বলাতেই—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নির্মলা নিজেকেই যেন বলল, আমার জন্যেই—শুধু আমার জন্যেই—

একটুবাদে শুয়ে শুয়েই নির্মলা বলল, কলকাতার রাস্তায় আমার একএক সময় ভয় করে—তোমার মায়ের লোকদুটো যেন কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রেখেছে—

আমি নিজেই তো আজকাল জঙ্গলের ধারে যাই না। নয়তো কাঠ কাটার তো মোটা মজুরী।

কেন?

আমার কেমন সন্দেহ হয়—মা আমাকেও ছাড়বে না। ক্ষমা করবে না। আমার ওপরেও নজর রেখেছে—

আমরা ফেরার সময় পাকাপাকি কলকাতায় চল আমাদের সঙ্গে।

সেখানে আমি কি কাজ পাবো নির্মলা!

অনেক কাজ আছে। তুমি তো খাটতে পারো।

আমায় কে কাজ দেবে? আমি তো পড়াশুনো জানিনে। ওখানে সবাই নিজের নামটা তো লিখতে পারে। আর—মায়ের ইচ্ছে হলে কলকাতাতেও আমার সর্বনাশ কেউ আটকাতে পারবে না।

সেখানে অনেক লোক। ঝণ্টুর সঙ্গে জোগাড়ের কাজ করবে। তুমি খোকাকে নিয়ে চল আমার সঙ্গে এবারে—

অনেক টাকা পড়ে আছে নির্মলা। সারাটা বর্ষা জন খেটেছি।

কত টাকা?

তা প্রায় পৌনে চারশো। এ টাকা আদায় না করে যাই কি করে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। এবার নির্মলার গায়ে পায়ে কাঁথা টেনে দিয়ে শশধর বলল, ঘুমিয়ে পড়। রাত থাকতে তোমার বাবা ডাকতে আসবে। মাছ ধরতে যাব দু'জনে।

অনেকদিন পরে নির্মলা শশধরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে গেল।

মিন্টু তখন স্বপ্ন দেখছিল। কচুবেড়িয়ার ঘাটে ভোরবেলা সে মাথায় মুকুট পরে দাঁড়ালো। নিচে জলে ঘাটের শেষ ধাপে সাদা ফুটফুটে লঞ্চটার ছাদের সারেং ঘর থেকে সেই সুন্দর সুখানী বেরিয়ে এল। হাতে লাল রংয়ের একটা কলকে ফুল।

মিন্টু দেখলো, তার নিজের গায়ের শাড়িটাও সাদা রংয়ের। তাতে লাল জরি।

সুন্দর সুখানী ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল, এই নাও মিনু।

না। আমি নেব না।

নেবে না? কেন? এ ফুল তোমার জন্যেই এনেছি।

না। নেব না। কলকে ফুল তো হলদে রংয়ের। তোমারটা লাল কেন?

এর চেয়ে ভাল এদিকে আর পাওয়া যায় না মিনু। নাও—

না। নেব না। এ ফুল তুমি তো আমার জন্যে আনোনি সুন্দর সুখানী। এনেছো আমার ছোড়দির জন্যে!

তোমার ছোড়দি? তাকে তো আমি চিনিই না।

খুব চেনো। আমার ছোড়দির নাম বিমলা। তাকেই তো তুমি এভাবে ছুটে এসে ফুল দিয়েছিলে।

সে আমি না মিনু। অন্য কেউ। তুমি ভুল করছো।

আমার ভুল হয় না সুন্দর সুখানী। আমি খুব ছোটবেলা থেকে পরের বাড়ি কাজ করি। ইলেকট্রিক ইস্ত্রি—কয়লার ইস্ত্রি দুই-ই করতে পারি। ব্লাউজ বল—শার্ট বল সবই আমি ইস্ত্রি করতে জানি। আমার ভুল হয় না। ছোড়দি আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী। কত লম্বা। মাথায় কি চুল। কি সুন্দর নাচতে পারে। একদিন বিকেলে সাগরের সামনে দু'হাত শূন্যে তুলে নাচছিল। তখন তার মাথার চুল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে। সুন্দর সুখানী তুমি দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমি ছোড়দির পাশে দেখতে বিচ্ছিরি।

আমি তাকে দেখতে চাই না। তুমিই মিনু আমার সুন্দরী। আমার এই বিচ্ছিরিই পছন্দ। বিচ্ছিরিই ভালো।

তাহলে সুন্দর সুখানী শোন। আমি বাইরে বলি আমার বয়স চোদ্দ। আসলে কিন্তু আমার ষোল। আর শোন। কাউকে বোলো না। ছোড়দি না কাউকে কোনদিন আর ভালবাসতে পারবে না। শ্রীকলোনীর পল্টুর সঙ্গে ছোড়দি আগে সিনেমায় যেত। পান খেত। এখন ছোড়দি পল্টুকে বলে বিশ্বাসঘাতক।

এই নাও তোমার ফুল নাও মিনু।

মিনু লাল কলকে ফুলটার দিকে হাত বাড়ালো। কিছুতেই হাতে পাচ্ছে না। বুদ্ধি করে সুন্দর সুখানী যদি আরো সিঁড়ি ওপরে উঠে আসতো।

নিচে জলে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার ঘন্টি পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নদী কাঁপানো ভোঁ-ও-ও—

শীতের সমুদ্র।

কাল ভোর রাতে সবাই মিলে জাল পেতে রেখে এসেছে আজ এখন এই ভোর রাতে সেই জাল তোলা হবে। বড় জলের ভেটকি। শংকর। মহাশোল—আরও কত কি। তিরিশ চল্লিশ জন মিলে এখন জাল তোলা হবে। বালির ওপর ঝাড়ান দিয়ে মাছ ফেলতে ফেলতে আলো ফুটে উঠবে।

নারায়ণ বিশ্বাস গোড়ায় দু'বার কাশলো। তারপর আস্তে ডাকলো—ও শশধর! শশধর—

যেন মনসার গানের দোবারা ফিরতি ধুয়া। শশধর আস্তে সাড়া দিল। নির্মলা ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। আলগোছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হল শশধর।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—শ্বশুর জামাই একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা যেমন ভিন গাঁয়ে গাইতে যায়। নারায়ণ দেখলো—সাগরের আকাশে ভোর রাতের তারা কিছু ফ্যাকাশে লাগে। যেন কেরাচিন ফুরোনো কোন দূরের কুপি।

খরো খরো হাঁটছিল নারায়ণ বিশ্বাস। মাছ নিয়ে ফেরার পথে ভাগের খানিকটা সাগর বাজারে বেচে ফিরতে হবে। নুন তেলও চাই। অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি ফিরে বলদ গাই ছাড়তে হবে। রাখাল আসবে। গোয়াল কাড়াবে আয়না বিশ্বাস। মেয়েগুলো সারা বছর টাকা দেয়। এখানে ওরা এসেও বাজার হাট করেই। তবু বছরে এ ক'টা দিন তার নিজেরও কিছু করতে ইচ্ছে করে।

জলের কিনারে এসে ওরা দেখে—জাল তোলা শুরু হয়ে গেছে। কয়েক-খানা ডিঙি লণ্ঠন ঝুলিয়ে ঘোরা ফেরা করছে। জালে কুমির পড়ুক—সাপ পড়ুক কিছুই ছাড়া হবে না। কাঠি গোটাতে গিয়ে গাফিলতিতে কিছু ফস-কালে ভাগা থেকে তার একটা আন্দাজী কাটান যাবে।

শশধরকে নিয়ে নারায়ণ বিশ্বাস জলে নামতে যাবে। এমন সময় আচমকাই আকাশ যেন আগাম লাল হয়ে উঠলো—বেশ বেশি বেশি করে। ভোর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতরে কী যেন ছাই ছাই উড়ছে। যারা জলে ছিল—যারা ডাঙায়—যারা ডিঙিতে—সবাই টের পেল।

নারায়ণ বলল, কিসের গন্ধ পাচ্ছি যেন—

শশধরের মনে হল—আজ যেন বড় বেশি ভোরে—ভোর হয়ে যাচ্ছে।

তবু ওরা জলে নামলো। সাগরের এ দিকটায় কোমর জলেই এক রকমের-

ঝাঁঝি শ্যাওলা থাকে শীতের সময়টায়। কাঠি ধরে ধরে শশুর জামাই একসঙ্গে জাল তুলছিল। এমন সময়—সাগরের জল উঁচু হয়ে যে জায়গাটায় আকাশ ধরে ধরে—সেখানে জলন্ত একটা জাহাজ ভেসে উঠলো—একেবারে অন্ধকার ফুঁপে জলে ওঠা আস্ত একখানা জাহাজ।

সারা আকাশ লাল করে দিয়ে জাহাজটা জলছে। মালের জাহাজ হবে। মাঝখানে মাস্তুলের জায়গাতেই চাপ ধরে আগুন।

সবাই মাছ ধরা ভুলে তাকিয়ে আছে। কী একটা ফাটলো—বিকট শব্দ করে। তাতে জল তির তির করে কাঁপলো খানিক।

নারায়ণ বিশ্বাস গম্ভীর হয়ে বলল, নিশ্চয় বারুদের কিছু—

বোমা ?

হতে পারে। হয়তো কামানের গোলা নিয়ে যাচ্ছিল। আগুন ধরে ফেটে গেল।

শেষরাতের বাতাসটাও যেন গরম হয়ে যাচ্ছে—আর আগুন লাগা জাহাজ-টাও চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। ভিজে হাতে পিটবুক জলতেই শশধরের হাতে ভিজে ছাই উঠে এল। অবশ্য এখনো জাহাজটা অনেক দূরে। নারায়ণ বিশ্বাস একটা কাল মাগুরের মাথা চেপে ধরে কোমরে ঝোলানো থলের ফেলে দিল।

ঠিক এমন সময় জাহাজ থেকে গাদা গাদা আগুনের ফলা সাগরের জলে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলো। পড়েই সে আগুন একদম ফুলকি হ'য়ে এদিক ওদিক ছোটা শুরু করলো।

তারই একটা ছুটতে ছুটতে একদম ওদের পাতা জালের কাছাকাছি এসে দাপাতে লাগল। পাগলা ঢেউ তুলে সেই আগুন যেন নাচছে। ডিঙ্গিগুলো ডাঙ্গার গায়ে। লোকজন সব জাল ফেলে ডাঙ্গায়।

তেলের পিপে—বলে নারায়ণ বিশ্বাস নিজেই বিড়বিড় করল, তাহলে পেটে পেটে তেলও ছিল। আরও ফাটবে—

পরেপর আরও কয়েকটা জলন্ত পিপে ছুটে আসায় সবাইকেই জাল ফেলে ডাঙ্গায় উঠতে হল। পাগলা ঢেউয়ে আগুনের ফলাগুলো তখন শিখা তুলে-নাচছে। সঙ্গের বাতাসে ঘূর্ণী হয়ে গোল্লা খাচ্ছে গুঁড়ো ছাই। এবার পোড়া রঙের গন্ধ আরও জোরালো হয়ে ছড়িয়ে গেল চারদিক।

লক্ষণ ভাল নয় শশধর।

চলে যাবেন ?

তাই তো যেতে হয়।

পাতা জালের ধঁয়া মাছ তো যাবে!

তা যাবে শশধর।

কথাও শেষ হল—আর সবে ফর্সা হাওয়া ভোরে মাস্তুলের গোড়া থেকে জাহাজটার কী যেন ফেটে আকাশে উঠে গেল।

সবাই দৌড়চ্ছে। লোক জমেছে অনেক। দিগবিদিক হারানো দৌড় দিল নারায়ণ বিশ্বাস। সাগরের গায়ে তার জন্ম। সে ছোটবেলায় দু'তুবার আগুন লাগা জাহাজে এমন পর পর ঘটতে দেখেছে—আগুনকে নাচতে দেখেছে। এখুনি হয়তো আবার কিছু ঘটতে শুরু করবে।

পেছনে পেছনে শশধর দৌড়োচ্ছিল।

নিজের বাড়ির উঠোনে ফিরে নারায়ণ হাঁপাতে লাগল। তাকে কিছু বলতে হল না। জাহাজের ফাটার আওয়াজে সবাই উঠে পড়েছে। নারায়ণ চোখ চেয়ে বুঝলো—তার মেজো জামাইয়ের ঘুম এই আওয়াজেও ভাঙেনি। নেপেন একজন আসল অলস।

নির্মলা এগিয়ে এসে বলল, বাবা তোমার জামাই কোথায়?

আসবে এক্ষুনি। আসছিল তো পেছন পেছন। এমন আগুন লাগা জাহাজ অনেকদিন দেখিনি।—এই বলে—যা দেখেছে তাই বলতে যাচ্ছিল নারায়ণ।

সন্ধ্যা এসে বলল, বাবা হাতঘড়িটা পাচ্ছি না।

কেন? হাতে বাঁধা ছিল তো।

সন্ধ্যা বলল, ঘুমোচ্ছিলাম। বিমলা খুলে নেয়নি তো?

বিমলা বারান্দা থেকে বলল, তোমার ঘড়ি আমি খুলে নিতে যাব কেন? অমন শিক্ষা পাইনি বড়দি।

শিক্ষাই কোথাও পাসনি জীবনে! তার আবার এমন তেমন—সাত সতেরো কি রে? চুপ কর।

ঘড়িটা তাহলে কোথায় গেল?

সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস দেখলো—তার কথা শোনার কেউ নেই। বিমলার আনা আরশি চিরুণীর সামনে তাদের মা আয়না বিশ্বাস হাসি হাসি মুখে বসে। নির্মলার ছেলে মাথায় চিরুনী বুলিয়ে দিচ্ছে। গায়ে মিন্তুর আনা র‍্যাপার। উঠোনে তুষে ধরানো আগুনের পাশে একটা বেড়াল বসে। হঠাৎ সন্ধ্যা হাঁক দিল—ও মিনু চা দিবিনে—

নারায়ণ বিশ্বাস গোয়াল থেকে বলদ জোড়া বের করছিল। পেছনে এসে নির্মলা বলল, আসবার সময় তুমি নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে করে।

সে কি ছেলেমানুষ মা? হয়তো কিছু মাছ পেয়েছে। সাগর বাজারে কেনাবেচা করে তেল নিয়ে ফিরতে পারে।

ঠিক তখন সাগর থেকে ফিরতি পথের ডানদিকের হরিতকি গাছের মগডালে বসা এক হনুমান দেখলো—একটা মানুষ কেমন হাত পা ছুঁড়ছে—আর তার সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো মানুষ তাই দেখছে। এমন তো সচরাচর ঘটে না। সে তার বাঁদুরে বুদ্ধিতে যেটুকু কুলোলো—সেই মতো কয়েকটা বড় হরিতকি তাগ্ করে নিচের মানুষজোড়াকে হনুমানটা ছুঁড়লো।

উঃ! বলে লক্ষণ বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের বড়সড় মানুষটা তাকে ধরতে গেল। অমনি শশধর একলাফে নালাটা টপকে দৌড়োলো।

বসা অবস্থাতেই লক্ষণ মিস্ত্রি কোমরের দা-খানা তাগ্ করে ছুঁড়লো।

শশধর কোন শব্দ করতে পারল না। বাঁ কাঁধের উপর এইমাত্র ছুটন্ত পিপের আগুন গলা অব্দি ঢুকে গেল। সে হুমড়ি খেয়ে পাতি ঘাসের জংলায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। দেখতেও পাচ্ছিল—তার নিজেরই রক্তে চওড়া সবুজ পাতি ঘাস মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। তাতে রোদ পড়ল এইমাত্র।

লক্ষণ। হাত দা ছুঁড়লি কেন?

উঠতে উঠতে লক্ষণ বলল, পালিয়ে যাচ্ছিল যে।

এখন বড়দিকে কি বলবি গিয়ে?

মরেনি নিশ্চয়।—বলে লক্ষণ তার সঙ্গীকে নিয়ে শশধরের কাছে গেল। কাঁধের বসে যাওয়া দা-খানা তুলে তাকে চিৎ করে দিতেই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠলো।

দু'চোখ খোলা। গলা দিয়ে নেমে আসা রক্তে বুকটা মাখামাখি।

লক্ষণ বলল, ফিরছিল সাগর থেকে। এই ভোরবেলা ধরতে গেলে কেন ছেলেটাকে।

তুই তো বললি ধরতে। নারায়ণ বিশ্বাস এগিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে। একা পড়ে গেল। কাছে পিঠে কেউ নেই। তাই খপ করে পেছন থেকে গামছা মুড়ো করে ধরলাম। এই একটু আগেও তো বেঁচেছিল শশধর।

নে চল। বেলাবেলি ফিরে যাবো।

ফিরে কি বলবি বড়দিকে ?

বলবো ? বলবো দেখা পেলাম না—

লক্ষ্মণদের ডিঙি জঙ্গলের গায়ে জলে ভাসছিল। ওরা উঠেই লগি ঠেলে বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। এদিকটায় জলন্ত জাহাজের জন্যে কোন ভিড় নেই। কারণ মানুষের বসতিই নেই কোন। সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস নদীর বুক ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

জঙ্গলের ভেতর ঘাসের ওপর একটা আস্ত মানুষ চিৎ হয়ে শুয়ে। এমন তো ওরা এসব জায়গায় শুয়ে থাকে না। চোখের ভুল নয়তো ? ভাল করে দেখার জন্যে হনুমানটা হরিতকি গাছের একেবারে নিচের ডালে নেমে এসে বসল। এক্ষুণি নিচে গিয়ে দেখা ঠিক হবে না। অনেক সময় ওরা অমন ভান করে থাকে। হাজার হোক মানুষ তো। হনুমানটা তাই বসা অবস্থাতেই মাথা ঝুঁকে ভাল করে দেখতে থাকল শশধরকে।

শশধর তখন দুই চোখ খুলে মাথার ওপরে গাছপালা ছাড়িয়ে আকাশ দেখছিল ভাল করে।

ভোররাতের স্বপ্নে পাওয়া দু'টো শব্দ মিনুর মাথায় এখনো গেঁথে আছে। আর সবই দিনের আলোয় মুছে গেছে। সুন্দর সুখানী। আবার সেই কলকাতায় ফেরার সময় কুচবেড়িয়ার ঘাটে দেখা হতে পারে। নিজের মনে মিনু বলল, ও আমার সুন্দর বনের সুন্দর সুখানী। সঙ্গে ছোড়দি থাকলে কি তুমি আর আমার দিকে তাকাবে! এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই মিনু বোনপো'র জন্ম কলকাতা থেকে আনা মনিহারী জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করে পা ছড়িয়ে বসলো। শশধরদা তো এলো না এখনো ? কি ভেবে সে নিজের মনেই গুনগুন করে গাইতে লাগলো। তার গানের ভেতরে সকালবেলার শীত মাখানো রোদ্দুর ঢুকে যাচ্ছিল। মিনু নিজের বানানো গান—আর নিজের গলা শুনে তো অবাক। কী সুন্দর! কী সুন্দর !!

সুন্দরবনের

সুন্দর সুখানী

নাও তুলে-এ

নাও তুলে-এ

এ চোখ দুখানী

'নাও তুলে' লাইনটা দুবার ফিরিয়ে গাওয়ার সময় মিন্থু নিজের চোখ জোড়াই গাইতে গাইতে আকাশের দিকে তুলে ধরছিল।

বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা তিনটে খাবার জন্তে বায়না ধরছে। অথচ নৃপেন যে বিছানা থেকেই উঠছে না। ভাইবোনেরা বছর ঘুরে আবার এক-জায়গায় হয়েছে। বাড়ির দু'জন জামাই মজুত। তিন তিনজন নাতি নাতনি। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হতে তো কিছু দেরি হবেই। সান্ত্বনা মা বললো, মুড়ি ফুরিয়ে গেছে মাঝলি—

সান্ত্বনা নৃপেনকে বলতে গেল, যাও সাগর বাজার থেকে মুড়ি হোক অন্ত কিছু হোক কিনে আনো।

নৃপেনকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হল। তারপর টেনে বসিয়ে দিয়ে স্বামীকে সব বললো সান্ত্বনা।

সব শুনে নৃপেন বলল, জামাটা দাও বাজারটা ঘুরে আসি।

জামা দিতে গিয়ে নৃপেনের বুক পকেট থেকে সেই হাতঘড়িটা ঝনাৎ করে মাটিতে পাতা মাদুরে পড়লো। এ কি? বড়দির হাতঘড়ি তোমার বুক পকেটে?

চুপ। আস্তে কথা বল।

সান্ত্বনার গলা একটুও নামলো না। এ ঘড়ি তোমার পকেটে এল কি করে? ওদিকে বড়দি খুঁজে মরছে। এটা তার সাধের জিনিস। সাত বাড়ি ঠিকে খেটে তবে সে এক গ্লাস জল খায়।

মরেছে! এত চেঁচায় নাকি? স্বামীর অপমানের ভয় নাই স্থাখো।

অপমান? তুমি চুরি করেছো?

না। বড়দি ঘুমোচ্ছিল হাত বের করে। পেচ্ছাব করতে উঠে দেখলাম ভোররাতে। তাই খুলে নিয়েছি। বেচলে দু'পয়সা আসবে। দাও—

দিচ্ছি।—বলে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ল সান্ত্বনা। ও বড়দি—শুনে যাও। তোমার আদরের ভগ্নীপতির কাণ্ড শোন। এক পয়সা কামাবার মুরোদ নেই—

সন্ধ্যারাণী হাতঘড়ির কথা ভুলে গিয়ে নারায়ণের গা থেকে সোয়েটারটা খুলে নিয়ে পোকায় কাটা দু'টো জায়গা রঙীন সুতো দিয়ে রিপু করছিল।

সান্ত্বনার কথায় অবাক হ'য়ে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কি হয়েছে? এত চেঁচাচ্ছিস কেন?

এই নাও তোমার হাত ঘড়ি।

মেজদির গলা পেয়ে বিমলা—মিনুও উঠোনে এসে হাজির।

কোথায় ছিল রে মাঝলি?—বারান্দা থেকে জানতে চাইল আন্না বিশ্বাস।

তোমাদের নেপেন জামাই মাঝরাতে উঠে বড়দির হাত থেকে খুলে চুরি করে রেখেছিল। বেচলে নাকি দু'পয়সা হবে!

চুপ কর পাগলি। চুপ কর—বলেও থামাতে পারছিল না সন্ধ্যারাণী।

বেলা দশটার পরিষ্কার রোদের ভেতর দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সান্ত্বনা মণ্ডল। এর চেয়ে এখন এই অসময়ে বৃষ্টি নামাও ঢের ভাল ছিল।

সন্ধ্যারাণী উঠোনটা হাল্কা করতেই হেসে বলল, দূর বোকা। বাড়ির জামাই বড়শালীর সঙ্গে এর চেয়ে অনেক বেশি রসিকতা করে!—বলে হাত ঘড়িটা কবজিতে বাঁধতে যাচ্ছিল।

মিনু এগিয়ে এল। ঘড়িটা দাও তো বড়দি।

কেন মিনুরাণী।

দাও বলছি। ও ঘড়ি আমার। আমি কাউকে দেব না।

নে! —বলে এগিয়ে দিল সন্ধ্যারাণী।

ভীষণ অপয়া ঘড়ি। দুই দিদিতে ঝগড়া হয় এর জন্যে। এ ঘড়ি ডাঙায় ওঠার পর ভোররাতে জাহাজে আগুন লাগলো।

ঠিক তখনি ঝণ্টু ছুটতে ছুটতে উঠোনে ঢুকলো। বাবা—বাবা কোথায়?

কি হয়েছে বল না।

বড়দির একথায় ঝণ্টু চারদিকে কাকে যেন খুঁজলো। সেজদি কোথায়?

বক ফুল পাড়ছে পুকুর ধারে। ভাতের সঙ্গে ভাজা হবে।

ঝণ্টু কাঁপতে কাঁপতে বলল, জঙ্গলে শুকনো কাঠ আনতে গেছি। খানিক ঢুকে দেখি—পড়ে আছে। চোখ খোলা—

কে? কে বলবি তো?

শশধরদা—

সন্ধ্যারাণী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—সেখানেই বসে পড়ল। ঠিক দেখেছিস তো ঝণ্টু?

আমার ভুল হয়নি বড়দি।

উঠোনে ঢোকার মুখে দুটো মানকচুর ছড়ানো ডাঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে

নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস সব শুনতে পেয়েছে। সে শান্ত উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জানতাম। আমি জানতাম শশধর—

নির্মলা আর তার ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোতে এগোতে দুপুর হয়ে যায়। ঝণ্ট আর বিমলা মিলে তাদের সেজদিকে ধরে রাখতে পারছিল না। সে সবার আগে ছুটে যাবে। পাছে পড়ে গিয়ে আরেকটা কাণ্ড বাধায়—তাই ধরে রাখা। সঙ্গে পাড়া পড়শী নিয়ে বেশ একটা বড় দল। পেছন পেছন নাতিনাতনী নিয়ে আয়না বিশ্বাস। তার নাকের পাথরটার দোলার সঙ্গে সঙ্গে দুপুরটাও দুলছিল। বাড়ি পাহারাদার থেকে গেছে একা নৃপেন মণ্ডল।

মিন্নু ওদের সঙ্গে সঙ্গে খানিক গিয়ে সাগরের দিকে চলল একা। গতকালই মনে হয়েছিল—দিনটা হাসির গেল। দিনটা সুখের ছিল। খানিক এগিয়ে তখনো জলন্ত—জাহাজটা চোখে পড়ল তার।

সে একা একা বালিতে নেমে এল। এখন তার সামনে শুধু শুনশান সাগর একা। এই ঘড়িটাই অপয়া।—বলতে বলতে তার ছোট্ট, সামান্য হাত দিয়ে যত জোরে পারে দূরের জলে ছুঁড়ে দিল।

কোথায় যে পড়ল বোঝার কোন উপায় নেই। এইবার এতক্ষণে মিন্নু জলের সামনে দাঁড়িয়ে একা ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করল। কান্নার ভেতরেই মিন্নুর একবার মনে হল—যখন ছুঁড়ে দিলাম তখনো হাত ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছিল।

টানেলের ভেতরে ট্রেন

বাবা। আমরা কি সমুদ্রের পাড়ে বসে আছি?

না বাবলু।

কিন্তু আমি যে ঢেউগুলো দেখতে পাচ্ছি। ওই যে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে—

ও তুমি ভুল দেখেছো। দেখি তোমার কপাল—বলতে বলতে একজন লম্বা চওড়া মানুষ নিজের ডান হাতের কররেখা চেপে ধরল কপালে। আবার তোমার জ্বর এসেছে। চল—ঘরে শোবে—

কি বলছো বাবা? ওই তো প্রণবদা ড্রিল করাচ্ছেন—

কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে। নাকে চশমার দাগ। এখন চোখে চশমা নেই। লোকটি কোন কথা না বলে ছেলেটিকে পাঁজা কোলে তুলে নিল।

তুলে নিয়ে দেখলো—তার ছেলে যেন জ্বরে ভারি হয়ে গেছে। বাইরে পড়ে থাকলো নুড়ি বিছানো রাস্তা—কাঠাচাপার কয়েকটা গাছ—তারের বেড়ার সীমানা। তার বাইরে রাস্তায় কয়েকটা সাইকেল। দূরে দূরে গাছগাছালির ভেতর এক' একখানা বাড়ি। বেলা সাতটা আটটার রোদ মাখানো কুয়াশা। তার ভেতর দূরের খাড়াই ডাঙ্গায় লাল টিবি।

ঘরে ঢুকে নিজের ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিল লোকটি। তারপর পাশের সিঙ্গল খাটখানা সাবধানে ঠেলে ঠেলে ছেলের খাটের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। দিয়ে ছেলের মুখে তাকালো। শীতের সকালের আলোর আনকোরা ঝলক ঘরেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার ভেতর আধো খোলা চোখে বাবলু ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে—ঠোঁটে যেন কিসের বিড় বিড়। আহারে! মোটে ছ' হাত লম্বা রক্ত মাংসের শরীর।

ঘরের বাইরে এসে বড় ডাইনিং হলে ঢুকলো লোকটি। ঠাকুর—একটু বরফ হবে?

ডাইনিং হলে ঢুকবার মুখে রান্নাঘর থেকে চওড়া করে সিমেন্ট করা একটা পটি এসে জুড়ে গেছে। তার ওপর খালি গা লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

বরফ তো এখানে নাই। যদি বলেন, ইণ্টারন্যাশনাল থেকে এনে দিব—?

পাশেই ইণ্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস। ঠাকুরকে লোকটি বলল, তা এনে দাও। শেষ রাত থেকে জ্বরটা এল—

তা খোকাবাবুকে বারান্দায় বইসতে দিলেন কেন?

বড্ড জিদি। যাও তো বাবা—বরফ এনে দাও—

অ্যাতো জ্বরে বরফ দিবেন? এই ঠাণ্ডায়? ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে পারেন কিন্তু।

—না না। ডাক্তার লাগবে না। অমন জ্বর উঠে যায় খোকার। তখন বরফ সারা গায়ে ঘষে ঘষে মাখালে তবে নামে। নাহলে তো তড়কা হয়ে যাবে—

ঠাকুর কি বলতে যাচ্ছিল। থেমে গেল। ডিসেম্বরের সকালে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামার কায়দায় কাছেরই শালবন দাপিয়ে একটা শব্দ চলে যাচ্ছে।

অবাক হতে দেখে ঠাকুর জানালো, রামপুরহাট লোকাল যাচ্ছে। প্রান্তিক ছাড়লো।

তারপরের স্টেশন?

কোপাই। বরফ এনে দিব বাবু?

তাড়াতাড়ি আনো। ছুটে যাও বাবা—

ঠিক তখন বাবলু খুব সুন্দর গন্ধ ভর্তি একটা ঘরে ঢুকলো। আশ্চর্য সব ফুল। কী তার বাস! অবিশ্বাস! বাইরে দূরে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ এঘরের পেছনের দেওয়ালের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। সকালবেলায় এখানে রোদ্দুর একদম ঝকঝক করে। আখরোট কাঠের লতাপাতা বানানো ঝরোকার ওপাশ থেকে খুব শান্ত একখানা মুখ চোখ তুলে চাইল।

বাবলু ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে বলল, আমায় ডেকেছেন?

খুব মিষ্টি গলায় ওপাশ থেকে ভেসে এল, হু। তুমিই তো অরুণ।

হ্যাঁ মাদার—

তুমি বিজয়া আম্বানির সঙ্গে খেলবে। ওকে খেলা থেকে বাদ দিও না।

না না মাদার—ওকে আর বাদ দিই না। বিকেলের ড্রিলের পর আমরা তো সমুদ্রের পাড়ে খেলি। সূর্য ডুবলে আমরা ফিরে আসি মাদার—

যত ইচ্ছে খেলবে। কিন্তু বিজয়াকে বাদ দিয়ে খেলো না। ও মনে কষ্ট পায়—

না না মাদার—ওকে আর কখনো বাদ দেব না।

সুন্দর ঘরখানা থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল না বাবলুর। বাবার নলিনীদা তাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

বাইরে বিজয়া আধানি দাঁড়িয়ে। বাবলুর সমান সমান হবে মাথায়। ঝুটি করে চুলের ডগা বাঁধা। মুখে ওর হাসি না রাগ—বুঝতে পারছিল না বাবলু।

বিজয়াই বলল, আর খেলবি অরুণ।

ও ছুটে গিয়ে বিজয়ার হাত ধরলো, খেলবোই তো। আগে চল—প্রণবদার ড্রিল সেরে ফেলি।

আমি ড্রিলে যাবো না অরুণ। তুমি যাও।

প্রণবদা জানলে বকবে। তুমিও চল বিজয়া—

বেশ। চলো তাহলে।

বরফ নিয়ে ঘরে ঢুকছিল লোকটি। জ্বরের ঘোরে বিকারে বাবলু ঠেলে উঠলো বিছানায়। বিকট চেঁচিয়ে বলল, বাবাগো—আমি নিচে পড়ে গেছি—বাঁচাও বাঁচাও—বাবা—

লোকটি ছুটে এসে তার ছেলের পায়ের কাছে বসলো। হাতে স্টেনলেসের বড একটা বাটিতে ফ্রিজের বরফের বরফি অনেকগুলো।

খোকা। এই তো আমি খোকা।—বলতে বলতে এক বরফি বরফ ছেলেটির ছোট কপালে লোকটি চেপে ধরলো। ধরেই মনে হল তার—জ্বরে বরফের টুকরোটাও যেন ছ্যাৎ করে উঠলো। ইস্—এখনই তোর মা কলকাতায়।

বরফ ঘসতে ঘসতে ছেলেটির বুকে লোকটির হাত চলে এল। সে মনে মনে বলতে গিয়ে বিড় বিড় করে উঠলো। হে ভগবান! বাবলুকে ভাল করে দাও। এ যাত্রা বাঁচাও—

বাবলু তখন জ্বরের বিকারে চেঁচাচ্ছিল—বাবা—সমুদ্রের জল উঠে আসছে। আমি যে ওপরে উঠতে পারছিনে—

ভয় নেই বাবা। তুমি এখন পণ্ডিচেরিতে নও বাবলু। আমরা কাল সন্ধ্যের ট্রেনে বোলপুর এসে পৌঁচেছি—

কে কার কথা শোনে!

বাবা! বাঁচাও বলছি। ঢেউ ভেঙে পড়ছে পায়ের কাছে। পা ভিজে যাচ্ছে বাবা—প্রণবদাকে বল—এক্ষুনি বল বাবা—বিজয়া এইমাত্র আমায় নিচে ঠেলে ফেলে দিল।

বলছি। বলছি বাবলু।—বলতে বলতে ছেলেটির হাফপ্যান্ট খুলে কেবল

লোকটি। খুলতে খুলতে বলল, সব জায়গায় এখন বরফ ডলতে হবে। কী কুক্ষণে যে বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম ভগবান! আমার কি এ বয়সে এসব সয়? না হয়?

খোলা দরজা দিয়ে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের অ্যাটেনডান্ট সরোজ উঁকি দিচ্ছিল। অবাক হয়ে সে দেখলো, আট ন'বছরের ছেলেটিকে উদোম ল্যাংটো করে কাল সন্ধ্যের বাবুটি বরফ ঘসছে তার গায়ে।

তক্ষুণি সরোজ রান্নাঘরের কাটারিটা হাতে নিয়ে ডাইনিং হলের জানালার পাশের দীঘল কচুগাছ থেকে একখানা বড় পাতা কাটলো।

গেস্টহাউসে কোন অয়েলক্লথ নেই। পাতাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, কতক্ষণ ঘসবেন? এরপর বরফ ফুরিয়ে যাবে। সয়ান—

অবাক হয়ে তাকালো লোকটি। তার ছেলের চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় হবে। গেস্ট হাউসের মাইনে করা অ্যাটেনডান্ট। সে কচুপাতাটা বাবলুর মাথার নিচে চালান করে দিয়ে ঢালটা নিচে মেঝের দিকের জলের বালতিমুখো করে নিল। তারপর নিজেই জল ধারানো শুরু করে দিল।

তখনো বাবলু চেঁচাচ্ছিল। আরেকটু প্রণবদা। আরেকটু নামুন। আমি ঠিক আপনার হাত ধরে ফেলবো। বিজয়াকে কিছু বলবেন না যেন। ও যে মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল একদম বুঝতে পারি নি। নয়তো ক্যালভার্ট থেকে আমায় এভাবে ধাক্কা দেয়—!

মাথায় জল ধারানো চলতে থাকলো। বরফ ঘসাও থামলো না।

বিকেল পাঁচটা সওয়া পাঁচটা। শীতকালের সন্ধ্যে। সরোজ চেঁচিয়ে বলল, বাবু। ওই তো ছেলে চোখ চাইছে—

আমি কোথায় বাবা?

তুমি আমাদের এখানে বাবলু। গেস্ট হাউসে।

পাঠ ভবনের অ্যাডমিশন টেস্ট হয়ে গেল?

সরোজ চেঁচিয়ে উঠলো। না দাদাবাবু। ভর্তির পরীক্ষা তো সেই শুক্কুরবার। এখনো দু'দিন আছে হাতে।

বহু কষ্টে বাবলু চোখ মেলে দেখলো ছেলেটিকে। তুমি কে?

আমি এই গেস্ট হাউসের চাকর। তোমরা যারা ভর্তির পরীক্ষা দিতে এয়েছো—আমি তাদের জল দিই। চা দিই। তোয়ালে দিই। মশারি

টানাই—বিছানাও ঝাড়ি।

বাঃ! তুমি তো বেশ মজার।

প্রায় অন্ধকার ঘরে সরোজ ছেলেটির মুখে হাসি দেখে নিজেও হেসে ফেলল।

লোকটি তখন পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের অফিস ঘরের সামনে লোকজনকে দেখছিল। অনেক খোকা খুকু ভর্তির পরীক্ষা দিতে এসেছে। সঙ্গে তাদের বাবা মা। এসব বাবা তার চেয়ে বেশ ছোট। প্রায় চোদ্দ পনের বছরের তো হবেই। অনেক বাবাই—যেন নিজেরাই পরীক্ষা দিচ্ছে—এইভাবে নিজেদের ভেতর—যা যা শুনেছে—তাই মিলিয়ে নিচ্ছিল।

ভর্তির পরীক্ষার দিন সকাল সকাল হরলিক্স আর বিস্কুট খেয়ে হাফপ্যান্টের ভেতর হাফশার্ট গুঁজে স্থ জুতো পরে নিল অরুণ। সরোজ এসে বলল, তোমায় খুব মানিয়েছে দাদাবাবু।

ওই মাঠটায় কি হয় সরোজ?

ওটা খেলার মাঠ। ভর্তি হলে দেখবে—যাত্রা থেটার হয় ওখানে। ওর পাশেই বাজি পোড়ানোর মাঠ। কত মজা হয় এখানে। আগে ভর্তি হও। পরশু তো খেলা দেখাচ্ছিলে—

অবাক হয়ে তাকালো বাবলু। তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়—কিন্তু স্কুলে পড়ে না। তার বদলে সরোজ ঘর ঝাঁট দেয়। মশারি টানায়। কিসের খেলা?

জ্বর হলেই তোমার নাকি তড়কা হয়। কী বরফ ডলাই ডললো তোমার বাবা।

আমি তো কিছু জানতে পারি না। কেমন ঘোর লাগে—

জবাবটা শোনার জন্যে সরোজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পাশের ছ' নম্বর ঘরটাই সবচেয়ে বড়। তিন খানা বেড পড়ে। সেখানে এখন একটা ফ্যামিলি উঠেছে—যারা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই সরোজ সরোজ বলে ডাকবে।

বাইরে এসে দাঁড়াল বাবলু। ওই যে দূরে বাবা রিক্সা নিয়ে আসছে। এখানে পণ্ডিচেরির মত সমুদ্র নেই। তবে গাছ আছে অনেক। দিনে সাত আটবার ট্রেন যাতায়াতের ঝমঝম শব্দ ওঠে। কিন্তু ট্রেনটা দেখা যায় না। সরোজ কাল রাতে বলছিল—এখানে নাকি একটা সাজানো জঙ্গলে হরিণ থাকে। তাদের শিকার করা বারণ। সেখানে ঢুকতেই ফরেস্ট বাংলো আছে।

রিক্সায় বসেই বাবলু প্রথম কথা জানতে চাইল, পণ্ডিচেরি থেকে আমায় ছাড়িয়ে আনলে কেন বাবা ?

আবার যদি বিজয়া তোমায় ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের কিনারে ফেলে দেয়—

হো হো করে জ্বরের শরীরে হেসে ফেলল বাবলু। না না—আর দিত না।

আমারও তো বয়স হচ্ছে বাবলু। অতদূরে তোমায় ফেলে আমি আর তোমার মা থাকতে পারি না।

বেশ তো বাড়ি ভাড়া করে ছিলে। সেরকম থাকতে তুমি আর মা। আমি বাড়ি থেকেই স্কুলে যাচ্ছিলাম।

আমি তো রিটায়ার হয়ে গেছি বাবলু। এখন খরচ কমাতে হবে না আমাকে ?

দেখো বাবা—এখানেও তুমি হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে আর মাকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠবে শেষে।

আগে তো ভর্তি হও। আর কলকাতা থেকে বোলপুর তো ট্রেনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

পরীক্ষা হয়ে গেল বেলা বারোটার ভেতর। খাতা টাতা দেখে প্রিন্সিপাল বেলা চারটেয় ডেকে পাঠালেন। তুমিই অরুণ কিশোর রায়। ইংরিজি অঙ্ক তো ভালই করেছো। তোমার বাবাকে ডাকো।

হাসিমুখে প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে বাবাদের ভিড়ে নিজের বাবার লম্বা লম্বা আঙ্গুল ধরলো, বাবা—

অর্জ্জুনবাবু। আপনার ছেলে তো ভালই করেছে। কিন্তু বাংলা যে একদম জানে না।

পণ্ডিচেরিতে মিডিয়াম ছিল ফ্রেঞ্চ।

ওকে বাংলাটা শিখিয়ে আনুন। আমি নিয়ে নেব। ছ' মাস পরে আসুন

ছ' মাস ?

আমি কথা দিচ্ছি—ওকে নেব। ঠিক নিয়ে নেব।

এখন অরুণ টের পায়—তার দু'চাকার ছোট বাই সাইকেলের সামনে রোজ দু' তিনবার করে বিশ্বভারতী ফুরিয়ে যায়। ফণ ফণ করে বেড়ে ওঠা শরীরের নিচের দিকে পা দু'খানা যেন আলাদা একজোড়া রণপা। তাই তো লাগে অরুণের।

বর্ষা, রোদ্দুর, শীত খেয়ে খেয়ে এখানকার গাছগুলো লাল কাঁকুরে মাটিতে নিজেদের গোঁড়াগুলো আরও মোটা করে নিল এই তিন বছরে। এর ভেতর রামকিঙ্কর নাকি একদিন নিশুতি রাতে জ্যোৎস্নায় গান গেয়ে উঠেছিলেন। রতনপল্লীর দিককার সৌর, ওর বাবা নাকি শুনতে পেয়েছে। সেবাপল্লীর মাঠে নতুন নতুন বাড়ি উঠলো অনেকগুলো!

ও অরুণদা—এত সকালে কোথায় চললে—?

ব্রেক কষে অরুণ এক পায়ে দাঁড়াল। আরেক পা প্যাডেলে। একি সরোজ—এত দাড়ি রাখলে কবে? এত দাড়ি কবে হল তোমার?

পূর্বপল্লীর গেস্ট হাউসের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সরোজের হাতে কেরোসিনের টিন। গায়ে র‍্যাপার। হা হা করে হেসে উঠে সরোজ বলল, নতুন দাড়ি—তাই রাখলাম। দাড়ি না রাখলে কেউ মানতে চায় না। তুমি তো এখন টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার। এই এখানে দেখি। আবার সেই ওখানে দেখি তোমায়—

তোমার দাড়ির মতই এটাও আমার নতুন সাইকেল। ঘুরবো না?

হো হো করে দু'জনই হাসলো। তারপর খচ করে গম্ভীর হয়ে সরোজ বলল, জানো অরুণদা—এই বৈশাখে আমার বিয়ে। তোমায় কিন্তু বরযাত্রী যেতে হবে।

ওঃ। বউ যাতে মানে—সেজন্যে দাড়ি রাখছো!

না না। যাই—আজ আবার ভর্তির পরীক্ষা। কত যে গার্জেন এসেছে, যাই—

অরুণ সাইকেল চালাচ্ছিল আর বিশ্বভারতী ফুরিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দি ভবন চীন ভবন, বড় মেয়েদের হোস্টেল, প্রধান মন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামার মাঠ, কলা-ভবন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, হাসপাতাল। এইবার হেনাদির বাড়ি।

লতাপাতার বেড়া দেওয়া ছোট কম্পাউণ্ডে ঢুকেই অরুণ দেখলো, হেনাদি ডালিয়ার চারা বসাচ্ছেন। উবু হয়ে বসে একটা মেয়ে মাটি ঝুরো ঝুরো করে দিচ্ছিল। অন্য আরেকটা মেয়ে বাঁশের বাখারি আর কাটা টিন দিয়ে রোদের আড়াল বানাচ্ছে।

এসে প্যাছো। যাও বারান্দায় বোসো গিয়ে—ও পুষি মাটি ঝুরো ঝুরো করে দিচ্ছিস তো?

অরুণ বেড়ার গায়ে তার দু'চাকা হেলান দিয়ে বারান্দায় বসতে বসতে ভারিক্কী ভঙ্গীতে বলল, ও হেনাদি আপনি ডালিয়া বসাচ্ছেন ওই দু'জন পুচকে

মেয়ের ওপর নির্ভর করে ?

পাঠ ভবনে পড়ান হেনা দত্ত। ঘুরে দাঁড়ালেন, তুমি তো এভাবে কথা বলতে না অরুণ ?

লজ্জায় অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল অরুণ। হেনা দত্ত দেখলো, অনেক আগেই গোঁফের আভাষ এসেছে অরুণের নাকের নিচে। শান্ত, ঠাণ্ডা শীতের সকালে রোদ্দুর একদম ঝকঝক করছে। এর ভেতর মাটি মাখা হাতে পুষি এগিয়ে এল।

আমরা পুচকে ? তুমি কি ? রোজ গানের লাইন ভুল গাও উপাসনায়—

অরুণ এই মেয়েটিকে আম্রকুঞ্জের খোলা ক্লাশে দু'একবার দেখেছে। তাদের চেয়ে নিচেই পড়ে। গুরুপল্লীতে থাকে ? না—সেবায় ? ওইসব নতুন বাড়ির কোন একটায়।

অরুণ আজ হেনাদির কাছ থেকে গান তুলে নেবে বলেই এসেছে। সে পুষি নামের মেয়েটির মাটি মাখা হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, শীতের ফুল গাছের চারা তোলা, বসানো কঠিন বলেই আমি ও কথা বলেছি। অনেক সাবধানে ওসব লাগাতে হয় বলেই তো—

পুষি তার দৃষ্টি দিয়ে অরুণকে সিধে দাঁড় করিয়ে রাখছে দেখে বারান্দার ভেতর দিকে কাগজ হাতে নিয়ে বসা বেতের মোড়ার ভদ্রলোকটি চোখের চশমা খুলে বললেন, অরুণ তো অতশত ভেবে বলেনি—

অরুণ একটা কুটো পেয়েই যেন সেটা আঁকড়ে ধরলো, দেখুন তো মোহিতদা—

মোহিত দত্ত এখানে কলেজে ইতিহাস পড়ান। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—ও হেনা। আমাদের জল খাবার দেবে বলেছিলে সেই কখন—রোদ কতটা উঠে গেছে দেখেছো।

একথায় হেনাদি ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। পুষি সিঁড়ি দিয়ে মট-মট করে বারান্দায় উঠে এসে মোহিত দত্তের কাছাকাছি বসলো। বসেই ডাকলো, ও মাধুরী—উঠে আয়—এখন আবার মাটি ঠাসিসনে—

মাধুরী মেয়েটি বলল, ঠাসছি না। রোদের আড়াল বানাচ্ছি।

একটু পরেই হেনা দত্ত চারখানা প্লেটে হাতে গড়া রুটির সঙ্গে চিজের টুকরো দিয়ে বললেন; আরেকটু বসলে আলু কুমড়ো দিয়ে একটা তরকারি বানিয়ে দিতে পারি—

অরুণ মহা তৃপ্তিতে খেতে খেতে বলল, তার দরকার নেই। বরং যদি

একটু চা করেন।

মোহিত দত্ত হো হো করে হাসলেন। চা খাবে কি। বরং একটু দুধ দিক হেনা।

না। দুধ আমি একদম খাইনে। কতদিন হল ছেড়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ। বুঝেছি। তুমি অনেক বড় হয়ে গেছো! এখন আর দুধ খাওনা!

মাধুরী আর পুষি একসঙ্গে বলল, আমরাও আর দুধ খাই না।

হেনাদি বললেন, ওঃ। তোমরাও অনেক বড় হয়ে গেছো দেখছি!

পুষি বলল, দুধ খেলে আমার অ্যালার্জি হয়। ডাক্তার কলা খেতেও বারণ করেছে হেনাদি।

মোহিত দত্ত বললেন, দুধে দরকার নেই। তোমার তো টান হয়—

পুষি চুপ করে মাথা নাড়লো। কাছেই বিশ্বভারতী হাসপাতাল। সেখানকার বারান্দায় এইমাত্র গোটা দশেক বেডশিট কেচে মেলে দেওয়া হয়েছে। এ বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিল।

একটু বাদেই হেনা দত্তের হারমোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গে পুষি আর মাধুরী দিব্যি গলা খুলে গাইতে লাগলো। মাধুরীর ফ্রকে ভিজে মাটির গুঁড়ো। ওর ডান হাতের আঙুলের নখেও মাটি। সেই তুলনায় পুষির হাতে বা ফ্রকে কোন মাটিই নেই। এই সব দেখতে দেখতে অরুণ গলা মেলাচ্ছিল। হচ্ছিল না।

হেনাদি ধমকে উঠলেন, কি হচ্ছে অরুণ? এভাবে গাইলে তুমি মেলায় গানের দলে থাকবে কি করে!

পুষি বলল, ওকে বাদ দিন হেনাদি।

অরুণ চেঁচিয়ে উঠলো, না না। তা হবে না। আমি গানের দলে থাকবোই, তুমি বাদ দেবার কে?

হেনা দত্ত বললেন, তাহলে ভাল করে গলা মেলাও।

ঠিক এই সময় সারা বিশ্বভারতীর ওপরকার আকাশে ভীষণ আরামের রোদ ছড়িয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা বাতাসে গাছপালা, ফুল, লতা সামান্য দুলছিল।

অরুণ গলা খাটো করে বলল, আমি কি বলতে চেয়েছি জানেন হেনাদি?

হারমোনিয়মে বেলো করা থামিয়ে হেনাদি অবাক হয়ে তাকালো।

অরুণ মাথা তুলে পুষির মুখে তাকালো, পণ্ডিচেরিতে পড়ার সময় বিজয়া আম্বানি আমাদের সঙ্গে পড়তো হেনাদি। এই এক ফোঁটা মেয়ে। সমুদ্রের ধারে প্রণবদা আমাদের ড্রিল করাতেন। খেলতে এসে বিজয়া আমায় ক্যাল-ভার্ট থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল। একদম পুচকে একটা মেয়ে—

কি বলছো ?

হ্যাঁ। সত্যি হেনাদি। মরে যাবার কথা। অন্তত একশো হাত নিচে ঢেউ আটকাতে পাথরের বড় বড় চাই—বোল্ডার। ওখানে পড়লে আর দেখতে হ'ত না। ভাগ্যিস পাশেই পড়েছিলাম ভিজে বালিতে—

তারপর ?

প্রণবদা সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে আমায় তুলে আনেন।

পুষি বলল, এখানে কে ধাক্কা দিচ্ছে ? আগে ভাগে আমাদের পুচকে বলে নিজে নিজেই একজন কেউকেটা !

মাধুরী বলল, যাক্ বাবা ! বেঁচে গেছো খুব।

অরুণ কি বলতে যাচ্ছিল। মোহিত দত্ত হেসে উঠলেন, বেঁচে না গেলে এখানে এখন গান তুলতে এল কি করে অরুণ !

আমি বলি কি হেনাদি—আমি বরং একা একা এসে গানটা গলায় তুলে নিয়ে যাবো—

কেন ? লজ্জা হচ্ছে ? পুষিদের সঙ্গে শিখতে !

না না। আমি আসি—বলতে বলতে অরুণ প্লেটের হাতে গড়া রুটি দিয়ে চিকেন টুকরোটা মুছে নিল। তারপর মুখে দিয়েই সাইকেলটা তুলে নিল। আসি মোহিতদা—

অরুণ চলে যেতে মাধুরী বলল, আমার ছোট কাকাও ঠিক এমনই একদম গাইতে পারতো না।

পুষি গাছপালার দিকে তাকিয়ে বলল, সুর থাকলে তো গলায় !

হেনা দত্ত খুব গোপনে প্রফেসর মোহিত দত্তর চোখে তাকালে। তাতে মোহিত দত্ত চুপচাপ শুধু চোখেই হাসলেন। মাধুরী বা পুষি কেউই দেখতে পেল না সে হাসি।

রোজ এই সময় একটা মালগাড়ি বোলপুর ছেড়ে প্রান্তিক মাড়িয়ে কোপাই স্টেশনের দিকে মিলিয়ে যায়। আজও যাচ্ছিল। ওয়াগন টানতে টানতে ইঞ্জিনের পাঁজরের শব্দ শোনা যায়। বোলপুর ছাড়ার পর রেল লাইনের দু-' পাশের জমি উঁচু হয়ে লাইনকে নিচে ফেলে দিয়েছে। এদিকটায় এখন তাকালে কয়েকটা তালগাছের মাথা শুধু। আর শোনা যায় উঁচু মাটির প্রায় সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন যাওয়ার গুম গুম শব্দ।

সাইকেলটাকে এক এক সময় জ্যান্ত লাগে অরুণের। শান্তিনিকেতনের রাস্তা ঘাটে সাইকেলই তার টাট্টু ঘোড়া। এক একদিন ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের

সেণ্টুদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় তার। সেণ্টুদাও সাইকেলে। তখন তাকে না-বলা রেসে হারিয়ে দিয়ে দারুণ লাগে অরুণের।

সেণ্টুদা পেছনে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, তুমি জিতে গেলে অরুণবাবু—

অরুণ স্পীড কমিয়ে কাছাকাছি এসে যায় সেণ্টুদার। তার বাবার চেয়ে ছোটোই হবে। শান্তিনিকেতনের গোড়ার দিককার কোন্ কর্মীর ছেলে সেণ্টুদা। রবীন্দ্রনাথ ওঁর বাবাকে খুব ভালবাসতেন। সেণ্টুদা মানুষটাকেও অরুণের খুব ভাল লাগে। এমনিতে ব্যস্ত নয়—কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এলেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেণ্টুদা। তখন পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে তারও ডিউটি পড়ে।

পাশাপাশি সাইকেল চালাতে চালাতে অরুণ একদিন জানতে চাইল, আপনি রবীন্দ্রনাথকে কতদূর থেকে দেখেছেন?

আমি যখন তোমার বয়সী—গুরুদেব আমায় হাতের লেখা লিখতে দিতেন।

উঃ! কি লাকি আপনারা!

আমাদের ভেতর সবাই নয়। আমরা ক'জন যারা ফেল করেছিলাম—গুরুদেব নিজে তাদের পুরনো পড়া, হাতের লেখা, বানান—সবকিছু দেখে দিতেন। বলতে পারো কয়েকমাস দেখে দিয়েছিলেন।

আপনাদের কেমন লাগতো?

খুব খারাপ। ফাঁকি দেবার কোন পথ ছিল না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পড়াচ্ছেন—কোন রকম আলাদা কিছু মনেই হয়নি তখন?

একদম না। কিছুই বুঝতে পারিনি তখন। আমাদের মেজদাদের তো গুরুদেব পর পর তিন পিরিয়ড পড়াতেন। কোনদিকে যাবে?

জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে সেণ্টুদার বাইক ঘুরে গেল। ওদিকটায় সুরুল যাবার রাস্তা। সেখানেই শ্রীনিকেতন।

পরিষ্কার আকাশ। পা একদম টায়ার্ড হয়নি। এখুনি অরুণ প্যাডেল করে গৌর প্রাঙ্গণ, ঘন্টাতলা নয়তো শ্যামবাটির দিককার ঝিলে চলে যেতে পারে। ওখানে এখন দূরদেশের পাখিরা আসে।

কিন্তু অরুণ অন্যমনস্ক প্যাডেলে বাড়ির কাছে চলে এল। কারা যেন বারান্দায় বসে। মা চা দিচ্ছে। বাবা দাঁড়িয়ে।

আয় বাবলু। এই আমার ছেলে।

অরুণ সাইকেল রেখে বারান্দায় উঠলো। আজকাল হাঁটু বেরোনো হাফ-

প্যাণ্টের বাইরে পা বের করে লোকের সামনে কেমন একটা অস্বস্তি হয় অরুণের। ভদ্রলোকের রীতিমতো ছবি আঁকা চেহারা। নীলচে চোখ। সাদা রং। সেই তুলনায়—স্ত্রীই হবেন—মহিলা কালো। ভদ্রলোকের মাথার চুল-গুলো ইতিহাস বইয়ের রাজারাজড়াদের মত কোঁকড়া—দু'একটা পেকেছে।

আমাদের এই একটিই সন্তান—

অরুণের বাবার কথায় ভদ্রলোক চায়ের কাপ থেকে ঠোঁট সরিয়ে বলল, মাধুরী আমাদের একই মেয়ে। বড় ছেলে কলকাতায় শোভাবাজার স্কুলে—এবার সেভেনে উঠলো। ওদের মা তো মাধুরীকে হোস্টেলে দিয়ে তক কান্নাকাটি করছেন।

অর্জুনকিশোর রায় বলল, না না হোস্টেল খুব ভাল। আমরাও বাবলুকে হোস্টেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো রিটায়ার করেছি সময় হবার আগেই। কলকাতায় বসে কি করবো? তাই বাড়ি ভাড়া করে ওকে নিয়ে আমরা দু'জনে এখানে আছি। হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে এনে—

অর্জুনের কথার ভেতর অরুণ চেঁচিয়ে বলল, আমি আবার হোস্টেলে ফিরে যাবো বাবা। সেখানে কত বন্ধু। কত খেলা—

ওই ভুজঙ্গ চৌধুরীমশাই—আপনার মেয়ে মাধুরীও নিশ্চয় আনন্দে আছে।

মাধুরী তো। অরুণ—চৌধুরী নামে ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। এই খানিক আগে আমাদের টিচার হেনাদির বাড়িতে মাধুরীর সঙ্গে গান তুলছিলাম গলায়—

অর্জুন কিশোর রায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। মাধুরীর বাবাটি—এই চৌধুরী তার চেয়ে না হোক বছর দশেকের ছোট। তার সঙ্গে প্রায় ওর মেয়ের বয়সী ছেলের বাবা হিসেবে কথা বলতে হচ্ছে—এটাই যেন কেমন এক ধরনের হেরে-যাওয়া হেরে-যাওয়া লাগে অর্জুনের। এক ধমকে অরুণকে থামিয়ে অর্জুন রায় বলল, ইনি ভুজঙ্গ চৌধুরী। বাটায় তোমার যে মেশো থাকেন—তার বন্ধু—

বাবাকে এরকম ধমকে কথা বলতে বড় একটা দেখে না অরুণ। তার গলা বুজে আসছিল। বাবা কি বলছে—তার কানেও ঢুকছিল না। চোখ বড় বড় জলের ফোঁটায় বন্ধ হওয়ার দশা। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেল অরুণ। এই সকালেও ঘর ঘন অন্ধকার।

কখন মা এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে। মা বলে যাচ্ছে—কেউ কথা বললে তার ভেতর অত চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই বাবলু। ভুজঙ্গবাবু বাটায়

তোমার ছোটোমেশোর পরিচিত। ওখানে চৌধুরী মশাই ক্যান্টিনে কি সব সাপ্লাই দেন। এখানেও হোস্টেলে সাপ্লাই দিতে চান। তাই তোমার বাবার রেকমেণ্ডেশন নিতে এসেছিলেন—

রেকমেণ্ডেশন কি জিনিস মা?

ওই একটু বলে দিতে বলছিলেন। তারপর দু'জনে মেয়েকে দেখতে গেলেন—। সামনে পূজোর ওদের কলকাতার বাড়িতে দুর্গা পুজো দেখতে যেতে বলে গেলেন। চৌধুরী বংশের ধুমধামের পূজো।

সে তো এখনো অনেক দেরি মা। চল না আমি, বাবা আর তুমি কোথাও ঘুরে আসি। শুধু আমরা তিনজন। আর কেউ না—

বেশ তো। চল এখুনি—

ঘরের ভেতরে চমকে উঠলো অরুণ। এ যে তার বাবার গলা। ছুটে বারান্দায় চলে এল অরুণ, আমি ভেবেছি—তুমি ওদের এগিয়ে দিতে গেছো। চল কোথাও আমরা চলে যাই—

যেমন পণ্ডিচেরিতে যেতাম! সমুদ্রের ধারে মাছ কিনতাম!!

হ্যাঁ বাবা।

এখানে তো কোন সমুদ্র নেই বাবলু। চল—আজ সন্ধ্যেয় বোলপুরে দালাল এম্পোরিয়ামের পাশের স্টুডিওতে আমরা গিয়ে গ্রুপ ফটো তুলবো।

নিজের বাড়ির হাতায় এসে পুষি থমকে দাঁড়ালো। গাছপালার ভেতর একতলা বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবা চীৎকার করে কাকে বকছে। এ আপনি কি করেছেন? আবার ঘাসিরামের দোকান থেকে আমার নামে সুজি ঘি, চিনি বাকি এনেছেন?

কাঠের গেট খুলে ছুটে বাড়ির উঠোনের আমতলায় চলে গেল পুষি। কি করেছো দাদু? আবার কি করেছো?

কিছু না দিদিভাই। একটু সুজি বানালাম। বাড়ির কয়লা কেরোসিন চাইনি। শুকনো কাঠকুটো দিয়েই আগুন জেলে ওই তো বানিয়েছি। ছাখ তোর মা অব্দি কেমন করছে—

পুষি বারান্দায় তাকিয়ে দেখলো—তার বাবার পেছনে মা জয়দা পান মুখে একদম রাক্ষুসি হয়ে দাঁড়ালো। তোমারই তো মেয়ে দাদু—তোমায় হয়ে কিছু বলে না?

ঠিক এইসময় বারান্দা থেকে মা ডাকলো, এই পুষি। উঠে আয়। উঠে আয় বলছি—

না। আমি যাবো না।

এবার তার বাবা ডাকলো। চলে আয় বলছি। ও কি? গাছতলায় সুজি খাওয়ার হ্যাংলামো কেন? উঠে আয়—

পুষি গুটিগুটি বারান্দায় উঠে এল। বারান্দায় উঠতে উঠতে একদম অন্য জগতের সুর তার কানে এসে বাজলো। দূরে কোথায় বাঁশী বাজছে। নিশ্চয় সৃষ্টিধরদা বাঁশী বাজাচ্ছে কোন গাছতলায় বসে। বাবা তখনো এখানে প্রফেসর হয়ে পড়াতে আসেন নি। পুষি আর তার দিদি শিশুভবনে তখন। সৃষ্টিধরদা কিচেনে ছিল। খুশীদি এই শীতে তাদের তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দিত। তখনই শুনেছিল—সৃষ্টিধরদা কিচেনে রান্না করে আর রাতে যাত্রাদলে বাঁশী বাজায়।

ঘরে ঢোকার মুখে ফিরে তাকালো উঠোনে। নিতান্ত অপরাধীর মতই তার মায়ের বাবা এক মুখ শাদা দাড়ি নিয়ে উঠোনের আমতলায় দাঁড়িয়ে। সামনে মাটি খুঁড়ে বানানো চুলোর ওপর সুজি সুদ্ধ কড়াই। দিদিমাকে পুষি দেখেনি কোনদিন। তার জন্মের আগে নাকি তিনি মারা গেছেন। মা বলেছে—দাদু দিদা ওপারে আদমদিঘি নামে একটা জায়গায় থাকতে মায়ের জন্ম।

সামনের ঘরে সাত আট আলমারি বাবার বই। দেওয়ালে সেকস্‌পীয়রের ছবি। এর ভেতরেই পড়াশুনোর টেবিলে বাবার তামাকের সুগন্ধী থাম। সিগারেট পাকিয়ে খায় বাবা। অনেকগুলো পোড়া কাঠি।

পুষি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, দিদি মাথা নিচু করে খাটের ওপর কাঁদছে বিছানায় চোখ চেপে। ফুলে ফুলে। মোড়াটা অব্দি সেই ঝাঁকুনিতে কাঁপছে। মোড়ায় বসে খাটের ওপর বই রেখে পড়ছিল নিশ্চয়। এই দিদি—

চোখ তুলে চাইলো রিনি।

একি! ক্লাশ নাইনের মেয়ে এত কাঁদে দিদি? চোখ তো ফুলে গেছে—

কান্নায় মুখ বেঁকেচুরে গেল রিনির। দাদুর এ অপমান আমার সহ্য হয় না পুষি। কেন যে দাদু অন্য কোথাও চলে যায় না? যাবেই বা কোথায়!

পুষিও দেখাদেখি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কোন জায়গা নেই দাদুর। মেয়ে হয়ে মা যে কি করে—

রিনি মাথা তুলে ছোটবোন পুষির কথাটা সম্পূর্ণ করলো, তার বাবার এই অপমান সহ্য করে? আমার বুক ফেটে যায় পুষি—

দুই বোন গাছপালার ভেতর এই একতলার ডানদিকের ঘরে প্রায় জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসলো। তখনো প্রফেসর দ্বিজেন ঘোষ নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন—সুজি খাবার ইচ্ছে হয়েছিল তো আপনার মেয়েকে বলতে পারতেন—

ঘরের ভেতর রিনি আর পুষির কান খাড়া হয়ে উঠলো একই সঙ্গে। দাদু কি বলে?

আমার খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। তোমার মেয়েদুটিকে একটু একটু খাওয়াবারও ইচ্ছে ছিল। শান্তি সংসারে ব্যস্ত বলে ওকে আর বিরক্ত করিনি।

রিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি কোনদিন মাকে ক্ষমা করবো না দেখিস্।

কাঁদতে কাঁদতে পুষি তাকিয়ে থাকলো দিদির মুখে। দিদি বড় সুন্দরী। তবে তার একথার বিন্দু বিসর্গও সে বুঝতে পারলো না। মনে মনে ভাবলো কোন মেয়ে কি তার মাকে ক্ষমা করতে পারে? সে কেমন ক্ষমা? ক্ষমা তো বড়রাই করে ছোটদের।

রিক্সা থামার আগেভাগেই অরুণকিশোর লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। সে এতক্ষণ পাদানীতে বস্তার ওপর বসেছিল। সিটে ছিল অর্জুনকিশোর রায় আর অরুণের মা বিমলা রায়। সন্ধ্যের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ। চাদ্দিকে ভিড়। বিচিত্রা সিনেমার সামনে অরুণ তার মুখ প্রায় ঢেকে বসেছিল। যদি তার কোন বন্ধু এ অবস্থায় তাকে দেখে ফেলে। একদম রিক্সার পাদানীতে!

স্টুডিওর আলো, সিন-সিনারি ঠিক করতে আধঘণ্টা লেগে গেল। মা আর বাবা দু'খানা চেয়ারে বসে। মাঝখানে অরুণ দাঁড়িয়ে। স্টুডিওর ভেতরে বাইরের শীত এসে ঢুকছিল।

ফটোগ্রাফার যেন বড্ড দেরি করছিল। অর্জুনকিশোর বলল, ফটোতে তোমার পাশে আমায় মানাবে না। তুমি আঠাশ—আমি একান্ন।

আজেবাজে কথা বলবে না তো।

অরুণ লক্ষ্য করলো, তার বাবা আবার বিড় বিড় করে কি বলছে। সে শুনলো, বাবা বলছে—এ ছবি তোমায় দেয়ালে তুলে রাখতে হবে বিমলা—

আর একটা কথা বললে কিন্তু আমি উঠে যাবো। পুরুষের স্বাস্থ্যই বয়স।

তুমি এখনো আর পাঁচজন স্বামীর চেয়ে অনেক শক্তপোক্ত আছো। আরও অনেকদিন এমন থাকবে—

সে আর কদ্দিন! এইবার ঢিলেঢালা হয়ে যাবো।

আমি উঠলাম—বলে বিমলা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। লম্বা হাতে অর্জ্জুন বিমলাকে টেনে চেয়ারে বসালো।

রবীন্দ্রনাথের মতই লম্বা দাড়ির ভেতর থেকে ফোটোগ্রাফার বলল, আপনারা আরেকটু ঘন হয়ে বসুন। তারপর অরুণের চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি দু' পাশের চেয়ারে দু'খানা হাত রাখো।

অরুণ বিড় বিড় করে বলল, আর যদি তোমরা ঝগড়া কর মা -আমি কিন্তু ছুটে বেরিয়ে যাবো।

ফটোগ্রাফার বলল, রেডি। একটু হাসুন সবাই—একটু—

ঠিক এইসময় হেনা দত্ত তার কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে মোহিত দত্তের সঙ্গে গল্প করছিল। বিশ্বভারতীতে ইলেকট্রিক চলে যাচ্ছিল—আবার ফিরেও আসছিল।

আজ দেখলাম—পুষির দাদু ভরদুপুরে হন হন করে কোথায় চলেছেন। খাওয়া হয়নি হয়তো। ভেবেছিলাম—ডেকে আসন পেতে দুটো খাওয়াই। হাজার হোক বউ নেই। ভালমন্দ দুটো খাওয়ার ইচ্ছে হয় তো এই বয়সে—

না ডেকে ভালই করেছো হেনা। ডঃ ঘোষ যা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলেন—হয়তো আমাকেই কিছু বলে বসতেন।

এরপর অনেকক্ষণ দু'জনে কোন কথা হল না। কাছেই কয়েকখানা কোয়ার্টার পরে অশেষ ব্যানার্জী এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন। গিরিধারিদার বাড়ির ছাদে এইমাত্র আকাশপ্রদীপ দেওয়া হল। এবার একটা ট্রেন দাপাতে দাপাতে প্রান্তিকে গিয়ে থামবে। তারপর ইঞ্জিনের বুকের ভেতরকার লোহালক্কড় ফের ধড়ফড় করে উঠতেই গাড়ি কোথাও রওনা হবে।

শীতের রাতে উঁচুগাছের ডালে ডালে কোন অজানা লতা ফুল দিয়ে থাকবে। অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার নেমে আসা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মোহিত দত্ত সে গন্ধ পেল। পেল হেনা দত্ত। কিন্তু দু'জনের কেউই কোন কথা বলল না। চুপ করে থেকে হেনার মনে হল—এ যেন এই শান্ত জীবনেরই সান্ধ্য সুবাস। জীবনে হেনাকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে এই জীবনে

আসতে হয়েছে। পড়াশুনো, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা—এসব কুড়িয়ে কুড়িয়েই জীবনের অনেকটা চলে যায়। তারপর চাকরিতে এসে সে দেখে—পড়ানোর কাজে ওসব পড়াশুনো কোন কাজেই যে আসে না।

দেশ বিভাগের পরেও মোহিত দত্ত খুলনায় দৌলতপুর কলেজে পড়াতে চাকরি নিয়েছিল। পাকিস্তানে তখনো মুসলিম লিগ সরকার। একজন ইণ্ডিয়ান হয়ে আওরঙ্গজেব পড়ানো ডিগ্রি কোর্সের ক্লাসে যে কী কঠিন ছিল।

মোহিত আছো। ও মোহিত—

কে? অর্জ্জুনদা? আসুন—আসুন।

লম্বা ছায়া ফেলে অর্জ্জুনকিশোর রায় বারান্দায় উঠে এলেন, তোমার ওই ইতিহাসের বইখানা দাও তো মোহিত।

কোনটা?

সেই যে বর্ধমানের সুবেদারকে মরণযুদ্ধে টেনে আনলো দিল্লীর সম্রাট—যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় নামিয়ে সুবেদারকে কোতল করবেই সম্রাট—সুবেদারের না মরে মুক্তি নেই—তাকে মরতেই হবে—

হেনা দত্ত ধরিয়ে দিল—কেননা তার সুন্দরী বউকে চাই-ই চাই সম্রাটের! নূরজাহানের এ গল্প পড়ে রাতে চোখ খারাপ করবেন কেন অর্জ্জুনদা? তার চেয়ে আপনি দৌলতপুরের গল্প বলুন আমাদের।

হেনা তো ঠিকই বলেছে অর্জুনদা। বরং চলুন আমরা খানিকক্ষণের জন্যে দৌলতপুরে চলে যাই।

অর্জুনকিশোর রায় অন্ধকারে বাঁধানো বারান্দার বর্ডারে সিমেণ্ট বেঞ্চে বসলো। তার পেছনে পুরো মাটিতে শীতের ফুলের সদ্য বসানো চারা শিশিরে ভিজছিল। লন আর বেড়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জ্যোৎস্না এখন যেন মাছ ধরার ছড়ানো জাল অনেকটা।

যে দৌলতপুরে আমরা খুলনা টাউন থেকে সাটেল ট্রেনে কলেজ করতে যেতাম—তা আজ মনে হবে রূপকথা মোহিত। দৌলতপুর স্টেশনের গায়ে মুজগুন্নি বলে একটা জলা জায়গা ছিল। শুনেছি—পরে সেখানে হাউসিং কলোনী হয়েছে। আমাদের সময়ে সেই জলায় সন্ধ্যেরাতে আমি নিজে আলেয়া দেখেছি।

জায়গার নাম মুজগুন্নি?

হ্যাঁ। কথাটা আরবি। মানে হল সমবায়। কলেজে থাকতে মৌলভী স্যার বলেছিলেন। দেখো সেই জলায় সমবায় হাউসিংয়ের বাড়ি উঠেছে।

আজও হয়তো বর্ধমানে গেলে দেখতে পাবো—নূরজাহানের স্বামীর কবর আছে—

না, জানি না মোহিতদা—

সেই কবরের কাছে কোন ভাড়াবাড়িতে হয়তো একজন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর বউ নিয়ে থাকেন—সংসার করেন—

হেনা দত্ত এবারও যোগ করে দিল—আর সেই ইন্সপেক্টরকে কোতল করার জন্যে কোন রাইস মিল মালিক ষড়যন্ত্র ভাজছে !

মোহিত দত্ত চেঁচিয়ে উঠলো, সম্রাটের জায়গায় রাইসমিল ওনার মানায় না হেনা। তোমরা দেখছি অজিতেশের শের আফগান নাটক করে তুলছো। চার পাঁচশো বছর আগের ইতিহাসে তো হামেশাই খুনখারাপি হত।

অন্ধকার বারান্দায় গল্পের ফ্লো ঘুরে নূরজাহানে বাঁক নিচ্ছিল যেন নিয়তির মতই। সেই ঝোঁক সামলাতে মোহিত দত্ত ফের দৌলতপুরে যেতে চাইল, তা অর্জুনদা বি. এ-তে আপনাদের সেক্সপীয়র কী ছিল ?

টেমপেস্ট মোহিত। সেসব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে দেখি কলেজের পেছনে ভৈরব নদী। আর কলেজের সামনে স্টেশনে ওঠার মুখে জংলা একটা রাস্তা গাছপালার গভীরে চলে গেছে। যেন ওই বনেই কোথাও টেমপেস্টের শকুন্তলার লীলাভূমি ছিল।

এই বিশ্বভারতীর ঘাসে, মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোন-দিন ঘরে বাইরের বিমলার কথা মনে মনে সাজিয়েছেন।

মোহিতের এ কথার পর তিনজনই চুপ করে গেল। হেনা ভাবছিল—রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে এসে উঠলেন—তখন তো এত ঘরবাড়ি, গাছগাছালি, রাস্তাঘাট ইলেকট্রিক—কিছুই ছিল না।

অর্জুনকিশোর রায় মনে মনে বললো, আদি কবি বাল্মীকি চব্বিশ হাজার শ্লোকে রামায়ণ লেখার সময় এই ভারতবর্ষের ঠিক কোন্ জায়গাটাকে তাঁর লেখার লীলাভূমি করেছিলেন ?

দু'ধারের কোয়ার্টারের মাঝের সরু রাস্তা দিয়ে আশিসবাবুর এস্রাজ ভেসে আসছিল। মনে হবে অন্ধকার মাখানো গাছগুলোর খোসা খসে গিয়ে এইসব সুর ঝরে পড়ছে। তার ভেতরই মোহিত দত্ত জানতে চাইল, অরুণ বড় হলে কোথাও তো পড়তে যেতে পারে। ধরুন দিল্লির জে. এন. ইউ তে পড়তে গেল—

হেনা দত্ত বললো, তখন অর্জুনদা দিল্লিতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু ইউনি-

ভার্সিটির কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবেন! সে বাড়ি থেকে যুবক অরুণকিশোর সাইকেলে চড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে—

তা আমার আর দেখা হবে না হেনা—

কেন?

অতদিন আমি থাকবো না। অরুণ আমার বুড়ো বয়সের খোকা। তাই হয়তো বাড়াবাড়ি করে ফেলি—

না না। মোটেই না অর্জুনদা। আচ্ছা অরুণের জন্যে আপনি কোথায় কোথায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকেছেন?

অরুণ নয়। বল—আমার জন্যে নিয়েছি। একদম গোড়ায় দমদম চিড়িয়া মোড়ে। একটা বাড়িই কিনে ফেলি। তেল কোম্পানীতে দশ বছর আগে রিটায়ার নিয়ে মোটা কমপেনসেশন পেয়েছিলাম হাতে টাকা ছিল। সস্তায় পেয়ে গেলাম। ওর ইস্কুলের পাশেই বাড়িটা কিনে নিয়ে থাকতে লাগলাম। ও তখন ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছিল।

তারপর?

পণ্ডিচেরিতে মাদারের ওখানে ভর্তি হল। বাড়ি ভাড়া নিলাম ওখানে।

এখন নিয়েছেন এখানে—

হুঁ। ওকে হোস্টেলে দিয়ে আমাদের দু'জনের ভাল লাগছিল না কলকাতায়।

আবার একটা ট্রেনের গুম গুম শব্দ। এবার ট্রেনটা প্রান্তিক থেকে সুড়ঙ্গ বেয়ে বোলপুরের দিককার উঁচুতে উঠে আসছিল।

ক'দিন পরে মেলার মাঠে কলকাতার দল বিষবৃক্ষ অভিনয় করছে। সন্ধ্যে হবে হবে। অরুণকিশোর মাথা উঁচু করেও স্টেজের কিছু দেখতে পেল না। সব জায়গাতেই তার চেয়ে লম্বা লোকজন দাঁড়িয়ে। কিছুই দেখতে না পেয়ে অরুণ ঘরকন্নার টুকিটাকি সাজিয়ে বসা কাঠের জিনিসের এলাকাটা পেরিয়ে একদম ইলেকট্রিক নাগরদোলার সামনে এসে পড়লো।

বাবা সকালের ট্রেনে কলকাতায় গেছে। এখানে তাকে মানা করার কেউ নেই। নাগরদোলার নিচের লোক পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। ওপরের লোক নিচে। এক আধুলিতে বত্রিশ পাক। চাকা থামতেই অরুণ উঠে বসলো।

ঢাউস ফ্লাডলাইটের আলোয় নাগরদোলার লোহার কাঠি পেল্লাই সাই-কেলের স্পোক হ'য়ে মেলার মাঠে অনবরত ছায়া ফেলছিল। ওপরে উঠে অরুণের চোখে নিচের মাটিতে জ্বালিয়ে রাখা এমারজেন্সি হ্যাজাকও চোখে পড়ল। কেন যে বাবা নাগরদোলাকে এত ভয় পায়।

দূরে নিচে কত লোকের যে কালো কালো মাথা। নিচে নেমে হুস করে আবার ওপরে ওঠার মুখে নিচে নামতি চাকার সঙ্গে লাগানো দোলায় চোখ আটকে গেল অরুণের।

সেই পুচকে মেয়ে দু'টো। মাধুরী আর পুষি। ঘুরন্ত চাকায় লাগানো দোলায় বসে ওরা হাসতে হাসতে ফেটে পড়ছে। আর ওদের মুখোমুখি এক-জন ভিখিরি মত বুড়ো বসে। শাদা দাড়িতে গাল ভুল ভুল করছে। বুড়োও হাসছে।

অরুণের দোলায় সে একা। অরুণের মুখে বেরিয়ে এল, সাহস তো খুব! একদম এচোড়ে পাকা—

চাকাটা আর এক চক্কর দিতেই অরুণ দেখলো, ওদের দোলায় বুড়ো লোকটার শাদা দাড়ি আলো পেয়ে চিকচিক করে উঠছে। সেই সঙ্গে খোলা হাসিতে বুড়োর শাদা শাদা দাঁতও ঝমমক করে উঠলো। বেশিক্ষণ দেখা যায় না। চাকা ঘুরে দোলা নিচে নামার মুখেই শুধু দেখা যায়।

একটা চক্করের সময় বুড়ো যেন ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচিয়ে ডাকলো, পারিজাত —পারিজাত—ও পারিজাত—

ওপরে উঠতে উঠতে অরুণকিশোর বলল, পারিজাত আবার কার নাম রে বাবা—ওখানে তো শুধু পুষি আর মাধুরী।

চাকা থামিয়ে এক এক ঝাঁক লোক নামাচ্ছিল নাগরদোলার ব্যাপারী। পুষি আর মাধুরীর পেছন পেছন বুড়ো লোকটাও নামলো।

ওদের ধরবে বলে অরুণও সাত তাড়াতাড়ি নামলো। পুষিরা ভিড়ে মিশে যাচ্ছিল। অরুণ ছুটে এল। খুব জরুরী গলায় ভিড়ের ভেতর পেছন থেকে বলল, শীগগিরি বল—তোমাদের ভেতর পারিজাত কে?

মাধুরী আর পুষি একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। সামনের বুড়ো লোকটা তক্ষুনি ভিড়ে হারিয়ে গেল। পুষি বলল, কেন?

এইমাত্র মাইকে ওই নামটা অ্যানাউন্স করছিল। কে যেন হারিয়ে গেছে শীগগিরি বল। পুলিশ খুঁজছে—

মাধুরী আর পুষির চোখ এক সঙ্গে ছোট হয়ে এল। পুষিই বলল, আমার

ভাল নাম পারিজাত। কেন? কি হয়েছে?

হো হো করে হেসে উঠলো অরুণকিশোর। কেমন বোকা বানিয়ে জেনে নিলাম—

মাধুরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। তাই বল।

পুষি ভ্রূ কুঁচকে বলল, অসভ্য।

অরুণ গায়ে না মেখে জানতে চাইলো, ওই বুড়োটা কে তোমাদের সঙ্গে ছিল?

মুখ সামলে কথা বল। উনি আমার দাদামশাই—

বাঃ! না জানলে যে কেউ-ই তো ওঁকে বুড়ো বলবে।

মাধুরী বলল, তা কিন্তু সত্যি পুষিদি—

অরুণ বলল, তুমি বুঝি পুষির নিচে পড়ো?

হুঁ।

পুষি ধমকে উঠলো, তুই চুপ কর মাধুরী।—বলেই অরুণের মুখে তাকিয়ে পুষি সোজা ধমকে বললো, হু! তারপর মাধুরীর হাত ধরে টানতে টানতে ভিড়ে মিশে গেল। যে দিকটায় ওর দাদামশায় গেছে—সেই দিকে।

গাঁ থেকে আসা মানুষজনও মেলা ভরিয়ে ফেলেছে। তাদেরই কেউ অরুণের পা মাড়িয়ে দিতেই সে লাফিয়ে উঠলো। এতটুকু একটা মেয়ে এমন ধমকে চলে গেল? সে কিছু করতে পারলো না। কোনদিকে গেল?

খানিক খুঁজে অরুণকিশোর নিজের ওপরেই রেগে গেল। তার তো কিছু করার নেই। পুষি তো পণ্ডিচেরির সেই বিজয়া আম্বানি নয় যে কমপ্লেন করবে। মেলার ভেতর তাকে 'হু' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে—একথা তো পাঠভবনে বলা যায় না।

চারদিকে এতলোকের এত আনন্দ, ফুর্তি, কেনাকাটা, যাত্রার ক্ল্যারিওনেটের মাঠ ভাসানো সুর, ছোট তাঁবুর ছোট সার্কাসের অবিরাম মাইক ঘোষণা, নাগরদোলার ঘূর্ণি—সব—সব তেতো লাগতে লাগলো অরুণের। ওইটুকু পুচকে একটা মেয়ের অত বড় নাম—পারিজাত!

অরুণ বোটকা গন্ধ ছড়ানো একটা সার্কাসে ঢুকে পড়লো টিকিট কেটে। ছোট্ট তাঁবুতে দেড় দু'শো লোক বসে! বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে সিগারেটও পাল্লা দিচ্ছিল। খেলা শুরু হয়ে গেছে। তিনজন জোকার বালতি বালতি জল খেয়ে ফেলছে।

ঠিক এই সময় অরুণ আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। খেলা জমে গেছে।

চড়া আলোর নিচে তখন যা শুরু হল—দুনিয়ার কোন সার্কাসে তা হয় না।

অন্ধকারে চেয়ারে বসে থাকা দর্শকদের ভেতর থেকে একগাল শাদা দাড়ি সমেত পুষির দাদু সোজা জোকারদের কাছে চলে গেল। টেবিলে রাখা ছিল গ্লাস। সেটা তুলে নিয়ে জগ থেকে জল ঢাললো। তারপর ঢক ঢক করে জল খেয়ে গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রাখলো।

জোকারদের খেলা থেমে গিয়েছিল। দর্শকরা তো ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। পুষির দাদু গট গট করে তার চেয়ারে ফিরে আসছিল। পাবলিক হো হো করে হেসে উঠল।

অরুণও হেসে উঠে দেখলো, রিং-এর কাছাকাছি বসা লোকটা ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সেণ্টুদা। সেণ্টুদা চেঁচিয়ে বলছে—আরে! এ যে আমাদের দ্বিজেনবাবুর শ্বশুর!

এরপর জোকাররা আর জমাতে পারলো না। বাঘ এসে গেল। ভীষণ রোগা বাঘ। এসেই দাঁত কিড়িমিড়ি। অরুণের মনে হল—নিশ্চয় ক্রিমি আছে বাঘটার। তাড়াতাড়িতে সাজানো লোহার শিকের আড়ালে বাঘটা যেই হাই তুললো—অমনি বোঝা গেল—সারা সার্কাসটার গায়ে কেন এত বোটকা গন্ধ।

তালতোড়ের দিঘির চারদিকে ধোপাদের ভাটিখানা। তারই পরে তার-কাঁটায় ঘেরা জঙ্গল। ফরেস্ট বাংলো, অফিস।

তালতোড়ের দিঘির কানাৎ ঘেঁষে জঙ্গলের বর্ডারে রেনট্রি আর ক্যাসিয়া গাছ। মোটা গুঁড়ি। ডালপালায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া ছড়ানো। সেইসঙ্গে ক্যাসিয়ার গুড়ি গুড়ি হলুদ ফুল দিঘির গায়ের সবুজ ঘাসের ডগায় পড়ে পড়ে বিঁধে আছে।

রাস্তা দিয়ে সায়ান্স বিল্ডিংয়ে যেতে ডানদিকে তাকালেই এখন চোখে পড়বে—বনের বেড়া ঘেঁষে একটি ছেলে আর মেয়ে বসে আছে। এখন ফাল্গুনের দুপুর। রোদে তাত—কিন্তু আরাম।

মেয়েটি জানতে চাইল, এখন তোমার মা কেমন আছেন?

ছেলেটি একটা ছোট্ট ঢিল ঝিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বাবা নিয়ে এসেছেন হাসপাতাল থেকে। মা বেশির ভাগ সময় চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। বিদ্যুৎ চমকালে, গাড়ির ব্রেকের শব্দ, টি ভি-তে ডেথ সিন—এসব দেখলে বা

শুনলে মাথার ঠিক থাকে না রিনি। এ বয়সে মাথা একবার খারাপ হলে আর সারে না।

তোমার বাবা কিছু করছেন না! তাই বলে হাতগুটিয়ে বসে থাকবেন?

করছেন বই কি!

রিনি সুদীপের মুখে তাকাল। সুদীপ তালতোড়ের দীঘির জলে তাকিয়ে।

সুদীপ বলল, বাবা তো গুচ্ছের রোজা আর ওঝা ধরে ধরে আনছেন। তাদের পেছনেই বাবার মাইনের টাকা উবে যাচ্ছে রিনি। ছোটভাইটা—যাক্ গিয়ে রিনি। এসব কথা বলে তোমার মন খারাপ করে দিয়ে লাভ নেই। তুমি এখনো ছোট।

বারে! আমি এখন শাড়ি পরি।

এটা কার শাড়ি?

এটা পুষির। পুষি এইটে উঠলো। স্কুলে তো এ শাড়ি পরতে দেবে না। বাড়িতে পরে। বললো—দিদি তুই পরে যা—তুই এখন হায়ার সেকেণ্ডারির মেয়ে। আর ক'দিন পরেই তো বি-এ ফার্স্ট ইয়ার হবে আমার—অবিশ্যি পাশ করতে পারলে। আমি আর ছোট নেই—বুঝলে!

তোমায় নিয়ে ঘুরছি তোমার মা জানলে কি বলবে?

তোমায় আসতে বারণ করবে।

কি একটা পাখি ঝুপ করে আকাশ থেকে জলে পড়েই ডুবে গেল। নির্জন দুপুর। গাছগাছালির পাতায় বাতাস। রিনি চেঁচিয়ে বলল, পানকৌড়ি। ওই ছাখো ভেসে উঠেই উড়ে গেল। ওই যাঃ—

আমার ছোট ভাইটা গুণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রিনি খচ করে সুদীপের মুখে তাকালো।

আই. আই. টি-তে আমাকে এখনো দেড় বছর থাকতে হবে। বাবা নাকি চাকরি ছেড়ে দেবেন—

তাহলে পড়বে কি করে?

পড়াটা শেষ করা যাবে। স্কলারশিপ আছে। কিন্তু বাড়ি চলবে কি করে? বাবা বাড়ি বসেই এখন মদ খান। আমায় বলছেন—তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর। চাকরিতে বসে আমাদের খরচ চালাও। এতদিন তোমায় বসিয়ে খাইয়েছি। এখন আমাদের বসিয়ে খাওয়াবার দায়িত্ব তোমার—। ভাবতে ভাবতে পড়াশুনো আমার মাথায় উঠেছে রিনি।

রিনি সুদীপকে দেখছিল। তার মায়ের কেমন লতাপাতায় ভাই হয় সুদীপ।

বছর দুই আগে খড়্গাপুর আই। আই. টি. থেকে দল বেঁধে ওরা বেড়াতে এসেছিল এখানে। তখন সুদীপ এসে ওদের বাড়ি ছিল দিন দুই। তারপর আরও দুই একবার এসেছে। এখন চিঠি লেখে—কিংবা হুট করে এসে পড়ে। এসে বলে --শান্তিদি চলে এলাম।

বেশ করেছো। বোসো।

সুদীপের মাথার চুল এই দু' বছরে কিছুটা কমে গেছে। খড়্গাপুরের টিউ-বয়েলের জলে বড় আয়রণ। চিবুকের কাছটায় সুদীপের মুখের সবটুকু ছেলে-মানুষী লেগে থাকে যেন।

স্তাখো সু।

সুদীপ বড় বড় চোখে ফিরে তাকালো, আমি বোধহয় কোনদিনই তোমায় পাবো না রিনি—

অবাক হয়ে তাকালো রিনি। তাকে পাবার জন্যে একজন পুরুষ এতটা কাতর হয়ে ভাবে? একথা মনের ভেতর খেলে যেতেই একজন মেয়ে হিসেবে রিনির মনটা ভাল হয়ে উঠলো। একথা বলছো কেন?

আমাদের বাড়ির কথা তো তোমায় বললাম। আমার দিকে তাকিয়েও মা আমায় চিনতে পারেন না।

রিনি মাথা নামালো। দিঘির জলে জঙ্গলের গাছগুলো মাথা নিচে—শুঁড়ি ওপরে তুলে ছায়া মেলেছে। কারা যেন কথা বলতে বলতে আসছে। দু'জনেই একসঙ্গে ঘাড ঘুরিয়ে দেখলো। রিনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—আরে। এ তো মিহিরদা—মিহির খাস্তগীর—

কাকে দাদা বলছো রিনি—তোমার বাবার চেয়েও অনেক বড় হবেন—

রিনি বিড়বিড় করে বলল, পঁচিশ বছরের বড।

দু'পাশের ঘন সবুজ গাছপালা, বাঁশের কঞ্চি ভেঙে এগিয়ে আসছিল মিহির খাস্তগীর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে লাগল, আমার স্বপ্নগুলোও রঙীন—

বেড়ার ওপাশেই লম্বা মত তাগড়াই মানুষটা। মাথা ভর্তি শাদা চুল। কেডস্‌সুদ্ধ ডান পা বেড়ার তারকাঁটায়। গায়ে ফতুয়া—নিচে খাকির প্যাণ্ট।

লোকটা কে রিনি?

রিনি চাপা গলায় বলল, নাম শোনোনি? আর্টিস্ট। অবনীন্দ্রনাথের গোড়ার দিককার স্টুডেণ্ট। সবাই যা বলে—শুনে—তাই আমি বলছি। রবীন্দ্রনাথের বোধহয় ফার্স্ট ব্যাচের ছাত্র।

খাস্তগীরের পাশেই অরুণ দাঁড়িয়েছিল। তাকে বোঝাচ্ছিল মিহির। কোন স্বপ্ন লাল টকটকে। কোন স্বপ্ন সবুজ। একদিন স্বপ্নে দেখলাম—আমার মাথার পাশের খোলা জানলার নিচেই ধানক্ষেতে পাকা ধান রঙ করতে নেমে এল শেষরাতের গোল হলুদ চাঁদ। এই অ্যাও বড়। ধানক্ষেতের ওপারেই দাঁড়িয়ে আমার মা, বাবা, বড় পিসিমা। ছাই রংয়ের সবাই। ওঁদের মাথার ওপরেই বিশাল একখানা হলুদ থালা।

ওঁরা এখন কোথায়?

কবে মরে ভূত! জানো অরুণ—একবার কোনারকে গিয়ে পথ হারাই—সমুদ্রের সামনে। ঠিক সন্ধ্যেবেলায়। তখন বালিতে ঝাউবন ছিল। রাতে বৃষ্টি আসে। আমি বনের ভেতর সারারাত রাস্তা খুঁজে খুঁজে অন্ধকারে ভীষণ কেঁপেছিলাম। এখনো চোখ বুজলে সেই ভয়—কাঁপুনি টের পাই। এই স্মৃতি থেকেই আমি আঁকি। এক একদিন ঘুমোলে শুধু হলুদ রঙের স্বপ্ন আসতে থাকে। যেদিন বাবা-মা স্বপ্নে এলেন—ওঁদের চোখে তাকালাম। বড় গম্ভীর সে চোখ।

অরুণকিশোর রায় মিহির খাস্তগীরের চোখে তাকিয়েছিল। ঘুমোলে এই চোখই বুজে যাওয়ার পর রঙীন সব স্বপ্ন দেখতে পায়। অরুণের মনে হল—মিহিরদার চোখও গম্ভীর। সব সময় কিসে যেন ডুবে আছে। খোলামেলা হাওয়ায় চারদিকের গাছপালা গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। যেন আজ এখানে কোন উৎসব হবে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে মিহির খাস্তগীর বলল, তুমি বিজেন ঘোষের মেয়ে না?

হ্যাঁ মিহিরদা। আমায় ভুলে গেলেন? আমি রিনি—

সুদীপের দিকে তাকিয়ে মিহির গম্ভীর গলায় বলল, তোমার বাবাও আমায় মিহিরদা বলেই ডাকে। কথাও শেষ হল—আর অমনি মিহির খাস্তগীর অরুণ কিশোরকে পাশে নিয়ে যেমন হাঁটছিল—তেমনই হাঁটতে শুরু করে দিল সামনের দিকে।

সুদীপ এখন দেখতে পেল—লম্বা, পুরনো মানুষটার হাতে প্রজাপতি ধরার ফাঁদ। হয়তো আসলে প্রজাপতির পাখার রং ধরে বেড়ায় জঙ্গলে।

অরুণকিশোর সামনে এগোচ্ছিল আর ফিরে ফিরে এদের দেখছিল। এরকম দেখতে দেখতেই সে একবার মনে মনে বলল, ওঃ! তুমি! পারিজাতের দিদি। পুষি যদি পারিজাত হয়—তাহলে রিনি থেকে কি হবে?

বোলপুর বাজারে কাসা পেতলের দোকান থেকে বিশ্বভারতীর ভি সি'র অফিসের লাগোয়া বারান্দা—সবই এই ছ' সাত বছরের যাতায়াতে পুরনো করে তুলেছে অর্জুনকিশোর। শ্রাবণ মাসের বিকেলবেলা। বৃষ্টি আসছিল —চলে যাচ্ছিল। কম্পাউণ্ডের ভেতরেই শিউলিগাছ থেকে কয়েকটা পরিষ্কার পাতা ছিঁড়ে আঁচলে বাঁধলো বিমলা।

বারান্দায় বসে সকালের কাগজ পড়তে পড়তে অর্জুন বললো, আঁচলে বাঁধলে যে? কি করবে?

কাল সকালে রস করে লোহা দাগ দিয়ে খাওয়াবো তোমায়। এই বয়সে ঘুসঘুসে জ্বরটা বাঁধালে কোত্থেকে?

খুব চিন্তা করলে আমার জ্বর আসে বিমলা।

এত কিসের চিন্তা বলতো তোমার? আমি, বাবলু আর তুমি—এই তো মোটে তিনটি প্রাণী আমরা।

আগে ভাগে রিটায়ার করলাম। যদি বেশি বাঁচি—তো টাকা ফুরিয়ে যাবে অনেক আগে। আবার এখন যদি চলে চাই—অরুণ সবে বড় হচ্ছে—তোমার বয়সটা কম।

এতসব ভাবো কেন?

বাড়িটা করলাম—বেচেও দিলাম।

সে তো তোমার খেয়াল। বাড়ি বচে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে থাকবে সে ছেলে তো ফের হোস্টেলে চলে গেল। আর তুমি—এ ইস্কুল—সে ইস্কুলের কাছাকাছি বাড়িভাডা নিয়ে বাসা বদল করে বেডাচ্ছো!

কোন জবাব দিল না অর্জুনকিশোর। সে গোপনে বিমলার মুখখানা দেখছিল। আবার একঝাঁক বৃষ্টি এসে গেল। শিউলি গাছটা ভিজে ভিজে পরিষ্কার হয়ে গেল। পৃথিবীর কোন কাজ থেমে নেই। তোমার তো আরও কম বয়সী স্বামী হতে পারতো বিমলা—

হয়নি যখন আপসোস করে কি লাভ বল।—রসিকতার টানটা গলা থেকে মুছে ফেলে ধমকে উঠলো বিমলা, সারাদিন ঘরে বসে থাকবে—আর আজে-বাজে কথা বলবে। যাওনা মোহিতবাবুর বাড়ি ঘুরে এসো। হেনাদি চা করে খাওয়াবেন এখন।

কোথায় আর যাবো বিমলা। সব জায়গা গিয়ে গিয়ে পুরনো লাগে এখন।

এ জীবন তো তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো। তখন পই পই করে বারণ

করেছিলাম—এ বয়সে রিটায়ার কোরো না। এটা রিটায়ারের বয়স নয়। না—একসঙ্গে অনেক টাকা দেবে। অনেক তো চাকরি করলাম!

চাকরিতে থাকলে এখন আমি এরিয়া ম্যানেজার হতাম। পরে তো কোম্পানীর আবার এক্সপ্যানসন হল।

তুমিও কিছু খারাপ নেই। দিব্যি বড় বাড়ি নিয়ে আছো। সস্তার ভাড়া। ব্যাংকের সুদ পাচ্ছো।

সুদ নাকি কমিয়ে দেবে সামনের বছর।

তা কখনো হয়?

অর্জুন বিমলার মুখে বিশ্বাসের ছায়া দেখে অবাক হল। কিছুই জানে না। অথচ কেমন অবলীলায় বলে দেয় বিমলা। জানেই না—অর্থমন্ত্রী এরকম একটা আভাষ দিয়েছে খবরের কাগজে।

অর্জুনকিশোর বলল, অনেকদিন কোথাও যাই না। এবার সবাই মিলে কলকাতায় ভুজঙ্গদের বাড়ির পূজো দেখতে যাবো। অনেক করে বলছে। মাধুরীর বাবা এখন এখানে হোস্টেলেও সাপ্লাই করে!

পুজোর এখনো অনেক দেরি। আগে তো আসুক।

একথায় খুব একটা পুরনো কথা একদম সাধারণভাবে মনে এল অর্জুন-কিশোরের। ফি বছরই তো একটা সময়ে পুজো আসে। যেমন বছরের পর বছর চলে আসছে। যত দিন যায়—ছোটবেলাটাই দূরে সরে যায় কেবল—আবছা লাগে। পুজো আসবার সময়—ঐ আসে—ঐ আসে। যাবার সময়—সেই বিষাদ।

আচ্ছা? তুমি কি মানুষ বলতো! ওইটুকু চেয়ারটায় বসে আছো কি করে?

কেন?

ওটাতো বাবলুর ইজিচেয়ার। ওতে তুমি নিজেকে ধরালে কি করে!

বাবলুও তো বড় হচ্ছে। একদিন ওর চেয়ারে আমি ঠিক ধরে যাবো। দেখো—

বিমলা উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এসেছিল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ। বাবলুও বড় হয়ে উঠছে। কথাটা এত সত্যি যে টের পাওয়া যায়। কিন্তু বলা যায় না। মা হ'য়ে বিমলার ডান চোখ নাচে। ওকথা ভাবলে পাছে ছেলের কোন অমঙ্গল হয়।

বৃষ্টির ঝাঁকটা সব ফোঁটা নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে উবে যেতে লাগলো।

বিকেলের ট্রেনটা দু'পাশের উঁচু ডাঙ্গা জমির ভেতর সুড়ঙ্গ জ্ঞানে ঢুকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের হাঁসফাঁস, বয়লার আর পিস্টনের ঘট্টা ঘটাং শাল জঙ্গল, ছড়ানো প্রান্তরের ভেতরকার কাঁদড়ে গড়িয়ে পড়ছে। ওসব জায়গা খানিকবাদে অন্ধকারে মিশে যাবে।

অর্জুনকিশোর রায়ের স্থির বিশ্বাস ওরকমই কোন জায়গায় তার নিজের ছোটবেলা, কাঁখে করে বয়ে আনা জলভর্তি মায়ের ঘড়া পড়ে আছে। কোনদিনই আর তুলে আনা হবে না।

গাছতলায় মোট পাঁচ ছ'খানা ছবি শুকোতে দিয়েছিল রামকিঙ্কর। কোনো টায় ইটের টুকরো—কোনটায় মাটির ঢেলা চাপা দেওয়া। পাছে উড়ে যায়। কার্তিক মাসের ভরদুপুর। গা জলে যায়। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই শীত শীত ভাব চলে আসে বাতাসে। রামকিঙ্করের মাথায় টোকা। গায়ে ফতুয়া—পাজামা। ঘাস এখানে বড় বড়।

এক একখানা ছবি শেষ হচ্ছে আর রামকিঙ্কর চেঁচিয়ে উঠছে। ও বাবুল এত ঢিল পাবে কোথায়?

আপনি আঁকুন না। আমি ঠিক জোগাড় করবো।

ছবি আঁকতে আঁকতে থেমে গেল রামকিঙ্কর। এদিকটায় ঢিলের বড় অভাব। ঢিল কম পড়লে আঁকতে ইচ্ছে করে না। কলা ভবনের সামনে কেন যে রোজ ঝাট দেয় বাবলু।

বাঃ। পরিষ্কার রাখবে না? কি বলছেন আপনি!

ওই করেই তো পরিবেশের—গাছপালার—রাস্তাঘাটের স্বাভাবিক প্রসাধন আমরা ভণ্ডুল করে ফেলি।

বাবলু তখনো তাকিয়ে আছে দেখে রামকিঙ্কর তুলি মুছে ফেললো। তারপর বলল, এই পৃথিবীরও একখানা মুখ আছে। সে মুখের নিজেরই একখানা ছবি আছে। সেই ছবির সঙ্গে ব্যালান্স করেই তবে বাকি ছবি আঁকা উচিত।

বাবলু কিছুই বুঝতে পারল না। সে বলল, আপনি ভাববেন না—আমি যত ঢিল পারি কুড়িয়ে আনছি—

রামকিঙ্কর তুলি থামিয়ে এই কিশোরের পরিশ্রমের দিকে তাকিয়ে থাকল। শিশু থেকে বালক—বালক থেকে কিশোর হাওয়ার পথে পৃথিবীকে আবিষ্কারের জন্যে মাংসপেশী শরীরকে কীভাবে শক্তি যোগায়—ছুটন্ত বাবলুর ভেতর তাই

দেখছিল রামকিঙ্কর। যেন কোন দ্বীপ থেকে এইমাত্র শেষ জাহাজ ছেড়ে যাবে—

তাই বাবলু তাড়াহুড়ো করে ঢিল কুড়োচ্ছে—কুড়িয়েই ছেড়ে যাওয়া জাহাজে লাফিয়ে গিয়ে উঠবে।

হয়েছে। আর ছুটতে হবে না তোমায়। এবার বোসো। আজ স্কুলে যাও নি ?

ছবিতে তুলি লাগাতে লাগাতে রামকিঙ্কর কথা বলছিল। বাবলু—ওরফে অরুণকিশোর কোন জবাব না দিয়ে আলতো করে বলল, স্কুলে বেশি গেলে আপনি এসব বেশি পারবেন ?

হয়তো আরও বেশি পারতুম। তুমি স্কুলে যাওনি কেন ?

বুঝতে পারিনি—সেণ্ট্াল কিচেনের বারান্দায় ঢিল মেরেছিলাম—

ওঃ! তাই তুমি এত তাড়াতাড়ি ঢিল জোগাড় করতে পারো!

শুনুন না—আমার কোন দোষ নেই—বুঝতেও পারিনি—বারান্দার মৌচাকে ঢিল মেরেছিলাম।

তুমিই চাক ভেঙেছো। আমিও কাল মৌমাছির জ্বালায় এখানটায় তিষ্ঠোতে পারিনি। নাও—এই ছবিখানা তোমার। নাও।

ছবিখানা হাতে তুলে নিল অরুণকিশোর।

তোমার হবে।

কি হবে ?

দেখে নিও। তোমারই ঠিক হবে—বলতে বলতে রামকিঙ্কর ছবির ওপর বড় বড টানে তুলি টানতে লাগলো।

শীতের সন্ধ্যেয় সামনের ঘরে আড্ডা হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই হাঁক দিচ্ছিল দ্বিজেন ঘোষ। ও শক্তি—শক্তি। কিংবা শান্তি—একটু চিনি দিও—

রান্নাঘর থেকে শান্তি বলল, আমি দিয়ে আসবো বৌদি ?

শক্তি সেলাইকল থামিয়ে বলল, না। থাক্। তুমি ডালটা গরম করে খাবার টেবিলে রেখে যাও। আমি চিনি দিয়ে আসছি। রান্নাঘর থেকে চিনির কৌটোটা দাও—

রিনি এগিয়ে এসে বলল, আমি দিয়ে আসবো মা ?

না থাক। তুমি তোমার দাদার শার্টের হাতা দু'টো একটু জুড়ে রাখো

তো। কলকাতায় হোস্টেলে যাবার আগে জামা কাপড়গুলো ঠিক করে তো রাখতে হবে দেখো—ছ' নম্বর সুতো পরানো আছে ববিনে।

আমি দেবো মা?

পুষিকে রীতিমত ধমকে উঠলো শক্তি। আমার শাড়ি পরেছিস কেন? ওমা! একি আক্কেল মেয়ের—বলতে বলতে শক্তি বসার ঘরে এক চামচ চিনি হাতে ঢুকলো।

পুষির মুখ দিয়েও প্রায় বেরিয়ে এসেছিল—কী বোকা! ওভাবে কি ঘরে ঢুকতে আছে।

পুষিরও মনে হচ্ছিল—এভাবে স্রেফ এক চামচ চিনি নিয়ে ঘরে ঢোকার ভেতর কোথায় একটা বোকামো কচকচ করে ওঠে।

দ্বিজেন ঘোষ ক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠলো, একি? তুমি? শান্তি কোথায়?

শান্তি রান্না করছে।—বলতে বলতে শক্তি কেমিস্ট্রির পরাশর বাবুর চায়ে চিনি গুলে দিচ্ছিল।

প্রায় ধমকে উঠলো দ্বিজেন ঘোষ। কার চিনি কাকে গুলে দিলে?

থতমত খেয়ে শক্তির হাতের চামচ থর থর করে কেঁপে পড়ে গেল। আর অমনি পোষা কুকুরটা একদম দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো! একেবারে কচি অ্যালশেসিয়ান। কেউ কাউকে বকলে ও ঠিক ছুটে এসে আপত্তি জানাবে।

ইংরিজির হেমন্ত সরকার রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তাতে কি হয়েছে ডক্টর ঘোষ। বউদি না হয় আরও এক চামচ চিনি আনবেন আমার জন্যে।

দ্বিজেন ঘোষ কি বলল বোঝা গেল না। তাঁরই সামনে তারই পোষা কুকুর একা চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাৎ করে দিল।

শক্তি লজ্জা পেয়ে বলল, ভুল হয়ে গেছে প্রফেসর সরকার। আমি এনে দিচ্ছি আরেক চামচ। পরাশরবাবু বসুন। মেয়েদের দিয়ে আরেক পট চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।—বলেই প্রায় পালিয়ে আসছিল শক্তি।

দ্বিজেন ঘোষ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। থাক্। তার আর দরকার হবে না।

ওদের বাবার চেয়ার সরানোর আওয়াজে বারান্দায় দাঁড়ানো রিনি আর পুষি কেঁপে উঠলো! পুষি বলল, অন্যদের বাবা তো এমন নয় দিদি—

ততক্ষণে দ্বিজেন ঘোষ চেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রিনি আকারে ইঙ্গিতে অ্যালসেসিয়ানকে সরিয়ে আনতে পারলো না। সাত আট মাস বয়সের

কুকুর। এখনো বছর দেড়েক ধরে বড়ই হতে থাকার কথা।

রিনিও কেঁপে উঠলো। শুধু বুঝতে পারেনি কুকুরটা কিছু। আধো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ কুঁজো হয়ে চেনে বাঁধলো দ্বিজেন ঘোষ। তারপর জানলার পাশে রাখা লাঠিখানা দিয়ে বেদম জোরে কুকুরটার কোমরে এক ঘা বসালো।

শীতের সারা অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো। আর অমনি এক ঘা—আরও জোরে—লেজের দিকে কষালো দ্বিজেন ঘোষ।

ওরই ভেতর শক্তি আরেক চামচ চিনি এনে প্রফেসর সরকারের চায়ে গুলে দিচ্ছিল।

হেমন্ত সরকার কুকুরের চীৎকারে ধচাং করে উঠে দাঁড়ালো, করছেন কি ডক্টর ঘোষ।

শক্তি আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে আধোবোজা গলায় বলল, মারতে দিন। ওঁকে মারতে দিন। তাহলে শান্ত হবে—

পরাশরবাবু ভ্যাবাচেকা খেয়ে সব গুলিয়ে ফেলল। কে শান্ত হবে বউদি? ওকে মারলে ও আরও চেঁচাবে। আরও মারতে থাকলে ডক্টর ঘোষেরই উত্তেজনা বাড়বে। এমনিতেই তো প্রেসার হাই ওঁর—

এসব কথা শোনার জন্যে শক্তি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। সেলাই কলটা খোলা। নিজেরই পেটের মেয়ে দু'টো ভয়ে কাঁটা হয়ে বারান্দার কোনে ঝোলানো বারোয়ারি তোয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে—যেন জড়াজড়ি করে দু'বোন মিলে একটা মেয়ে হয়ে গেছে।

আরও এক ঘা খেয়ে কুকুরটা তেড়ে গিয়ে দ্বিজেন ঘোষকেই কামড়াতে গেল। অমনি পরাশর আর হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে দ্বিজেনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল।—যান। চোখে মুখে জল দিয়ে আসুন। করছেন কি ডক্টর ঘোষ?

দ্বিজেন ঘোষ তার দুই মেয়ের পাশ দিয়ে বারান্দার কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। শক্তি মাথা নিচু করে জলভর্তি মগ এগিয়ে দিল।

কোন কথা না বলে দ্বিজেন ঘোষ সেই জলে চোখ মুখ ধুয়ে খানিকটা ঘাড়ে গলায় ছেটালো। তারপর ধুতির কোচায় মুখ চোখ মুছে, চাপা গলায় বলল, কতদিন বলেছি—নিজে চা চিনি দিতে যাবে না। শান্তি তো রয়েছে—আমি একজন ইউ. জি সি প্রফেসর—আমি কি একজন কাজের লোক রাখতে পারিনে?

শান্তি রান্না করছিল—

শক্তির একথার পিঠে পিঠে শান্তি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই হাসিমুখে বলল, দাদাবাবু—আমিই দিতে যাচ্ছিলুম। বউদিদি বারণ করলেন তাই—

শক্তি ধমকে উঠলো, চুপ কর শান্তি।

সঙ্গে সঙ্গে ভবল ধমক লাগালো দ্বিজেন ঘোষ, তুমি চুপ কর শক্তি।

পুষি আর ঝিনি দেখলো, শান্তিদির চোখে হাসি। মুখে হাসি। ততক্ষণে দ্বিজের ঘোষ আস্তে ধীরে বসার ঘরে চলে যাচ্ছিল।

ঝিনি আধো অন্ধকার বারান্দায় পুষিকে জড়িয়ে ধরল। কান্নায় তার গলা জড়িয়ে গেল। আমি আর পারছি না পুষি। বাবার জন্যে আমার বুকের ভেতর একখানা থান ইট চেপে বসে যাচ্ছে। মায়ের যে কোন মান অপমান নেই—

পুষির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, শান্তিদিটা একদম বাজে—

প্রায় ভূতের মতই ওদের দাদু কাঠকুটো আর কয়লার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল—মানুষটা এতক্ষণ নিশ্চয় ওঘরে মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিল। বাঁ হাতে একফালি গোটানো মাদুর। শত ছেঁড়া।

কাঁদিস কেন দিদিভাই। আমার মেয়েই যদি জেগে না ওঠে তো শান্তির দোষ কি? ও তো স্রেফ কাজের মেয়ে—

অন্ধকারে দুই চোখ পেনসিল করে নিজের দাদামশাইকে খুঁজে নিতে চাইল পুষি। ঝিনি দেখলো, তখনো তার নিজের চোখজোড়া কান্নায়—অন্ধকারে একাকার হয়ে আছে। কুকুরটাই শুধু সবাইকে দেখতে পাচ্ছিল। সে দ্বিজেন ঘোষের শ্বশুরকে দেখেই আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। এই মানুষটা অনেকটা তার নিজের মত। যেখানে সেখানে শোয়। যেখানে সেখানে বসে খায়। বৃষ্টিতে ভেজে। রোদ পোহায়। ধুতির খুঁটও পেছনটায় লেজ হয়ে ঝোলে মানুষটার। এমন কি সাত রাস্তা ঘুরে এসে যখন একা বসে জিরোয় তখন—যেন তারই মত মানুষটা জিভ ঝুলিয়ে হাঁপায়।

বুধবার বুধবার ছুটি থাকে। মঙ্গলবার বিকেলেই অর্জুনকিশোর বাবলুকে বাড়ি নিয়ে আসে। নিয়ে আসা মানে—আগে আগে বাবলু তার দু'চাকায়—আর পেছন পেছন এর ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে অর্জুনকিশোর হাঁটতে থাকে।

রাতে খেতে বসে অরুণ বললো, ছোটোমেসোর বন্ধু ওই ভুজঙ্গবাবুকে বলে দেবে তো মা—হোস্টেলে মাছের টুকরো বড্ড ছোট দিচ্ছেন ভদ্রলোক।

তাই নাকি।

মুস্কিলে পড়তে হয় আমায়। আমি মনিটর। কিচেনে ঠাকুর অবশ্য আমায় বড় টুকরোই দেয়। কিন্তু নিচু ক্লাসের ছেলেদের গলায় কাঁটা ফুটে যাচ্ছে। অত ছোট মাছ কি সাপ্লাই দিতে আছে। কচি কচি ছেলেদের কী কষ্ট বলতো?

গরম ব্যাপার জড়িয়ে খেতে বসা নিজের ছেলেকে ডাগর লাগল বিমলার। হেসে বলল, ঠিকই তো। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, এবার এলে ভুজঙ্গবাবুকে বলতে হবে। তুই তো মাধুরীকে বলে দিতে পারিস।

ছিঃ! এই তোমার বুদ্ধি? বাবার কথা মেয়েকে বলতে আছে।

মেয়েটা বড্ড ভোগে। প্রায়ই কলকাতায় চলে যায়। ও ভাল কথা— তোকে একখানা চিঠি লিখেছিল।

কোথায়?

দেখি তো। তুই খেয়ে নে—

অর্জুনকিশোরের খেতে খেতে অনেক রাত হয়। অনেক পায়চারি করে তবে খেতে বসবে। অনেক দিন রাতে খায়ই না সে। এক একদিন বিমলা বলে— তবে আর শুধু শুধু বাজার করাই বা কেন? রান্না-বানাই বা কেন? এসব পাট তুলে দিলেই হয়।

তবে মঙ্গল বুধবার—এ দু'টো দিন সে রাতে খেতে বসবেই। এদিন দু'টোয় যেন আলাদা কোন আনন্দ আছে। যত রাত বাড়ে—এখানকার গাছপালার ভেতর কোয়ার্টারগুলো শীতের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যায়। শীত মুছে রোদ উঠলে আবার সকালবেলা জেগে ওঠে। ঘরবাড়ি। মানুষজন।

খেতে বসে এই ঘুমন্ত বিশ্বভারতী-বসতি এলাকায় নিজের কাঠামো— কাঠামোর ছায়াটা বড় লাগে অর্জুনকিশোরের। আর লাগে নিষ্কর্মা। নিজের ভাত চিবোনোর আওয়াজও সে খেতে বসে শুনতে পায়।

বাবলু ঘুমিয়ে পড়লো?

না। খেয়েদেয়ে তোমার খাটে গিয়ে শুয়েছে।

জেগে আছে এখনো?

হু। মাধুরীর চিঠি পড়ছে বোধহয়।

মেয়েটা বড্ড ভাল।

হু।

কিন্তু—

কি?—বলেই ডানচোখ নেচে উঠলো বিমলার। বুঝলো—ডানচোখটা

বশে আনতে হবে তাকে।

ভুজঙ্গ চৌধুরী তোমার ভগ্নীপতির ওখানে সাপ্লাইয়ে গোলমাল করছে।

বাবলুও বলছিল—এখানে নাকি খুব ছোট মাছ কেটে দিয়ে কাটাপোনা বলে চালাচ্ছেন।

হয়তো দরে পোষাচ্ছে না। জিনিসপত্রের দামও তো হু হু করে বাড়ছে। দেখো না—সুদের টাকায় আমাদের এখন সারা মাস চলে না। আসলে হাত পড়ছে। গত মাসে একটা ফিক্সড্ ডিপোজিট সময় হবার আগেই ভাঙতে হল।

এ তোমার খামখেয়ালী। বাবলুর সঙ্গে আমাদের ঘুরতে হবে কেন? আর পাঁচজন ছেলেমেয়ে তো হোস্টেলেই বড় হচ্ছে। ছুটিতে বাবা মায়ের কাছে কলকাতায় যায়—

আরেকখানা মাছ হবে বিমলা?

ওঃ। কথায় কথায় ভুলে গেছি। নাও—আজ তো বেশি করেই বাজার করেছো! দেখো—তোমার ছেলে তো সে-ই হোস্টেলে ফিরে গেল! এখন আমরা কলকাতায় দিব্যি থাকতে পারতাম।

চিড়িয়া মোড়ের বাড়িটা বিক্রি করা খুব ভুল হয়েছে। এখন ওখানে সোনার দর। আর কি সস্তায় আমি বেচে দিয়েছি।

সবই তোমার খেয়াল।

পোষ্টকার্ডের চিঠি।

অরুণদা,

তুমি আর পুষি উঁচু উঁচু ক্লাশে উঠে গেলে। আমিই পিছিয়ে গেলাম। তার ওপর অসুখে ভুগছি। আমার আর ওখানে ক'দিন পড়া হবে জানিনা। এখানে কলকাতায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হয় তোমরা অন্য জগতের মানুষ। আমি সেখানে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম।

এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় একখানা চিঠি লিখতে পারো। এখন কি তোমার গলায় সুর এসেছে? আমাদের শান্তিনিকেতন—সব হতে আপন—এই গানটা তোমার গলায় কি এখন আসে? পুষি বড় ভাল গায়। আমি বিশেষ গাইতে পারি না।

এবার অবশ্য আমাদের বাড়ি পুজো দেখতে আসবে অরুণদা।

ইতি—

মাধুরী

তারিখ দেখে অরুণ বুঝলো, প্রায় তিন সপ্তাহ আগের চিঠি। এখন কোন্ ক্লাশে পড়ে মাধুরী ? তাই সে জানে না। পুষির বড্ড দেমাক। মাথার কাছে খোলা জানলাটা দিয়ে সাঁ সাঁ করে শীত ঢুকছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাল-তোড়ের দিককার আকাশ দেখা যায়। ওখানে ওপরে নীলচে শীত। এবার দিনের বেলায় ওখানে পাখি আসার সময়। মিহির খাস্তগীর নিশ্চয় চোখ বুজে রঙীন পাখিগুলোকে দেখতে পায়। ওর স্বপ্ন তো আবার রঙীন।

অর্জুনকিশোর শুতে এসে দেখলো, অরুণ এলোপাথাড়ি হয়ে ঘুমোচ্ছে। সে জানলাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মশারি টানাতে শুরু করলো। বিমলা আর আজকাল এসব কাজ করে না। খরচা বেড়ে যাওয়ায় সারাদিনের কাজের লোক আর রাখা হয় না। বিমলা নিজেই সব করে। তাই টুকিটাকি কাজ অর্জুনকিশোর নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

অরুণকিশোর ঘুমের ভেতর কেমন চেনা চেনা একটা ঘরে ঢুকলো। মাদার আমি এসেছি। আপনি ডেকেছেন ?

তুমি মাধুরীকে খেলায় নাওনি কেন ?

ও যে বড্ড অ্যাবসেন্ট থাকে মাদার—

খেলায় নেবে ওকে।

ও তো অসুখেই বেশিরভাগ সময়—কলকাতায় থাকে।

ফিরে এলেই ওকে নিয়ে খেলবে অরুণ।

নিশ্চয় মাদার।

মাদার ঝুঁকে অরুণকে দেখলেন। সে চোখ যে কী মধুর। সঙ্গে গোলাপের মিহি গন্ধ। সেই গন্ধে—সেই চোখের আলোয় অরুণকিশোর ডুবে যেতে লাগল। তার নিজের খাটের যেন কোন তল নেই। সে তলিয়েই যাচ্ছে—তলিয়েই যাচ্ছে।

ওঠ্। বাবলু ওঠ্।

এঁ্যা—

ওঠো। রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। দেখো কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—

বাবার কথা কানেই গেল না বাবলুর। পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ঢাক বাজছে না বাবা—?

অবাক হয়ে ছেলের মুখে তাকালো অর্জুনকিশোর। ঢাক ? কোথায় বাজছে বাবলু ?

আজ মহালয়া বাবা ?

ভয় পেল অর্জুনকিশোর। অবাকও হল। এখন কোথায় মহালয়া! কোথায় ঢাকের বাজনা! সেই আসছে বছর আবার শুনবি। কে দেখা করতে এসেছেন তোমার সঙ্গে—দেখোগে বাইরে—

একলাফে বাইরে বারান্দায় এসে হাজির অরুণ। স্যার! আপনি ?

বিমলা চেয়ার এগিয়ে দিল, বসুন—

কালো আবলুস—খাড়াই চেহারার মানুষটি তখনো দাঁড়িয়ে—এই যে আমার প্রিয় গুণ্ডা। তুমিই এ চিঠি লিখেছো আমায় ?

ভাইস চ্যান্সলরের হাতের দিকে তাকালো। তাকিয়ে অরুণ মাথা নিচু করলো।

ভি. সি. বসলে তাঁর মুখোমুখি মোড়া নিয়ে বসলো অর্জুনকিশোর।

তোমার আবেদন মঞ্জুর—

কিসের আবেদন ?

অর্জুনের এককথায় ভি. সি বলল, রামকিঙ্করের ছবির পেছনে তুমি আমায় চিঠি লিখেছো—

হ্যাঁ স্যার। সব ইস্কুলে সরস্বতী পূজো হয়। আমাদের হয় না। তাই ছবির পেছনে আপনাকে চিঠি লিখে আপনারই লেটার বক্সে দিয়ে এসেছিলাম—

বেশ করেছো। পুজো করবে—তবে হোস্টেলের ভেতর। কিন্তু রামকিঙ্করের ছবি তো রেখে দেবার জিনিস অরুণকিশোর।

আমাকে উনি আরও ছবি দিয়েছেন।

তুমি ভাগ্যবান। ওঁর সব ছবিই রেখে দেবার জিনিস।

আমি বুঝতে পারিনি।

সেণ্ট্রাল কিচেনের ঢাকা বারান্দায় মৌচাক ভেঙেছে কে ?

মাথা না তুলেই অরুণকিশোর বলল, আমি স্যার। অতটা গোলমাল হবে ভাবতে পারি নি।

হো হো করে বড় সাইজের মানুষটি ফুলে ফুলে হাসতে লাগলেন। তারপর থেমে বললেন, মৌমাছি তো তোমার কথা শুনে চলবে না। ওরা ক্লাসের পর ক্লাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্কুল, কলেজ—সব তোমারই জন্যে ছুটি দিয়ে দিতে হল। প্রিয় গুণ্ডা! আর এমন কোরো না। সরস্বতী পূজোর জন্যে তুমি যে সরাসরি আমায় চিঠি লিখেছো—এটা আমার খুব ভাল লেগেছে গুণ্ডা! তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম। সময়মত নোটিশ যাবে ক্লাশে—

যাবার আগে ভি. সি. বললেন, আমায় লেখা চিঠি—অতএব এ ছবিখানা আমার হয়ে গেল।

খানিকবাদে মাধুরীকে চিঠি লিখতে বসে অরুণ লেখার কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষে লিখলো—

ঝিলে পাখি আসা শুরু হয়েছে। তুমি সেরে ওঠো। এখানে ফিরে এসো। তখন আমরা দল বেঁধে সাইবেরিয়ান ডাক্ দেখতে যাবো। কী আশ্চর্য। কোথাকার পাখি—কোথায় এসে জলে ভাসে—

কথা ক'টি লিখে ইস্তক অবাক হয়ে গেল অরুণ। এই পৃথিবীর সবকিছু একসঙ্গে দেখা যায় না। পাহাড়, গাছের মাথা দিয়ে জায়গায় জায়গায় আড়াল। তারপর নদী আছে—মরুভূমি আছে—আছে মাইলের পর মাইল—দূর—যাকে বলে দূরত্ব। যদি সব একসঙ্গে রামকিঙ্করের একখানা ছবিতেই আঁকা থাকতো তাহলে তালতোড়ের ঝিলের গায়েই সাইবেরিয়ান লেক দেখা যেতো। বিদেশী হাঁসের ডানার সাঁই সাঁই বাতাসের সরল পাতলা শরীর না-জানি কতটাই কুঁচকে দিত। পৃথিবীটা জায়গায় জায়গায় সিনসিনারি দিয়ে আলাদা করা আছে।

সকালবেলাতেই দ্বিজেন ঘোষ দেখলো—তার ছোট মেয়ে পুষি তার দাদা-মশায়ের কয়লা ঘর থেকে বেরোচ্ছে। সোয়েটার পরিসনি কেন?

আমার গরম লাগে—বলতে বলতে বারান্দায় উঠে এল পুষি।

সবার শীত করছে—তোর করে না কেন?

পুষি ঘুরে তাকালো। দ্বিজেন দেখলো, পুষি আর সেই পুষি নেই। একে-বারে পারিজাত ঘোষ। নিজের মেয়ে বেড়ে ওঠায় গাছগাছালির বেড়ে যাওয়া দেখে যে আনন্দ হয়—তাই হর্ল দ্বিজেন ঘোষের। সে মনে মনে বলতে লাগল—আমারই মেয়ে—আমারই—

ঠিক তখন পুষি বলল, তাহলে তো বাবা—দাদুরও শীত করে। তাই না?

ঘচ্ করে ঘুরে তাকালো দ্বিজেন ঘোষ, বুড়োটা আবার কি বলেছে তোকে?

কিছু বলেননি দাদু। সারা রাত শীতে ঠক ঠক করে কেঁপেছেন। জ্বর আসবে হয়তো।

রোদে এসে বসলে পারে। তোর মা যায়নি ওঘরে?

তাহলে তো কোন কথাই ছিল না বাবা! রাতে খাননি। উঠে গিয়ে রোদে বসার জোরই নেই গায়ে।

ওসব ভান। বুঝলি—ওসব ভান! সারা শান্তিনিকেতন টং টং করে ঘুরে বেড়ায় যে—সে উঠতে পারছে না বিছানা থেকে? হাসালি পুষি! আমার

যাতে বদনাম হয়—তাই চায় বুড়োটা—

হাসো। তুমি একা বসে বসে হাসো।—বলেই পুষি প্রায় দপ করে জলে উঠে দক্ষিণের চিলতে বারান্দায় চলে গেল।

বারান্দার লাগোয়া ঘরে ঝিনি পেছন ফিরে হারমোনিয়মে গলা সাধছিল। খাটের ওপর বসে। জানলা দিয়ে ঝিনি বাইরের কয়েকটা বাড়ির উঠোনের গাছগাছালি টপকে মেলার মাঠের লাগোয়া রাস্তায় একটা ঝাঁকড়া গাছের সবুজ মুণ্ডুর ভেতর তার চেনা ফুল খুঁজছিল—আর সরে এসে মেঝেয় তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিল—কোকো লেজ দিয়ে তার বাঁ পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

সে ঘরে ঢুকে পুষি প্রথমেই দেখতে পেল ওদের মা রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে দাদার জন্যে মাছের পুর বানাচ্ছে—কচুরি বানাবে। আজই দাদা কলকাতার হোস্টেল থেকে সন্ধ্যের ট্রেনে আসবে, ভাজা মাছ থেকে শিরদাঁড়াটা বের করছে মা আর দুলে দুলে গাইছে। দাদার চিঠির জন্যে মা আজকাল এমন করে না—চোখে দেখা যায় না—পিওনকে ডেকে বলবে—আমাদের কোন চিঠি নেই আজ?

থাকলে তো দিয়েই যেতাম মা -

দিদি। তুই একটু তাকা ভাই। তাকাবি না? দাদু সারা রাত শীতে থর থর করে কাঁপছে! আমরা তখন যে যার লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম দিদি—

এসব কথা পর পর সেজেগুজে পুষির মনের ভেতর লাইন দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মুখে ফুটে উঠলো না। ঝিনি খোলা গলায় গাইছিল। কোকো পুষিকে দেখে আদর খেতে এগিয়ে এল। আদর করবে বলে পুষিও হাত তুলেছিল। দিদিটার গলা যে কী সুন্দর—দিদি কি তা জানে? এই সব মনে হতে হতে পুষির কাছে এই সকাল বেলার চেনা পৃথিবী ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠছিল। বাড়িতে শাড়ি ধরে তার নিজেকেই একটা চলন্ত সুন্দর গাছ মনে হয় এক এক সময়। বাতাসের সঙ্গে গাছগাছালিকে, বেড়ায় লাগানো গাছের ডালে ধরা ফুল দুলতে দেখে তার নিজেরই এক এক সময় নাচতে ইচ্ছে করে। কোকোর মাথায় হাত রেখে পুষি নিজেকে নিজেই বলল, আমি তাহলে বড় হয়ে গেছি। বিকেলে খেলার মাঠের দিকে—বাজি পোড়ানোর মাঠের দিকে গেলে এক পায়ে দাঁড়ানো সব গাছ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আর দোলে।

বাবার গলা পেয়ে চমকে উঠোনে ফিরে তাকালো পুষি। তাকিয়েই পুষি শিউরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে উঠোনে নেমে এল, এরকম করবে না।

বাবা। থামো বলছি। একাজ তুমি পারবে না—

দ্বিজেন ঘোষ বাঁ হাত দিয়ে তার ছোট মেয়েকে সরিয়ে দিল। গলা তখন তার চিরে যাচ্ছে। এই করে আমার নাম খারাপ করা—আমি বুঝি না—

ভুল ভুল করছে শাদা দাড়ি গালে। দুটো চোখই রাত জাগা আর শীতে লাল হয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। পুষি দেখেই চিনলো—দাদামশাই তার দাদার বাতিল একটা ছেঁড়া ফুলপ্যান্ট আর হাফশার্ট গায়ে দিয়েছে। কয়লা ঘরের অন্ধকারে একটু আগে এসব দেখতে পায়নি সে। গায়ে জ্বর কিনা জানতে কপালে হাত দিয়েছিল শুধু।

পুষির দাদু সোজাসুজি দ্বিজেন ঘোষের মুখে তাকিয়ে বলল, কি বোঝো?

দাদু এমন সরাসরি জানতে চাওয়ায় পুষির চোখে জল এসে গেল। দিদি—মা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে! দাদুকে এখন একদম রাজার মত লাগছে। মাথার শাদা চুলে, বুক খোলা ছেঁড়া শার্টে রোদ পড়েছে। গায়ে তুলো ছেঁড়া ছেঁড়া সস্তার সেই লোকঠকানো কম্বলটা—

দ্বিজেন ঘোষ তার শ্বশুরের এ কথায় একদম থতমত খেয়ে গেল। তার পরই তেড়ে গিয়ে বলল, গায়ে এটা কি? এঁ্যা? আমি বুঝি না? বাড়ির কুকুরের গায়ে দেবার নোংরা তুলো ওঠা কম্বল চড়িয়ে বাইরে বেরোনো হচ্ছে—?

বলতে বলতেই দ্বিজেন ঘোষ তার শ্বশুরের গা থেকে একটানে কম্বলটা টেনে উঠোনে ফেলে দিল। আর অমনি কোকো সেই কম্বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল। পুষির দাদুও কোকোকে কম্বল দেবে না। সে একদিক ধরে টানছে। কোকোও দখল ছাড়বে না। সে চিনতে পেরে চেঁচাতে লাগলো। দ্বিজেন ঘোষ এক লাফে জোড়া পায়ে গিয়ে কম্বলের ওপর দাঁড়ালো—কোকোর দিক টেনে।

এই সময় শক্তিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে দ্বিজেনের মাথায় রক্ত উঠে গেল। রিনি তার বাবাকে এ অবস্থায় দেখে তার নিজের হাত পা খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু মনে পড়ল—এই লোকটাই আমাদের বাবা? সেক্সপীয়ার পড়ায় ছাত্রদের? স্কলারদের থিসিসের গাইড?

দ্বিজেন ঘোষ শক্তির হাত দেখে বুঝলো, কিছু একটা খাবার বানাচ্ছিল নিশ্চয়। দেখেই চেঁচিয়ে বলল, কতবার না বলেছি—তুমি রান্নাঘরে ঢুকবে না। শান্তির রান্না অনেক ভাল তোমার চেয়ে—তোমার হাত লম্বা—

রাঁধিনি। মাছের কচুরি বানাচ্ছিলাম।

বানাবে না। তখন না তোমায় কতবার পই পই করে বলেছিলাম—

রিটায়ার্ড উইডোয়ারকে এখানে ডেকো না—ডেকো না। তার চেয়ে মাসে মাসে ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিলেই হবে—

শক্তি পাখি পড়া কলের মত বলে গেল, শেষে তুমিই বললে—এখন নগদ টাকার টানাটানি— কি আর হবে—সবার সঙ্গে এক সঙ্গেই থাকা খাওয়া হয়ে যাবে।

রেগে দিক হারিয়ে ফেলল দ্বিজেন ঘোষ—কি ? আমি বলেছি নগদ টাকার অভাব ? আমি একজন ইউ. জি সি প্রফেসর—

রিনির হাসি এসে যাচ্ছিল। মায়ের পর তার সব রাগ জল হয়ে গেল। কোন্ সময় কোন্ কথা বলতে হয়—তাও খেয়াল থাকে না। মা যে কি হয়ে গেছে—এমন তো ছিল না আগে।

দ্বিজেন ঘোষ চেঁচাচ্ছে। পুষি বার বার বাবার হাত ধরতে যাচ্ছে—আর ধাক্কায় পিছিয়ে যাচ্ছে। কোকোর মুখে লোকঠকানো কম্বলটার খানিকটা। দাদু যেন কি বলল। কিছুই কানে গেল না রিনির। এ সকালটা তার চোখের সামনে মুছে গেল।

বোলপুর স্টেশনে নেমে বাবা সুটকেশ আর হোল্ডল দিয়ে দাদাকে একটা রিক্সায় বসিয়ে দিয়ে বলছে চাবি নে—তুই গিয়ে বসার ঘরের তালা খুলবি—

মায়ের কোলে পুষি। রিক্সায়। রিনি মা বাবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তখন বাবা আমাকে ডাকতো—আমার বড় মেয়ে। মাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। কানে বড় বড় দুল।

নিজেই থর থর করে কেঁপে উঠলো রিনি। একি ?

দ্বিজেন ঘোষ তখন তার শ্বশুরকে তেড়ে ছুটে যাচ্ছে। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি এই দণ্ডে—

দাদুও রাগ পায়ে প্রায় টলতে টলতে ছুটছে—পড়ে যাবে না তো— ? পেছন পেছন পুষি।—দাদু—দাঁড়াও দাদু—

দাদুর ভ্রূক্ষেপই নেই। কাঠের গেটটা খুলে রাস্তায় পড়েই ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কোকো বেরিয়ে পড়েছে। ভাগ্যিস শান্তিনিকেতনের অনেকেই এখনো ঘুমিয়ে। বাড়িগুলো দূরে দূরে।

দাদু শান্ত গলায় বলল, তোমার এ নরকে আমি আর ফিরছি না—

জাহান্নামে যাও—বলে দ্বিজেন ঘোষ খোলা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েই তেড়ে গেল। সঙ্গে পায়ে পায়ে কোকোর ঘেউ ঘেউ। পেছনে পুষি কাঁদতে কাঁদতে ছুটছিল। রিনি মায়ের হাতখানা ধরে বলল, দাদুকে ফেরাও

মা—ফেরাও—

শক্তি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো, আমি কি করবো?

পুষি তার দাদুর হাত ধরে ফেললো।

দাদু থেমে পুষির বাবার মুখে সরাসরি তাকালো, আমি জানি—আমার মেয়ে এখানে কী ভাবে আছে—শুধু মেয়েটার জন্যে—

দ্বিজেন ঘোষের গলা শ্লেষে চাপা হয়ে এল, ওরে আমার সক্রেটিস রে! বেরোও বলছি—বেরোও—আর এক মিনিটও না—আয় পুষি—

বলতে বলতে দ্বিজেন ঘোষ শক্ত হাতে তার ছোট মেয়ের হাত টেনে নিল। আয়—

কোকোও চেঁচিয়ে বলল, ঘেউ।

রাস্তায় এখন রিক্সা। কয়েকখানা কোয়ার্টারের দরজা খুলে গেছে। মোহিত দত্ত দুধ নিয়ে ফিরছিল। হেসে বলল, কি প্রোফেসর ঘোষ—হোল্ ফ্যামিলি মর্নিং ওয়াকে?

দ্বিজেন ঘোষ অনেক কষ্টে হেসে মাথা নাড়লো। ততক্ষণে পুষির দাদু হন হন পায়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পুষি নিঃশব্দে হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চাইলো। দ্বিজেন ঘোষও নিঃশব্দে নিজের হাতখানা দিয়ে ছোটমেয়েকে ডবল জোরে চেপে ধরলো।

প্রিয় রিনি,

এ চিঠি তোমার কলেজের ঠিকানায় লিখছি। আমি ইদানিং হোস্টেলে যতক্ষণ জেগে থাকি শুধু তোমারই মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসে। আমি পড়ায় মন বসাতে পারি না। অথচ ফাইনাল সামনে। কি যে হবে জানি না। জলে ফড়িং পড়লে দেখেছো—ভিজে পাখনা কোনমতে টেনে নিয়ে উড়বার চেষ্টা করে—আমারও তাই দশা। তাই কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছি। যদি এখানে বসে পড়তে পারি।

কিন্তু দেখছি—তাও হবার নয়। তুমি সারাক্ষণ ধরে আমার মন জুড়ে আছো। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু তুমি যে আমায় দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছো—পরীক্ষা শেষ না হলে আমার তোমাকে দেখতে যাওয়া চলবে না।

এই অব্দি লিখে সামনের খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে হৃদীপ দেখতে পেল

রাস্তার উল্টোদিকের ফুটে পোটোরা সরস্বতীর কাঠামোতে মাটি লাগাচ্ছে। কাছেই একটা বিয়ে বাড়িতে মাইকে সানাই। লেখা পাতাটা একটানে ছিঁড়ে নিয়ে মুচড়ে নিচে ফেলে দিল। অফিস ফেরৎ চাকুরেরা কেউ কেউ জানলার নিচেই ফুটপাথ ধরে কালীঘাটের দিকে শর্টকাট করতে ব্যস্ত।

নিজের মনের অবস্থাটা খুলে বোঝাবে বলে সুদীপ আবার শুরু করলো।

প্রিয় রিনি। সামনেই পড়ার বই খোলা।

সুদীপের ঘাড়ের কাছে তার বাবার গলা ভেসে উঠলো, কে এই রিনি ?

চমকে সুদীপ উঠে পড়লো। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, বাবা। তাঁর বাঁ হাতে একটু আগে দলা পাকিয়ে ফেলে দেওয়া রিনিকে লেখা চিঠিটা—

সর্বনাশ! ছোঁ মেরে চিঠিটা নিতে গেল সুদীপ। অবিনাশ হাত সরিয়ে নিলেন। তার ডান হাতের গ্লাসে ফিকে চিরতা রঙের জলও একটু চলকে গেল।

বাবা পড়ে ফেলেনি তো চিঠিখানা ? এই কথা গুছিয়ে ভাবারও সময় পেল না সুদীপ। অবিনাশ ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, গ্লাসটা তোমার টেবিলে রাখো। পড়ে যাচ্ছিল। দামী জিনিস তো! বুঝতেই পারছো। তুমি এখন বড় হয়েছো বড়খোকা—

ভ্যাবাচেকা খেয়ে গ্লাসটা বাবার হাত থেকে নিয়ে সুদীপ তার পড়ার টেবিলে রাখলো। এই টেবিলটায় বসেই সে সেকেণ্ডারি, হায়ার সেকেণ্ডারির পড়া পড়েছে। এই টেবিলেই একসময় বাবা তাকে প্রিসি, ট্রানস্লেশন করিয়েছে তখন মা ভাল ছিল। এখন এ টেবিলে অধিপের বসে পড়ার কথা। কিন্তু—

সরো। আমায় একটু বসতে দাও দিকি।

সুদীপের চেয়ারে বসেই অবিনাশ চোখের চশমা খুলে ছেলের খোলা বইয়ের ওপর রাখলো, প্রেমে পড়েছো ? মেয়েটি কে ?

চোখের সামনে কলকাতার পোটোপাড়ার রাস্তা জুড়ে আলো, মানুষের আনাগোনা, আলুর চপ ভাজার গন্ধ, হাতেটানা রিক্সা—উপযুক্ত ধর্মের ষাড়। এই একটু আগেও সুদীপের চোখে এমন একটা বিশৃঙ্খল রাস্তা রিনির ভাবনায় মাখামাখি হয়ে দিব্যি স্বপ্নের কোন রাস্তা হিসেবেই ডিফারেনসিয়ালের খোলা পাতায় বেমালুম ঢুকে যাচ্ছিল। চিঠি লিখতে লিখতে একবার মনেও হয়েছিল সুদীপের—বারাউনি এক্সপ্রেসে আচমকা কলকাতায় এসে রিনি সিধে এই পোটো পাড়া দিয়ে হেঁটে খোলা জানলার সামনে হাজির হবে। তখন এই ধুলো ময়লায় রিনি যেখানে যেখানে পা ফেলে আসবে—সেখানে সেখানে একটা

করে বেল কুঁড়ি ফুটে গিয়ে গন্ধ ছড়াবে।

আর এখন! একেই বলে বিপদ। রিনির চিঠি বাবার হাতে। সুদীপের চোখের সামনে সারাটা কলকাতা টাইমপিসের ভেতরের চেহারা পেয়ে গেল। রাস্তাঘাট, আলোর খুঁটি, একমেটে সরস্বতী—সব—সবই জট পাকিয়ে গেল।

কি? কথা বলছিস না কেন বড়খোকা?

সুদীপ আবছা আবছা বুঝলো, এ টাইমপিস সারিয়ে আর কোনদিন আগের মত করা যাবে না।

কি? বোবা হয়ে গেলি? বলতে বলতে অবিনাশ বাঁ হাতে গ্লাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকালো। এক ঢোক খেয়ে গ্লাসটা আবার জায়গা মত রাখলো। ছোটবেলা থেকেই সুদীপ হুইস্কির গন্ধটা চেনে।

কি? মেয়েটি কে?

তুমি চিনবে না বাবা। আমার এক বান্ধবী।

সে তো বুঝতেই পারছি। তোমার মা পাগল। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ছোট ভাই এই ভর সন্ধ্যেয় আদি গঙ্গার পোলের নিচে বসে নৌকোয় জুয়ো খেলছে। আর তুমি! সামনে ফাইনাল। লিখছো প্রেমপত্তর!!

সুদীপ কোন কথা বলল না।

তোমায় এতদিন আমি পড়িয়ে এসেছি। এই যে হুইস্কি দেখছো—এও আমারই জমানো টাকায় কেনা। চাকরি ছাড়ার পর পি. এফ-এর টাকাটা ডাকঘরে রেখেছিলাম। ছ'মাস পর যে সুদটা পাই সেটা আজ তুলেছি। কারেন্ট বাড়িভাড়া এখনো পরিষ্কার। কিন্তু বাকি পড়লো বলে। টাকা ফুরোবার পরেও যদি বেঁচে থাকি—

তুমি শুধু শুধু উতলা হচ্ছো বাবা—

টাকার সঙ্গে আয়ুর এই লুকোচুরির নিয়মকানুন পাকা খেলুড়ে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না বড়খোকা। টাকা ফুরোবার পরেও যদি বেঁচে থাকি—তাহলে আমরা দু'জন তোমার অন্নদাস হব। সরি। তোমার একটি ছোটভাইও আছে। তখন কুল্লে আমাদের তিনজনকে তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে হবে। যেমন তোমায় এতকাল বসিয়ে খাইয়েছি—পড়িয়েছি—ওই শোন—

বাবাকে থেমে যেতে দেখে সুদীপও পাশের বন্ধ ঘরের দিকে কান পাতলো।

তোমার মা গান গাইছে। শোনো—

না। কেউ গাইছে না। মা ঘুমোচ্ছে—

ভাল করে শোন বড়খোকা। তোমার মা আজ দু'বছর হল পাগল—

মা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। নতুন ওষুধটা পড়েছে তো। ও তোমার মনের ভুল বাবা—এই অব্দি বলে সুদীপ গলগল করে বলে যেতে লাগলো—পাগল তো মা তোমারই জন্যে। যতদিন ভাল ছিল মা—ততদিন তাকে চাপের ভেতর রেখেছো বাবা—একদিনের জন্যেও চাপ কমাও নি। মা কেন? আমাদের চাপের মধ্যে রাখোনি?

যেন হিসেব পরিষ্কার করতে বসেছে সুদীপ। অবিনাশ তখনই গ্লাস থেকে লম্বা একটা ঢোক খেল।

বড়খোকা—পয়লাবারেই তোমায় জয়েন্ট এন্টাসে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। তোমায় ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনালে ফার্স্ট হয়ে প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেতে হবে। তাহলে সেরা জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বসবে প্রথম জীবনেই। একদিনের জন্যেও চাপ কমাওনি বাবা। বড়খোকাটা বোকা। সে তোমার ইচ্ছে হয়ে শুধু পড়েছে। আমি জীবনের আর কিছু জানি না বাবা—কলেজ, লাইব্রেরি, বাড়ি যাতায়াত করেছি শুধু এ ক'বছর।

খারাপ তো হয়নি কিছু তোমার—

আমি কিছুই দেখিনি বাবা। মা যেমন কোথাও কোনদিন বেড়াতে না গিয়ে পাশের ঘরে পাগল হয়ে গিয়ে একদিন গান গেয়ে উঠলো—আমিও—

থামো। তুমি পাগল হওনি। এই তো দিব্যি প্রেম করছো। বলে অবিনাশ রিনিকে লেখা সেই কাগজখানা ফিরে পড়তে চোখে চশমা লাগালো।

সত্যিই পাশের ঘরে কেউ গাইছে না। ওটা অবিনাশের মনের আতঙ্ক। রিনির সঙ্গে স্কুলে যাবার রাস্তা দিয়ে একদিন ভাদ্রমাসের বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ভ্যাপসা গরমে—মাথার ওপর মেঘভার আকাশ রেখে একটা চাপা গুম-গুমানি টের পেয়েছিল সুদীপ—রিনির গলায়।

রিনি তখন ওর বাবার কথা বলছিল। জানো—আমার বাবা প্রফেসর ঘোষ—ডক্টর ঘোষ একজন বিদ্যের জাহাজ। সবাই বলে জ্ঞানী মানুষ। উনি প্রায়ই ওঁর বসার ঘরে বসে এঁকে বলেন—আপনি কিছু জানেন না!—ওঁকে বলেন—উনি একটি মূর্খ্য!!

কথা বলতে বলতে রিনি থেমে গিয়েছিল। দূরে কোন্ ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে ট্রেন টানতে টানতে ইঞ্জিন তার ক্লান্ত বুকে কলকজার শব্দ করতে করতে এগোচ্ছিল। একদম পাঁজর খুলে পড়া সব শব্দ।

রিনি চোখ তুলে সুদীপের মুখে তাকালো। তখনই ইঞ্জিনের সে শব্দ কেমন

চাপা গুমগুম করে উঠলো। ঝিনি বলল, প্রান্তিক ছেড়ে গাড়ি বোলপুর আসছে। এখন লাইন নিচে নেমে গেছে। দু'ধারের মাটি উঁচু হয়ে গিয়ে জায়গাটা প্রায় সুড়ঙ্গ। রামপুরহাট লোকাল এল।

সেই গুমগুমানি সেদিন সুদীপের পাঁজরে ঢুকে গিয়ে ভেতরের কলকব্জায় ধাক্কা খাচ্ছিল। যেন কাটা রেলপাটির ঝোলানো ঘণ্টায় কে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটছিল।

এসব কথা সুদীপের মাথার ভেতর অ্যালবামের পাতার কায়দায় কে যেন তিন সেকেণ্ডে উলটে দিল। সুদীপ আবার মোচড়ানো কাগজখানা পেতে ছোঁ দিল। এবারও পেল না।

অবিনাশ হাত সরিয়ে নিল। প্রেম দু'এক খানা আমিও করেছিলাম। তোমায় বলি বড়খোকা—ওসব গল্পের বইয়ের পাতাতেই ভাল খোলে—

একথা তুমি তোমার ছোটছেলেকে বলতে পারতে বাবা?

না।

কেন?

পারি না। এক একজনের সঙ্গে এক এক ভাবে মন খোলা যায়।

অধিপের সঙ্গে তুমি কোনভাবেই পারতে না। কারণ শোন বাবা—ও কোনদিনই তোমার চাপ—একটানা দম বন্ধ করা চাপ মেনে নেয়নি। গোড়া থেকেই অধিপ তাই তোমার সাঁড়াশীর বাইরে বাবা।

তার মানে কি বড়খোকা? তুমি কি আমাদের সঙ্গে—আমাদের জন্যে কোনই দায়িত্ব বোধ কর না?

একশোবার করি।

তাহলে শোন। এ প্রেম—তোমার এই বান্ধবী—ঝিনিকে এই চিঠি লেখালিখি—সব—সবই তোমাকে ছাড়তে হবে। ইউ ক্যান নট অ্যাফোর্ড দিস। আমাদের ফ্যামিলির সেই অবস্থা নয় বড় খোকা।

ফ্যামিলি! বলেই একটা চাপা রাগে সুদীপের গলা বন্ধ হয়ে গেল।

অবিনাশ ঠিক শুনতে পায় নি। কি বললে?

নাঃ! কিছু না। আমার চিঠিখানা দাও। বলতে বলতে অবিনাশের হাতে থাবা দিল সুদীপ। চিঠিখানা তার হাতে উঠে আসতেই সারা পোটোপাড়া অন্ধকার করে দিয়ে আলো চলে গেল। খোলা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সুদীপ দেখতে পেল—অন্ধকারেই পোটোপাড়া আবার জেগে উঠেছে। কি পোটোবাড়ির সামনের ফুটে বাড়ির মেয়েরা একটি করে কুপি

কেশব সেন স্ট্রীটে চৌধুরীবাড়ির সারাটা একতলা জুড়ে কালোয়ারদের লোহার পাইপ, রড, ভাঙা টিউবয়েলের পুরনো মাথা থাকবন্দী দিয়ে সাজানো। দু'ধারের বাড়িই তাই। কোন কোন বাড়ির অন্দর মহলের উঠোনেও রডের গোছা ঢোকানো। বড় বড় মরা ইলেকট্রিক মটরের ডাই বারান্দা উথলে ফুট-পাথে উপচে পড়েছে। ওরই ভেতর বেলা দেড়টার ঠাণ্ডা ছায়ায় ব্যাকব্রাশ চুলের মাথা নিয়ে একজন বনেদী চেহারার আটচল্লিশ পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ভদ্রলোক চকচকে পাম্পসু পায়ে রাস্তা থেকে ঢুকে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে সিধে ওপরে উঠতে লাগলো মশ মশ করে। রাস্তা থেকে তার গায়ের উলেবোনা জওহর কোটের ডগা দেখা গেল শুধু।

সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে একজন মহিলা তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সে শীত-কালের দুপুরের ঠাণ্ডা অন্ধকারে ভদ্রলোকের মুখটি পরিষ্কার না দেখতে পেয়েও বুঝলো—ওখানে মুখের জায়গায় সুন্দর টানা টানা দুটি চোখের নিচে এখন স্থায়ী কালি। নাকটা টিকোলো। পাতলা ঠোঁট।

মহিলা না দেখেই আরও জানে—এই পুরুষের পাঞ্জাবির সব ক'টি বোতাম এখন জামায় আটকানো। চৌধুরী বাড়ির রেওয়াজই তাই। ছাব্বিশ বছর ধরে মহিলা একথা জানে। কারণ, বাড়ির মেজো এই কর্তাটির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই মহিলা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে একথা জেনে আসছে। যেমন—সে জানে—এবার বাড়ির দুর্গাপুজোর ভাগের পুজো এই কর্তার ওপরেই পড়েছে।

ভুজঙ্গ চৌধুরী খুবই ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল।

তার বউ মিনতি চাপা গলায় জানতে চাইল, কিছু হল?

নাঃ! একবার ওপরে চল। সিন্দুকটা খুলতে হবে।

খুলে কি হবে! আর যে কিছু নেই!

তা বললে চলবে কেন মিনু। চল—খুলে দেখবে একবার—। কাল ভোরেই ক্যান্টিনের দেড়মণ মাংস নিয়ে আমায় হুজিতে নামতে হবে। তারপর রিক্সো করে—বলেই অন্য কথায় চলে গেল ভুজঙ্গ চৌধুরী, লোকজনের ধার আছে তিন মাসের—

থাকলে তো শুধু নারাণের সিংহাসনটুকু আছে।

সোনার তো। এখন বিপদটা কাটিয়ে উঠে পুজোর আগে টাকা পেয়ে গড়িয়ে রাখবো।

যদি না পারো। ভাগের পুজোয় শেষে সবার সামনে বিনা সিংহাসনে নারায়ণ নামালে কি কৈফিয়ৎ দেবে?

তার আগেই গড়িয়ে রাখবো। টাকা তো পেয়েই যাচ্ছি।

ও ঘরে এখন মাধু ঘুমোচ্ছে। একটু শব্দ হলেই জেগে যাবে।

এক সেকেণ্ড কি ভাবলো ভুজঙ্গ। মেয়েটা সেই আশ্বিন মাস থেকে ভুগছে। মুখে আনতে চাইস, আজ জ্বর এসেছে?

নাঃ। কিন্তু লিভার তো ভাল হল না। লক্ষণ ভাল দেখছি নে। কত দিন হল ভুগছে মেয়েটা। স্কুলও ছাড়িয়ে আনতে হল শান্তিনিকেতন থেকে।

এ কথায় মন দেবার সময় ছিল না ভুজঙ্গের। চল চল—তাড়াতাড়ি চল।

এই একই ভুজঙ্গ চৌধুরী যখন সন্ধ্যে সন্ধ্যে মেয়ের পায়ের কাছে দাঁড়াল—তখন মাধুরী তাকে দেখে অবাক। পালঙ্কের কাঠের কারুকাজ ধরে ভুজঙ্গ দাঁড়িয়ে। মাধুরী শুয়ে শুয়ে দেখছিল—মাথাটা টন টন করছে—তার ভেতরেই দেখলো, কাঠের ফুলগুলো যেন বাবার বুকেরই কোন ফুল, লতাপাতা। বড় ঠোঙায় মুসুম্বি নামিয়ে রেখে আনারস দু'টো তুলে দিল মায়ের হাতে। রস করে আনো। মাধুর সঙ্গে আমিও এক গ্লাস খাবো—

একথা বলে ভুজঙ্গ মেয়ের পায়ের কাছে বসলো, আজ কেমন আছো মা?

ভাল।—বলেই চুপ করে গেল মাধুরী। সে জানে তার চোখের হলুদ একটুও যায়নি। তারপর নিজেই বলল, আমি আর কোনদিন ভাল হব না বাবা

সে কি কথা! তুমি তো সেরে উঠছো মা। তুমি একদিন বড় হবে। আমি রাজপুত্তুরের মত দেখতে ছেলে আনবো।

হা হা করে হেসে উঠলো মাধুরী। হাসির শেষে কাশলো। সে দেখছিল বাবা কতখানি সুন্দর দেখতে। যেন ছবি আঁকা। টানা টানা চোখ। অর্ডার সাপ্লাই করতে গিয়ে সেই চোখের নিচে কালি পড়েছে। মাথার ব্যাকব্রাস চুলে দু'একটা রুপোলি লাইন। চোখ জোড়া নীলচের দিকে।

বাবা থামলে মাধুরী বলল, বারে! আমি বুঝি পড়বো না। অরুণদা, পুষি ওরা উঁচু উঁচু ক্লাসে উঠে গেল।

নিশ্চয় পড়বে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে পড়বে। আমার তো শরীর ভাল না মা। আমার কাজগুলো আমি করে যেতে চাই।

ব্যবসা তোমার জিনিস নয় বাবা! পেমেণ্ট পাবার কথা ছিল—পেয়েছো? মিথ্যে মাথা নেড়ে দিল ভুজঙ্গ, নয়তো তোর মায়ের শাড়ি, ফল-টল আনলাম কি করে পাগলি?

বলছিলাম কি বাবা—আমার জন্যে তোমার সেই গুণীনকে ডাকো—যে বলেছিল—না।

না। লোকটা বলে কি তিনদিন ভোরে খালিপেটে বাড়িতে পাতা দইয়ের সঙ্গে শাদা আশশ্যাওড়ার শেকড় বেটে খাওয়াতে হবে তোকে। কী না কি পয়জন আছে ওতে কে জানে -

আহা! খাইয়েই দেখো না বাবা। আমি অত সহজে মরছি নে। তুমি আর কতদিন ফল খাওয়াবে? কতদিন আলাদা করে মাছ সেদ্ধ খাওয়াবে—

তুমি সেরে উঠলে বলে। সামনের পূজোয় শাড়ি আনিয়ে দেব কোটা থেকে। আসল কোটা।

এখন তো আমার শাড়ি পরার বয়স, বাবা—

মিনতি মেয়ে আর ভুজঙ্গকে দু'গ্লাসে ফলের রস করে এগিয়ে দিল, হ্যাঁ। তাইতো! একেবারে বুড়ি হয়ে গেছো!!

ব্যবসাটা জমুক এবার। সবাইকে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনের গরমে দার্জিলিংয়ে নিয়ে ফেলবো।

তার চেয়ে বাবা শান্তিনিকেতন চল।

ওখানে আছে কি? আমার নেহাৎ যেতে হবে—হোস্টেলের খাবার দাবার সাপ্লাই দিই তো। দেখলেই বলবে—মাছের পিস ছোট কেন? আলুগুলো কদ্দিনকার?

পেমেণ্ট তো পাও!

তা পাই।—বলেও একটা তেতো লেগে থাকলো ভুজঙ্গর জিভে। দ্যাখো মিনু—আমরা চৌধুরীবাড়ির ছেলে। আমরা কোনদিন পেমেণ্টের জন্যে কেরানীবাবুদের সামনে টুলে বসে থাকতে হবে ভাবিনি। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ভাইসরয়ের বড়দিনের বল নাচে নেমন্তন্ন পেতেন—নিচের ওই উঠোনে একবার লর্ড ক্যানিং তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন দুর্গাপুজো দেখতে।

মাধুরী এর ভেতরেই দেওয়ালে চোখ স্থির রেখে বলল, আমার কোনদিন আর ওখানে পড়া হবে না মা—আমি জানি।

ওমা! সে কি কথা! সেরে উঠলে শরীর ফিরলেই তোকে তোর বাবা হোস্টেলে রেখে আসবে। এখন তো আর কান্নাকাটি করবি না। সে বারে

অর্জুনবাবুর ছেলে অরুণ—কি হাসাহাসি করেছিল তোকে কাঁদতে দেখে।

অরুণদাটা অমনই মা। এখন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে শুনেছি।

কে বলল ?—

পুষিদি। পারিজাত ঘোষ—চল না বাবা শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি। আমার বড্ড ইচ্ছে করে—বলতে বলতে মাধুরি দেখলো, জানলার নিচে কেশব সেন স্ট্রীটে মসজিদের গায়ের মাংসের দোকানে কষাই মাংস ঝোলাচ্ছে—ইলেকট্রিকের আলো জ্বেলে দিল। কতদিন সে মাংস খায় না।

মাড় না দিয়েই শান্তিদি শাড়িটা তারে টানিয়ে দিতে পুষি বলল, মাড় দিলে না ?

দেবার হলে দিয়ে নিও নিজে। তোমার বাবার ঘরে লোকজন এসেছেন—আমি চা ভিজিয়ে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বাঃ। এটাও কি কাজ নয় শান্তিদি ? আবার মাড়ে ভিজিয়ে শুকোতে দিলে সুতো পচবে না ?

সে কৈফিয়ৎ তোমার বাবাকে দেবো।—বলতে বলতে রাগ হাত পায়ে শান্তি রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

এখন স্কুলে যাবার সময়। ভেবেছিল বিকেলে শাড়িখানা ইস্ত্রি করে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ওদিকটায় বেড়াতে যাবে। শান্তিদিকে কড়কানোর মত লাগসই অনেক কথা মনে আসছিল পুষির।

স্কুলে যাবার পথে হেনাদি-মোহিতদার কোয়ার্টারের বাগানে বড় বড় গন্ধরাজ পাতার ভেতর থেকে পুষির দিকে তাকিয়ে ছিল। ওই গাছটার পাশেই ক' বছর আগে আমরা শীতের ফুল বসাতাম। আজ হেনাদি যাবেন না। বলেছিলেন—ডেন্টিস্ট দেখাতে যাবেন।

স্কুল যেতে যেতে রাস্তা পাল্টে ফেললো পুষি। একসময় সে দেখলো নির্জন দুপুরে সে একদম একা ভি সি'র কোয়ার্টারের পেছনের এবড়ো খেবড়ো জায়গা পেরিয়ে রেল লাইনের দিকে চলেছে। ভাঙা জায়গা এখানটায় সিধে উঁচু হয়ে সামনেই রেল লাইনকে অনেক নিচে ফেলে দিয়েছে।

তখন তখনই প্রান্তিক থেকে একটা মালগাড়ি চেরা হুইসেল দিতে দিতে এগিয়ে এল। তার ভেতর পুষি গলা ফাটিয়ে ডাকলো—দাদু—উ—উ—

ট্রেনটা বোলপুর চলে গেল। পুষির একবার মনে হল—তালতোড়ের জঙ্গলে

গিয়ে ডাকবে। ওখানে বনের ভেতরে গিয়ে বাসা বেঁধে নেই তো দাদু? শীত-কাল চলে গিয়ে বছর ঘুরতে চলল। কোথায় গেল জলজ্যান্ত মানুষটা? এর মাঝে শান্তিদি একদিন গুসকরা ফেরৎ বোলপুরে নেমে দাদুর মত একজনকে দেখতে পায়। চোখাচোখি হতেই মানুষটা প্লাটফর্মের ভিড়ে ইচ্ছে করে হারিয়ে যায়। যেন ধরা দিতে চায় না। এত লুকোচুরি খেলার কী দরকার তোমার দাদু? মা বলেছিল, না বাবা নয়। বাবা আর কোনদিন ফিরবে না। ও অন্য কোন লোক।

দাদু যদি সামনের পৌষমেলায় ফিরে আসে। গেট থেকে তাঁর হাত ধরে পুষি ভেতরে নিয়ে যাবে।

রাতে খেতে বসে দ্বিজেন ঘোষ জানতে চাইল, আজ স্কুলে যাসনি—

খেতে খেতে পুষি অন্ধকার উঠোনের দিকে তাকিয়ে পড়লো। মনে মনে বলল, বাবার তো জানার কথা নয়। সব জায়গায় কি গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে বাবা?

মাঠের ভেতর একা একা দাঁড়িয়ে কি করছিলি দুপুরবেলা।

এমনি বেড়াচ্ছিলাম।

ওসব কি বেড়াবার জায়গা? কোন্ বিপদে পড়বি।

ফোড়নের মতই কথা বলে উঠলো শান্তি, দাদামশাইকে খুঁজতে যায়—

তাই নাকি?

পুষি রাগে রাগে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।

নাতনী এক একদিন এক এক দিকে যায়—

রিনি গর্জে উঠলো, তুমি থামো শান্তিদি। আর পুষি—সামনের ভাত ফেলে উঠতে নেই।

বারান্দার বেসিনে হাত ধুতে ধুতে পুষি বলল, খিদে নেই!

ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিজেন ঘোষও আর কথা বাড়ালো না। তার মাথায়ও আর আসে না—বুড়ো গেল কোথায়? বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে হাজতবাস করছে কি? কিংবা পাঞ্জাবের গাঁয়ে হয়তো পাগল সেজে বসে আছে। সরা-সরি বউয়ের মুখে তাকাতে পারছিল না প্রফেসর ঘোষ।

আড়চোখে দ্বিজেন ঘোষ দেখলো, শক্তির কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। দিব্যি হাতে গড়া রুটি দিয়ে বেগুনপোড়া সাপটে খাচ্ছে। কোকো কয়লা ঘর থেকে বেরিয়েই চার পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। বারান্দার আলোয় ডুমের পাওয়ার বাড়ানো দরকার।

মহালয়ার দিন ঢাকে কাঠি পড়লো প্রথম। আজ সব ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। সন্ধ্যের মুখে সাইকেলে স্কুল থেকে ফিরছিল অরুণ। গাছতলায় থামতে হল। ওখানে মোড়ের দোকানটায় দারুণ ঘুগনি করে। বাতাসে তারই গন্ধ। তারিয়ে তারিয়ে এক প্লেট ঘুগনি খেয়ে আবার সাইকেলে।

মাঠের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস শীতের হিম বয়ে আনছিল। এবার পুজো বেশ দেরিতে। লক্ষ্মীপুজো পড়ছে নভেম্বরের গোড়ায়।

কলাভবনের সামনে তার নাম ধরে কে ডাকলো। ও অরুণবাবু। শোন শোন।

সন্ধ্যে পড়ে যাওয়ায় কিছুই দেখা যায় না। কে? মোহিত? ঠিক ধরেছি।

আজকাল একদম আসা হয় না কেন? উঁচু ক্লাশ? পড়ার চাপ?

না না! মোটেই তা নয়। কাল সকালেই যাবো ভাবছিলাম। হেনাদির ওখানে বসে গান শোনা হয় না অনেকদিন।

সেই তো বর্ষার ভেতর দাঁত তুললো দুটো—এখনো মাঝে মাঝে গাল ফোলে। সেপট্রান খেয়েই চলেছে মাসের পর মাস। ভাল কথা—শশাঙ্কবাবু নাকি দশ বারোজনকে ইচ্ছে করে কম নম্বর দিয়েছেন—

আমরা তো রিভিউয়ের দাবি তুলবো। এরা কেউ ফেল করার ছেলে নয়। আগেকার নম্বর দেখুন মোহিতদা।

আমার কিছু বলার নেই। আমি তো ইউনিভার্সিটি থেকে রিটায়ার করছি।

এর মধ্যে রিটায়ার করবেন কি।

হ্যাঁ। ষাট হয়ে যাবে জানুয়ারীতে। তবে যদি ইউ. জি. সি আর পাঁচ বছর এক্সটেনশন দেয় তো আলাদা কথা। না দিলে দরবার করতেও যাবো না।

তাহলে তো কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে মোহিতদা—

নাঃ! হেনার এখনো পাঁচ বছর চাকরি আছে। চলি। অর্জুনদাকে বলো—মুষল আর্মির ওপর একখানা নতুন বই পেয়েছি। ডিসিপ্লিনের বাইরের লোকের লেখা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশ্বভারতীর মভার্ণ হিস্ট্রির হেড অব দ্য ডিপার্টমেণ্ট মিলিয়ে গেল।

সাইকেল কি মানুষের শরীরে একটা অঙ্গ? অন্ধকার পিচ রাস্তায় সিটে

বসে অরুণকিশোর ঠিক করতে পারছিল না—প্যাডেল দু'টো তার দুই পায়ের এক্সটেনশন কি না। একটু আগেই মোহিতদা এক্সটেনশনের কথা বলছিল। অন্ধকারে চালাবার সময় ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভেতরের ইঞ্জিনটাকে ঠাণ্ডা রাখে—অরুণকিশোরের মনে হয়। যেমন কিনা মোটরের ইঞ্জিন চলতে চলতে উল্টো দিকের বাতাসে ঠাণ্ডা থাকে।

বাড়ি ঢুকে অরুণ দেখল, তার বাবা অর্জুনকিশোর রীতিমতো যুদ্ধ করে দু' দুটো বেডিং বেঁধে ফেলে তার একটায় বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে।

অরুণকে দেখেই মা বলল, এই তো এসে গেছিস অরুণ। আমরা কাল সকালের ট্রেনেই কলকাতা যাবো।

কি ব্যাপার?

অর্জুনকিশোর বলল, ভুজঙ্গের ইচ্ছে আমরা এবার ওদের ভাগের দুর্গা পুজো দেখি।

অরুণ কোথাও যেতে পারার—কামরার জানলার সিটে বসে চলন্ত মাঠ পিছলে যেতে দেখলেই, আলাদা এক আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে ট্রেন যখন বর্ধমানে ঢুকল, তখন অরুণের মা বলল, ক'টা দিন চিড়িয়ার মোড়ের দিদির বাড়িতে কাটিয়ে গিয়ে অষ্টমীটা আমরা ভুজঙ্গ-বাবুর বাড়িতে থাকব।

কেশব সেন স্ট্রীটের দু'ধারে এখন ভয়ংকর কাজের জায়গা। লোহার পাইপ, বাতিল ইলেকট্রিক মোটর, আর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টেবিল ফ্যানের দু'নম্বরি ব্যবসায় ছয়লাপ। তার সঙ্গে অবিরাম ঢাকের কাঠি, কাঁসির কাঁই-না না—এরই ভেতর বাবা-মায়ের সঙ্গে অরুণ যখন মাধুরীদের দরজায় এসে দাঁড়াল, তখন বিনয়ে কুঁজো ভুজঙ্গ চৌধুরী আসতে আজ্ঞা হোক, আজ্ঞা হোক ঢংয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে চলল।

ঢুকতেই দোতলায় আগেকার জালি বারান্দায় অনেকদিন পরে মাধুরীকে দেখে অরুণ থমকে দাঁড়াল।

এ তো সে মাধুরী নয়। বড় বড় চোখ দুটোয় অনেক দিনের অনেক কথা—অথচ কোনো শব্দ নেই। দুই চোখই জলে ভরা, অরুণদা তুমি এত লম্বা হয়ে গেছ!

অরুণের মা একবার ওপরে তাকিয়ে তারপর ঘুরে একচালির দুর্গা প্রতিমায় নমস্কার করল।

দুপুর থেকেই মাধুরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জানতে চাইল।

পারিজাতদি কি শাড়ি ধরেছে? স্বস্তিধরদা রান্না-বান্নার পর বাঁশি বাজায়? প্রান্তিক থেকে ট্রেন বোলপুরে ঢোকার মুখে সেরকম গুম গুম আওয়াজ করে? রবীন্দ্রনাথ নাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বিশ্বভারতীর আকাশে একটা বড় পাখি হয়ে উড়ে বেড়ান?

অরুণ শুধু বলল, তুমি কতদিন বিছানায় শুয়ে মাধুরী?

তা সাত-আট মাস অরুণদা। আমার আর তোমাদের সঙ্গে পড়া হল না। আমার চিঠি পেয়েছিলে?

অরুণ মাথা নেড়ে অন্যমনস্ক হয়ে বলল, হুঁ। তোমার রোগটা কি?

তাতো জানি না। বাবা জানে। দেখো না, আমার চোখ কত হলদে।

সন্ধ্যের দিকে বেশি বেলার ভোগ খাওয়া আইঢাই শরীরে অরুণ এক ফাঁকে তার বাবাকে বলল, চলো এখান থেকে। আমার দম আটকে আসছে।

কি রে পাগল! বাড়ির পুজো—এসব তো আজকাল উঠে যাচ্ছে—ভালো করে দেখে নে—পরে আর দেখতেও পাবি না—

না, চলো! আমার আর ভালো লাগছে না।

পৃথিবীর কোনো গোপন বাক্স থেকে শীত গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছিল। তাতে লালমাটির শান্তিনিকেতন খুব ভোরের দিকে একদম যেন ঠাণ্ডার ডুমকা। জলে হাত দেওয়া যায় না। পৃথিবীটা কবে যে আবার চৈত্র-বৈশাখে ফিরে যাবে বোঝাই যায় না। এরই ভেতর ক্লাস ইলেভেনের অরুণকিশোর রায় মিছিল, ধরণা, ঘেরাও, মিটিংয়ে মিটিংয়ে একদম ঘেমে উঠল। দাবী একটাই, শশাঙ্কবাবুর দেখা খাতাগুলো রিভিউ করাতেই হবে। যাদের ফেল করানো হয়েছে, তারা কেউ ফেল হবার নয়।

একদিন এতো হৈ-চৈয়ের ভেতর অঙ্কের তুলসীবাবু বললেন—হ্যাঁ অরুণ—এতো আন্দোলনের পর তুমি কি আর গাইতে পারবে—আমাদের এই শান্তিনিকেতন?

অরুণ মনে মনে বলল, ন্যাকা চৈতন্য! মুখে বলল, কেন পারব না স্যার?

অর্জুনকিশোর তার ছেলেকে বলল, এসব করে নিজের পরকাল ঝরঝরে করে ফেলছ অরুণ।

তাই বলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না বাবা।

তাই বলে সব কাজ একাই ঘাড়ে নিতে হবে?

কাউকে তো নিতেই হত বাবা।

একবার এমন খবরও শোনা গেল, ভি. সি স্বয়ং পুলিশ দিয়ে অরুণকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দেবেন। হাতে তুলে দেবেন টি. সি।

ন' দিনের দিন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের বারান্দায় নোটিশ বোর্ডে অরুণদের রিভিউয়ের দাবী মেনে নিয়ে নোটিশ পড়ল। অরুণ যেন একজন বয়স্ক মানুষ। কত বড় একটা কাজ করে খালি গায়ে বসে নিজেরই জামা দিয়ে নিজেকে যেন হাওয়া করছে। আসলে সে তো ক্লাস ইলেভেনের সম্ভ গোঁফওঠা একজন কাঁচা কিশোর।

ঠিক সেই সময় ভারতী আর সুরশ্রী একদম কাছে এসে বলল, অরুণদা উঠে দাঁড়াও।

অরুণ বলল, বলই না। এই তো বেশ বসে আছি।

না, তোমায় দাঁড়াতে হবে।

কদিন শ্লোগান দিয়ে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের বারান্দায় শুয়ে থেকে থেকে কানে গলায় ঠাণ্ডাও লেগেছে, ধুলোও জমেছে। বলো, কি বলবে?

তোমায় পারিজাত ঘোষের অভিনন্দন।

কে পারিজাত?

তোমাদের সেই কোরাস গানের পুঁথি গো পুথি।

তা আলাদা করে কেন?—অরুণের একথা শেষও হয়েছে, আর ওমনি চোখের সামনে ছবির মতো লজ্জামাথানো আনন্দের হাসি ঢাকতে ঢাকতে শাড়ি পরা, উঁচু হিলের পারিজাত ঘোষ এসে হাজির।

অরুণের এই জয় বিজয় যেন একা পারিজাতেরই।

আচমকাই ঢং ঢং ঢং করে পাঁচ বার ঘণ্টা বাজল। বিশ্বভারতীর বাতাসে পর পর পাঁচটি ঘণ্টার এই ধ্বনি সবাই জানে। অরুণ হোস্টেলের স্টাডিতে মনিটরি করছিল, আর আসন্ন থিয়েটারের জুলিয়াস সিজারের পার্ট মনে মনে মুখস্থ করে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ই পর পর এই পাঁচটি ঘণ্টা। কে যেন অসুস্থ ছিলেন—কে যেন? ভাবতে ভাবতে অরুণ বাইরে এসে দেখল অন্তুদের সঙ্গে পারিজাত আর রিনিদিও ছুটে আসছে।

পারিজাত বলল, মাস্টারমশাই তো অসুস্থ ছিলেন।

রিনিদি বলল, আচার্য নন্দলাল বোধহয় গেলেন।

দূর থেকে যোহিতদাও ছুটে আসছিলেন। তাঁর পেছন পেছন অরুণ দেখল তার নিজের বাবাও আসছে।

মাস্টারমশাইয়ের ঘরের সামনে অনেকেই তখন হাজির। ওই ভিড়ে এক একবার পারিজাতের মুখ ভেসে উঠতেই অরুণের কেমন যেন লাগছিল। ওই মুখে তার জন্যে ইদানীং হাসি ভাসে—অভিমান ফোটে—আবার রাগ নয়তো আনন্দ গরমে ঘামের মতো আপনা আপনি বেরিয়েও আসে। অরুণ বলল, আমি রবীন্দ্রভবনে একখানা আশ্চর্য ছবি দেখেছিলাম জানো?

হালকা ছাপা শাড়ি পরা পারিজাত গলার নেক বোনটা একদিকে বেশি আগিয়ে ঘচ ক'রে ঘুরে তাকালো।

সেই চোখে অরুণ তালতোড়ের ধোপার দীঘির দুপুর বেলার এক স্লাইস পেয়ে গেল। আস্তে বলল, মাদ্রাজ না কোথায় যেন নন্দলাল সমুদ্রে চান করছেন—আর তার দুখানা স্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে একজন তীরে দাঁড়িয়ে। সে কে বলত?

আমি তো সে ছবি দেখি নি। আমি বলব কি করে?

ছবিখানা দেখে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম পারিজাত। সে ছবিতে নন্দলালের স্যাণ্ডেল হাতে হাসিমুখে তীরে দাঁড়িয়েছিলেন—স্বয়ং গান্ধীজী। ভাবতে পারো?

সত্যি?

ভিড়ের ভেতর আরও একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে, যার কোলে বছর চার পাঁচের একটি ছেলে। ওকে দেখেই চিনতে পারল অরুণ—আরে সরোজ যে—মনে মনে বলল, পূর্বপল্লীর গেস্ট হাউসের সেই সরোজ? তারও ছেলে! দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল!

এবারেই প্রথম ভি সি র পারমিশনে হোস্টেলে সরস্বতী পুজো।

ভোর রাতে কুয়াশার ভেতর চাদর মুড়ি দিয়ে প্রফেসার দ্বিজেন ঘোষের গেট টপকে ভেতরে যে ঢুকে পড়ল, সে আর কেউ নয়, খোদ অরুণকিশোর। পুজোয় ফুল চাই তো। আর এতো ফুল কোথায় পাবে অরুণ! গুঁড়ি মেরে মেরে অন্ধকারে চাদরের কোঁচড়ে কয়েকটা ফুল সবে তুলেছে, এমন সময় ঘেউ ঘেউ। আর তার পেছন পেছন হালকা চটি ছুটে আসার শব্দ। অরুণ ভেবেছিল ঘাপটি মেরে থেকে কোকো কাছে এলেই তার মুখে চাদর গুঁজে

দিয়ে ঘেউ ঘেউ একদম স্তব্ধ করে দেবে। করতেও গেল তাই।

কিন্তু কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। প্রথমে সপাং। তারপর সপ সপ। ব্যথায় অরুণের পিঠ যায় যায়। উঠে দাঁড়িয়ে তার এই ভূতগোছের চাদর ঢাকা মূর্তির ব্যাপার না সরিয়েই অরুণ এক দৌড়ে একদম গেটের বাইরে।

তখনও তার খুব চেনা একটা গলা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলছিল, রোজ রোজ ফুল চুরি করা?

অরুণ নিজের পরিচয় না দিয়েই দূরে অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে বুঝল, এ আর কেউ না—নির্ঘাৎ পারিজাত।

লুকিয়ে চুরিয়ে সে ঠিকই হোস্টেলে চলে এল। কিন্তু শেষ রাতের আলো-ফোটা বাতাসে তার চোখের সামনে বেত চালানো, রেগে ওঠা পারিজাতের মুখখানা একদম জলছবি হয়ে ভেসে থাকল।

সেদিনই সকালে 'মুক্তাহস্তে—চরাচর সারে', একরম কি সব বলে খালি পেটে অঞ্জলি দেবার সময়ও নিজেদের বাড়ির ফুলগুলোকে ছেঁড়া পাপড়ি দশায় দেখে সনাক্ত করতে পারল না পারিজাত। তাতে পুজোর পাণ্ডা হিসেবে অরুণ মনে মনে হাসছিল। কিন্তু কিছুতেই সে ছাপা জলছবিটা চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছিল না।

ক'দিন বাদেই কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে আসা হেলিকপটার থেকে প্রধান-মন্ত্রী নামতে না নামতে বুকে ব্যাচ লাগানো শ্রীঅরুণকিশোর রায় ভলান্টিয়ার সামনে এগিয়ে যেতে গিয়ে সিকিউরিটির হাতে আটকে গেল। ঠিক তখন সুরশ্রী আর অন্যদের সঙ্গে পারিজাতও প্রধানমন্ত্রীর কপালে চন্দনের টিপ পরাচ্ছিল।

আম্রকুঞ্জে ছাতিমপাতার অভিজ্ঞান বিলিবাট্টা হয়ে যাবার পরেই রিপোর্টাররা প্রধানমন্ত্রীকে ছেঁকে ধরল। অরুণ যতই কাছে এগিয়ে যেতে চায়, আর অন্যদের সঙ্গে পুলিশ তাদের ততই পিছনে হটিয়ে দেয়। এরই ভেতর সে দেখতে পেল, গলায় টাই এক রিপোর্টার দিব্যি পারিজাতের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

বেলা তিনটের পর অরুণ একা একা হাঁটতে হাঁটতে চোখের সামনের সেই জলছবিটা তাড়াবে বলে কোপাইয়ের দিকে চলে গেল। এখানে কেউ নেই। পৃথিবী তৈরী হওয়ার সময়কার ঢল নেমে যাওয়া কাঁদড়—আবার ডাঙা, তারপর আচমকাই নাবি! এখান থেকে ফাঁকা রেল লাইন যেন বা কারও খেলনা বলেই মনে হয়। এই বুঝি তার দম দেওয়া রেলগাড়িটা চলে আসবে।

আর তারপরই শুরু হয়ে যাবে ইঞ্জিনের সেই ঢিলে কলজের ভাঙা আওয়াজ। সঙ্গে নীলচে ধোঁয়া আর ঘট্টা ঘটং। সন্ধ্যের দিকে অরুণ সেন্ট্‌সি লাইব্রেরির সামনে দিয়ে ফিরে আসছিল। এমন সময় শীত শেষের ঠাণ্ডা অন্ধকারে পারিজাত বলে উঠল, এই তো অরুণদা! কোথায় ছিলে সারা দিন?

ও তুমি?

কি হয়েছে তোমার অরুণদা?

কিচ্ছু না।

না, কিছু হয়েছে। তুমি তো উত্তরায়ণে গেলে না।

যাবার কি আছে পারিজাত। সব প্রধানমন্ত্রীই এখানে এলে ওখানে ওঠেন।

তবু? এই প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের এক্স স্টুডেণ্ট।

অরুণ কিছু বলল না। দু'জনেই কিছু না বলে পিচ রাস্তার পাশের ঘাসে পাশাপাশি বসে পড়ল।

জানো অরুণদা, আজ একজন রিপোর্টার আমায় দেখে খুব উদ্বেলিত হয়ে গিয়েছিলেন।

অরুণের চেনা পাথরে কোথায় যেন কালশিটে পড়ল। সে কথা বলতে চাইল—যেন এসবে তার কোনো আগ্রহ নেই—কিন্তু গলায় ফুটে উঠল অভিমান। চাপা হেসে অরুণ বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছিলাম।

আমার ঠিকানা নিলেন। বেলা তিনটের সময় আমাদের ক'জনকে ট্যুরিস্ট-লজে চা খেতেও ডেকেছিলেন।

গিয়েছিলে?

হুঁ। গিয়ে বুঝলাম আসলে শুধু আমার সঙ্গেই উনি বসে বসে চা খেতে চাইছিলেন।

কি করলে?

খেলাম। চায়ের সঙ্গে ছিল চিকেন পকোড়া। উনি আমার ঠিকানা নিলেন। বললেন, চিঠি লিখবেন। নামটা বেশ, শোভন বোস, স্টেটসম্যানের ঝানু রিপোর্টার।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অরুণ বলল, তোমাদের বাগানে অনেক ফুল হয়।

আমি আর দিদি সারা বছর বাগান করি। দাদু থাকতে ঝারিতে করে তিনিই জল দিতেন।

তাঁর আর কোন খোঁজ পেলে ?

নাঃ। হয়ত কোথাও মারা গেছেন। কিংবা কোথাও পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটা লোক কোনোদিন আর ফিরবে না। চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল।

অন্ধকারে পারিজাতের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সে বলল, হয়ত তাই। বড ডালিয়া ফুটলে দাদু রাত জেগে যেন ফুল ফোটা দেখত। বাবার বাগানটারও সেই স্বাদে পাহারা হয়ে যেত।

অরুণ বলল, আমিও একদিন কোথাও মিলিয়ে যাবো।

অরুণের হাত ধরে ফেলল পারিজাত, ওকথা বলছ কেন ?

আমি পারিজাত এক একদিন এক একটা রঙিন স্বপ্ন দেখি। তোমার সবুজ রঙের দাদু আর আমি এই অরুণকিশোর রায়—বেগুনি রঙের যেন দুই অতিকায় প্রজাপতি তালতোড়ের দীঘির জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে অভয়ারণ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেখে হরিণগুলোর পর্যন্ত চোখে বিষাদ জমেছে।

কি সব বাজে বকছ অরুণদা।

একদম অন্য জায়গা থেকে অরুণ শুরু করল, সরস্বতী পুজোর আগের রাতে তোমাদের ফুল চুরি হয় না ?

দাদু থাকতে সম্ভব ছিল না, শুধু এবারেই একটা ভুতের মতো মানুষ আমার তাড়া খেয়ে একদম গেট টপকে দৌড়ে পালিয়েছে।

সে ছিলাম আমি। আর তোমার হাতে বোধ হয় কোকোকে ঠ্যাঙাবার বেতখানা ছিল—

তুমি ? তারপর পারিজাত আর কোনো কথা বলতে পারল না। তার দুই ভিজে চোখ আর হু হু করে উঠে আস কান্না অরুণের পিঠে চেপে ধরে পারিজাত থরথর করে কেঁপে উঠল, আমি তোমায় মেরেছিলাম—আমি তোমায় মেরেছিলাম—

অনেকক্ষণ চুপচাপ। অরুণ বলল, আমি তোমার সে মুখ কোনোদিন ভুলব না পারিজাত। আমার মনের ভেতর বিঁধে আছে। আর একটা কথা বলি, তোমাকে দেখে অনেকেই চঞ্চল হবে। আমি তোমায় অনেকদিন দেখছি বলে চঞ্চল হই নি। কিন্তু আমার যে কি হয়েছে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে এই আনন্দে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে আপনা আপনি ঢেউ উঠে আসে বুকে।

পারিজাত কোনো কথা না বলে অরুণের পিঠে তার চোখ বোধহয় আরও চেপে ধরেছিল—অরুণ টের পেল ওর পিঠ ভিজে যাচ্ছে।

অরুণ বলল, চলো উঠি। তোমায় এগিয়ে দেব।

কোন দরকার নেই। বলে পারিজাত লম্ব বড় হয়ে ওঠা অরুণকিশোরের বুকে নিজের মাথাটা এমন করেই রাখল, যাতে কিনা ফুলেল-গন্ধভরা নরম চুল বাতাসে তার নাকের নীচে চলে আসে।

সে আস্তে বলল, পারিজাত, এখন তো আমাদের কলেজ! আমরা বোধ হয় বড় হয়ে যাচ্ছি। আমরা বোধ হয় পাল্টে যাচ্ছি।

অন্ধকারেও পারিজাত হেসে ফেলল, সে তো বুঝি, যখন দেখি সুরশ্রী তোমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

অরুণ লজ্জা পেয়ে বলল, তাই নাকি! যাঃ!

উল্টোরথের আগের দিন অর্জুনকিশোর বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলেন। ভুজঙ্গ চৌধুরীর চিঠি। ২৯শে আষাঢ় মাধুরীর বিয়ে। সেই একই সময়ে হোস্টেলের ঠিকানায় অরুণ পেল মাধুরীর চিঠি—

অরুণদা, তোমার সঙ্গে সেই পুজো দেখার অষ্টমী বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা। আমার বিয়ে হলে আসানসোল চলে যাবো। তোমরা এখন কলেজে পড়। ক্লাশের জানলার বাইরে বৃষ্টি পড়তে দেখলে আমার কথা মনে রেখো।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্টাডি থেকে বেরোবার মুখে অরুণ দেখলো করিডরে দূরে সুরশ্রী আর কয়েকজনের সঙ্গে একখানা লম্বা কাগজ নিয়ে পারিজাত লজ্জা লজ্জা মুখে কি যেন বলছে।

তক্ষুনি তার জানতে ইচ্ছে করছিল, ওখানা কিসের কাগজ? হাতে তার মাধুরীর বাঁকা বাঁকা লাইনে লেখা চিঠি। অরুণ তাই করিডর দিয়ে অচেনা লোকের মতই হেঁটে যাচ্ছিল।

একই দিনে সুন্দর ব্যাঙ্ক পেপারে পারিজাতও একখানা চিঠি পেয়েছে। টানা তিন পৃষ্ঠার চিঠি। পরিষ্কার, স্পষ্ট ভাষায় লেখা। নীচে নাম সই শোভন বসু।

অনেকবার পড়া চিঠিখানা নিয়ে পারিজাত একা একা হাঁটতে হাঁটতে বিজু বিরামে এসে হাজির। চাতালে বসে চিঠিখানা আবার মেলে ধরল পারিজাত। ফিনফিনে বাতাসে চিঠির কাগজ পত পত করে উঠল। শুরুটা এমন—

পারিজাত-কুসুম,

আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে সেদিন সারাটা দুপুর আর বিকেলে ফুল্লকুসুম হয়ে তুমি দেখা দিয়েছিলে। আমি বিবাহিত। যদি পঁচিশ বছর আগে দেখা হত (তখন তুমি জন্মাওনি) তাহলে অগ্নিকাণ্ড হত নির্ঘাৎ।

এখনই বা কম কি! তোমাকে দেখার পর আমার প্রেসে পাঠানো কপি-গুলোর ভাষা কেমন যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। আমি তোমায় আর দেখতে পাবো? তোমার সঙ্গে আমি কি আর কথা বলতে পারব?

চিঠিখানা ভাঁজ করে পাউডারে মাখামাখি বুকের ভেতর গুঁজে ফেলল পারিজাত।

আজ আবার ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে সেমিনার। হল ভর্তি। পেছনের দরজা দিয়ে পেছনের বেঞ্চে বসতে বসতে পারিজাত দেখল ডায়াসে চেয়ারে বসে মোহিত স্যার, আর তার পাশে টেবিলে আনাড়ি ডান হাতখানা চেপে রেখে ক্ষুদে ঔরঙ্গজেব দাঁড়ানো। তার সঙ্গে মাখামাখি হবার পর থেকে বোধ হয় একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে অরুণ চিবুকে বেশ খানিকটা দাড়ি রেখেছে।

বোধ হয় চোখা চোখা কথাই বলছিল অরুণ। কিন্তু কিছুই কানে যাচ্ছিল না পারিজাতের। এক এক সময় মনে হচ্ছিল, এই বুঝি শোভন বসু গঁদের আঠা দিয়ে দাড়ি লাগিয়ে ঔরঙ্গজেবের কথা বলে যাচ্ছে।

পারিজাতের চোখে চোখ পড়তে অরুণের মুখের গড়গড়ানো সেণ্টেন্স আর লম্বা লম্বা রেফারেন্স এক পলকে মিলিয়ে গেল। অরুণের তক্ষুনি ডায়াসে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল, ঔরঙ্গজেব সম্রাট হবার পর কোনোদিন প্রেমে পড়েন নি! একবারই প্রেমে পড়েছিলেন—ঔরঙ্গজেব তখন যুবরাজ—তার মেসোর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক বিদেশিনী বাঁদীর।

যুক্তি গুলিয়ে যাওয়া, আর মনের মধ্যে সারাটা ইতিহাস মেঘ হয়ে ঘনিয়ে আসায় সবই অরুণকে একদম জবুথবু করে ফেলল। সে কোনোক্রমে যা মনে ছিল, তাই বলে দিয়ে নীচে নেমে এল।

পৃথিবীটাতো রঙ দিয়ে ছাপানো কোনো এ্যাটলাসের পাতা নয় যে একই সঙ্গে মিসিসিপি থেকে গঙ্গা অব্দি দেখা যাবে। এ্যাটলাসের পাতার বাইরে এই দুনিয়ায় যে যার নিজের মতো বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বৃষ্টি ভেজা একটা ট্রেন নতুন বরের সঙ্গে মাধুরীকে নিয়ে আসানসোল চলে গেল। জীবনে

সব কিছু মনে রাখাও বড় কঠিন। আর সব কিছু একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া তো আরও কঠিন। তাই অরুণ যখন ভাবে—পারিজাত কি করে একটা অচেনা রিপোর্টারের সঙ্গে অত হেসে ঢলে কথা বলে—পারিজাত তখন ভাবে না জানি আমার কণ্ঠস্বর পূর্ণ পুরুষের বুকে ঝর্ণার জল হয়ে গড়ায়? আর মনহীন জনশূন্য ধুলোর গুড়ো কিভাবেই না বিশ্বভারতীর জগতের স্মৃতিবিস্মৃতিকে একই সঙ্গে ঢেকে ফেলার ষড়যন্ত্র করে।

ক'দিন বাদে প্রান্তিকের শূন্য প্ল্যাটফর্মে ভোরবেলা মেঘ চোবানো আলোয় অরুণ যখন পায়চারি করে অস্থির হয়ে ফিরে আসছিল, তখনই প্ল্যাটফর্মের শেষে পারিজাত ভেসে উঠল। অরুণ বলল, এত দেরি?

বাবার চোখ এড়িয়ে এত ভোরে একটা আসা যায়?

অরুণ শক্ত করে পারিজাতের হাতখানা ধরল। আমি আর তুমি এখান থেকে যে ট্রেন আসবে তাতেই চলে যাবো।

হাত ছাড়ো। লাগছে। পাগলামি কোরো না।

আমার পাগলামি না করে উপায় নেই পারিজাত। আমি জানি দেরি করলে আমি তোমায় হারাবো।

পিরিচভাঙা হাসি হেসে পারিজাত বলল, এসব কি ওভাবে হয়। তুমি পড়াশুনো শেষ কর—আর আমি এখনই অত ভাবছি না।

এ কথায় অরুণ আহত, অপমানিত বোধ করল। কিন্তু এ যে এক কঠিন সম্যা যে পাথরের ভেতরে কষ্ট আর ভালোবাসা একই সঙ্গে গোপনে শেকড় চালিয়ে দেয় তাই দু'জনেই চুপচাপ প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে থাকল।

বাড়িতে অরুণের জন্যে একদম উল্টো এক অবস্থা ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল।

বেশ রোদ উঠতে বাড়ি ফিরে বারান্দাতেই দেখল অঘোর ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। আর মোহিতদা কোত্থেকে সাইকেলে বন বন করে ছুটে আসছেন।—এই তো অরুণ, তোমাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। অর্জুনদা বাথরুমে পড়ে গেছেন।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব সরল। মাথার পেছনে অর্জুনকিশোর রায়ের গোটা দু-তিন শিরের ডগা প্রমাণ রক্ত পথ হারিয়ে গিয়ে ঘিলুতে এলোমেলো জট পাকাচ্ছিল। এরই নাম সেরিব্রাল। ওরফে সন্ন্যাস। রাত বারোটা নাগাদ লোকাল হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সে বাবা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের সরোজকে নিয়ে অরুণকিশোর রায় কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

পরদিন অরুণের মা বিধবা হলেন পি. জি. হাসপাতালের বারান্দায়।

ঘাটের কাজ সেরে অরুণরা যখন রিক্সা থেকে শান্তিনিকেতনে নামল, তখন ঝাঁক ঝাঁক বৃষ্টি এসে বিশ্বভারতীর নুড়ি ভরা মাটিকে কিছুতেই কাদা করতে পারছিল না। এর মধ্যেও অরুণের মনে পড়ল, এ্যাম্বুলেন্সে উঠবার সময় সে যেন অত রাতেও দেখেছিল মিনিদির সঙ্গে পারিজাত এসে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে।

অর্জুনকিশোর রায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তিতে মন্ত্র পড়ল মোহিত দত্ত, আর হেনাদির গলায় সম্মুখে শান্তি পারাবার –।

নিজের বসার ঘরে প্রফেসর দ্বিজেন ঘোষ জানতে চাইল অরুণ, চতুরঙ্গ তোমার কেমন লাগে?

এটা রবীন্দ্রনাথের একেবারে অন্যরকম লেখা।

শচী বিলাস? দামিনী?

অমন চরিত্র রবি ঠাকুর আর আঁকেন নি।

দ্বিজেন ঘোষ জানতে চাইল, এবার তুমি কি করবে?

আগে গ্র্যাজুয়েট তো হই।

ফার্স্ট ক্লাস অনার্স থাকবে?

কি জানি!

তারপর কমপিটিটিভে বসতে পারো।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জানলা দিয়ে সামনের রাস্তা দেখা যায়। সেখানে একটা ঝকঝকে এ্যাম-বাসাডার এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় পারিজাত এসে সবে চায়ের ট্রে রেখেছে টিপয়ে। আলমারি ভর্তি সেক্সপিয়ারের নানান এডিসন। অরুণও এই সময় বলতে যাচ্ছিল, বাবার ইচ্ছে ছিল আমি এম এ পড়ি। ঠিক তখনই গাড়ির চেয়েও ঝকঝকে শোভন বসু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। এসেই সিধে একদম বারান্দায়। তারপর বসার ঘরে।

আমি শোভন বসু। আপনি ত প্রফেসর ঘোষ?

এই কথার ভেতরেই পারিজাত ছুটে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এলো পাটভাঙা নতুন ছাপা শাড়ি পরে। মাথাটা ভালো করে আঁচড়ানো।

নিজেকে বেশ অধিকন্ত লাগায় অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পরে আসব।

উঠোন দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে হল তার এবাড়িতে কি আমার আবাহন বিদায়, দুই-ই শেষ হয়ে গেছে ?

শোভন বোসের সঙ্গে দ্বিজেন ঘোষের ততক্ষণে রীতিমতো কাজের কথা হচ্ছিল। দ্বিজেন ঘোষ বলছিল, ছেলে তো কলকাতায় কলেজ সারভিস কমিশনে ইণ্টারভিউ দিয়ে প্যানেলে নাম তুলতে পেরেছে। এখন কোন কলেজে চাকরি হবে কে জানে ?

যদি বলেন আমি খোঁজ নিতে পারি।

নাঃ, দরকার হবে না। তার চেয়ে বরং আমার কয়েক টন সিমেণ্ট হলে সুবিধে হবে।

সিমেণ্ট দিয়ে কি করবেন ?

এটা তো বিশ্বভারতীর কোয়ার্টার। আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরে বাড়ি শুরু করে থেমে আছি।

যদি আপত্তি না থাকে, আমি চেষ্টা করতে পারি। পেয়েও যাবেন বলতে পারি।

একটা জরদা পান মুখে দিয়ে রিনি ওদের মা শক্তি সামনে এসে দাঁড়াল, আমার বড় মেয়েরও চাকরি হয়ে গেছে, কিন্তু এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আসেনি।

পারিজাতের পাশে দাঁড়ানো রিনি তার মাকে বাধা দিতে গিয়ে বলল, এসব কি বলছ মা ? সময় হলেই আসবে। সাব ইন্সপেকটর অফ স্কুলস প্যানেলে আমার নাম তিন নম্বর। উনি হয়ত কাগজের কাজে টুরিস্ট লজে এসে উঠেছেন।

শোভন বোস হেসে বলল, ঠিকই ধরেছেন। ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরে এসেছি। ওটা লজেরই ভাড়া করা গাড়ি—বলেই শোভন দ্বিজেনকে বলল, চলুন আপনার বাড়িটা দেখে আসি। আর সেই একই সঙ্গে রিনিকে বলল, আপনার প্যানেলের একটা কপি আমায় দেবেন ?

রিনি আরও গুটিয়ে গেল, না না, সে সব পরে হবে। আপনি বরং পারিজাতের সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসুন।

চলন্ত গাড়ির পেছনের সিটে বসে শোভন বসু পারিজাতের হাতের আঙুল ধরে বলল, এই তো তোমায় ছুঁয়েছি। দেখতেও পাচ্ছি।

পারিজাত তখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। শোভন হাত টানতেই মুখ ফেরাল।

একি ? তোমার চোখে জল !

পারিজাত কোনো রকমে বলতে পারল, এত ছলছুতোর কি দরকার ছিল ?

আমার যে পঞ্চাশ পারিজাত।

বেশি রাতে সুষ্টিধরের বাঁশির আওয়াজ চীনভবন, কলাভবন ছাড়িয়ে বোলপুরের দিকে ভেসে যাচ্ছিল। কে জানে এরই নাম পিলু না তিলকামোদ ?

সারা বিশ্বভারতী ঘুমিয়ে। দরজা খুলেই ঘুমোচ্ছিল দুই বোন। পায়ে কিসের টান লাগাতে পারিজাত উঠে বসে চীৎকার করতে যাচ্ছিল। তার আগেই অরুণ তার মুখ চেপে ধরল। খুব চাপা গলায় অরুণ বলল, বাইরে এসো। কথা আছে।

কেন ? কিসের ?

অরুণ আর একটা কথাও বলতে দিল না পারিজাতকে। হিড হিড় করে টেনে উঠোনের শিউলিতলায়।

ছাড়ো, বলছি। কোকো জেগে উঠবে।

কোকো এদিকে নেই। তাকে অনেক আগেই পাঁউরুটি দিয়ে রতনকুঠি পার করে দিয়ে এসেছি।

একি অসভ্যতা ! আমি চ্যাচাব এবার।

একটি চড় মারব পারিজাত। তুমি কাকে ভালবাস ?

ছাড়ো। আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দেব না। আমার যা ইচ্ছে তাই করব। কত বড় সাহস—ঘরে ঢুকে টেনে আনা ! আমি তোমার কি করি দেখো এবার।—বলতে বলতে সিঁড়ির ওপরে এক ধাপ উঠে যেটে জ্যোৎস্নার ভেতর অন্ধকারে ঝরা সাদা শিউলিতে দু'বার থুতু ফেলল পারিজাত, আমি কি তোমার সম্পত্তি ? আমি কি তোমার বাইসাইকেল ?

চ্যাচানো যাবে না। মারলে পারিজাত মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে যাবে। এ এমন একটা দশা, যে অবস্থায় অরুণ দেখল সে না পারছে ভিক্ষুক হতে—না পারছে দস্যু হতে। একদম অসহায় গলায় সে পরিষ্কার বলল, তা হলে তুমি মিথ্যে মিথ্যে আমায় নামালে কেন ? ডাকলে কেন ?

ঘরের ভেতর চলে যেতে যেতে চাপা রাগে বিষমেশানো গলায় পারিজাত খুব ছোট্ট করে বলল, আমি কাউকে নামাই নি। আমি কাউকে ডাকি নি। না ডাকতেই পারিজাত ঘোষের কাছে অনেকে আসে।

অরুণের একবার মনে হলো পারিজাত এর ভেতরে আবছা করে কে যেন বিষের হাসি হাসল।

নিশুতি রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে খেলার মাঠের দিকে যেতে যেতে অরুণের

অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পড়ল। এই মাঠেই রুকমাবাই সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল মেলায়। অনেক হাতি অনেক ঘোড়া এসেছিল। একটা ট্রেনড ঘোড়া আলোর নীচে পেছল, সুঠাম শরীর নিয়ে যেন ঝকঝক করছিল। কেশরে স্তব্ধগতি। মুখের ফেনায় নিশ্চুপ ত্রেষা। দুই দাবনায় যে কোনো মুহূর্তে ছুটন্ত ভঙ্গীর জলছবি পড়তে পারে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝেই মেরুদণ্ডের পেশী কুঁচকে নিয়ে থরথর করে শিথিল করে দিচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে আলোয় সে পিঠের চামড়ায় ম্যাজেন্টা থেকে গোলাপি, সব রকমের রঙ ফেলে যাচ্ছিল। একেই কি বলে রূপ? একেই কি বলে গর্ব? দুটো মিলে গিয়ে যেন এই নিশুতি রাতে অরুণকিশোর রায় খানিক আগে কি রকমের এক জাস্তব অহং-কারের মুখোমুখি হয়ে গেছিল।

দিনক্ষণ না দেখেই মানুষ আশা করে। আশা একদিন স্বপ্ন হয়ে আকাঙ্ক্ষা হয়। পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের এ্যাটেনডেন্ট সরোজ খুব ভোর ভোর ভি. সি'র বাড়ির দিকে চলেছে! তার বড় ইচ্ছে ছেলেকে পাঠভবনে পড়ায়। এই সময় দশাশই ভি. সি হাঁটতে বেরোন।

ঠিক সেই সময়েই পুরী প্যাসেঞ্জার পাঁশকুড়া ছাড়ালো। হাওড়া পৌঁছতে পৌঁছতে আলো ফুটে যাবে। ভুজঙ্গ চৌধুরী মিনতিকে বলল, মাধু ঘুমোচ্ছে, মাথার কাছের কাচটা নামিয়ে দাও। আমি একটু বাথরুমে ঘুরে আসি।

শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়েকে আনিয়ে নিয়ে সস্ত্রীক সকন্যা ভুজঙ্গের এই প্রথম পুরী ভ্রমণ, সমুদ্র দর্শন।

উল্টোদিকের খোলা জানলায় রাতজাগা চোখে ভোরের বাতাস মাখাবার জন্য কতক্ষণ যে মিনতি বসে ছিল তার মনে নেই। এক প্যাসেঞ্জারের চিৎকারে মিনতি ঘুরে তাকাল।

আপনাদের কে বাথরুমে গিয়েছিলেন? শিগগীরই যান, শিগগীরই যান।

মিনতি ঠিক বুঝতে পারল না, সে কি করবে। শেষ রাতে রেল কামরার বাথরুমে মাধুরীর বাপের কি-ই বা হতে পারে? দু'জন মহিলা উঠে এসে তার দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ অব্দি মিনতিকে উঠতেই হলো। মাধুরি তখনও ঘুমিয়ে। বাথরুমের খোলা দরজাটা চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে একদম হাট করে খোলা।

সিস্টামের ওপরের আংটায় নিজের ধুতির কোঁচায় ভুজঙ্গ চৌধুরী ঝুলছে। একটা পা উরু অব্দি বেরিয়ে। ফর্সা, সরু। ইদানীং তার স্বামী অনেক জায়গাতেই পেমেন্ট পায় নি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই ভাড়াটে কালোয়ারদের হুণ্ডির শাসানি শুনতে হত।

নিজের সিটে ফিরে এসে মেয়েকে জাগাল মিনতি।—ও মাধু, ওঠ মা!

ট্রেন বোধ হয় রামরাজাতলা ছাড়ালো।

প্রিয় সুদীপদা,

আমি ১১ই মার্চ মেদিনীপুরে চাকরিতে জয়েন করব। যা হোক একটা থাকার জায়গা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আশা করি তুমি ভালো আছ। আমাদের ভাই কলকাতার কলেজে চাকরিও পেয়ে যাবে। একদিন বিয়েও করবে। শুনছি তার ক্লাস ফ্রেণ্ডের বোনকে। বাড়িতে এখন শুধু পুষি। আর তিন চার বছরের ভেতর ও নিশ্চয়ই কোনো কলেজে কাজ পাবে। আমার চেয়ে ছাত্রী তো অনেক ভালো। বাবা বাড়ি করায় মেতে আছেন। আজ লিনটেল, কাল স্টোনচিপের কথা বলছেন। ডাকঘরে ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাচ্ছেন। বাড়িতে কেউ বলছে না কিন্তু—রিনি তোর বিয়ে। আমি খুব ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো।

চিঠিখানা খামে ভরে ঠোঁট দিয়ে মুড়ে দিল। তখন গেট খুলে পারিজাত ঢুকছিল, পেছন পেছন শোভন বসু। গায়ে কাডিগান, মুখে কলগেট হাসি। নাকের ওপর বোধ হয় সফল সম্পন্ন লোকের বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখন তো শীত যায় নি।

পারিজাত তখন বলছিল, এবার কোন্ ছুতোয় তুমি এলে এখানে?

একদম ছুটি নিয়ে। আমি একদম ইনকগনিটো থাকতে চাই। তাই গাড়িও ভাড়া নিই নি।

ওরা দু'জন বারান্দায় উঠে পড়ার আগে হাতের চিঠিখানা রিনি আঁচলে লুকিয়ে ফেলল।

পিচকুড়ির চাল, থানা, গুলকরা, তালিত ছাড়িয়ে ট্রেন বর্ধমান ধরো ধরো। বিমলা বলল, তুই কি এখন আমায় নিয়ে চিড়িয়ামোড়ে চললি? সেখানে কি পড়ার জায়গা পাবি?

অরুণ বলল, আর তো দু তিন মাস। ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তারপর গ্র্যাজুয়েট হয়েই—রেজাল্ট কি হবে জানি না। মা—একটা কিছু চাকরি ঠিক জুটিয়ে নেব।

রেজাল্ট ভালো করতে কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাড়িতেই তোর পড়াশুনোর জায়গা ছিল বেশি।

ও জায়গা আর আমার ভালো লাগে না।

তোর বাবার ইচ্ছে ছিল তুই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাস।

সব ইচ্ছে কি হয় মা?

কাগজের খবর টাকার দাম ভীষণ পড়ে গেছে। আর এবার নাকি আমে বান ডাকবে। পথে ল্যাংড়ার খোসা, আঁটি, সারাটা কলেজ ষ্ট্রীট ধুলো আর জলের বসন্তমালতী মেখে বসে আছে।

অরুণ এক এক দোকানের শো-কেসের বইগুলোর দিকে জুল জুল তাকাচ্ছিল। যেন কাচের ওপিঠে বাবড়ি, কালাকাঁদ সাজানো। পৃথিবীতে কত বই! কুবের পড়ুয়া হলে হয়ত দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞান এক চেকে কিনে নিয়ে নিজের বাড়ির বারান্দায় চলে আসত। ইতিহাসটা আসলে মন দিয়ে পড়া দরকার। তার ভেতরই কত যে উপন্যাস, কত যে নাটক, কত যে কবিতা অবহেলায় ভরা আছে।

হাঁটতে হাঁটতে দৈনিক দিনকালের অফিসে এসে হাজির। সে এখন অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং ফার্স্ট ক্লাশ। বিশ্বভারতীর। মোহিতদা বলেছিল, অরুণ এম. এ-টা করো। তারপর কলেজে কাজ করতে করতে থিসিস করবে। দেখবে সামনের সারাটা জীবন তোমার পায়ের সামনে গড়িয়ে খুলে দেওয়া কার্পেট।

অরুণ শুধু বলেছে, দেখি মোহিতদা। আর মনে মনে বলেছে, বাবা অনেক আগেই রিটায়ার নিয়ে কমপেনসেসনের জমানো টাকা ভাঙতে ভাঙতে এগোচ্ছিল। হয়ত অঙ্ক কষেই ঠিক সময়ে মারা গেছে। নয়তো আয়ুর আগে টাকা ফুরোলে কি বিচ্ছিরিই কাণ্ড!

ভাবল ওখানে সে একটা চাকরি চাইবে। কিন্তু কে দেবে? এখানে কাউকে অরুণ চেনে না। ভিজিটার্সদের সোফায় বসে সে আজকের কাগজখানা মেলে ধরল। দুয়ের পাতাটাই আজকাল তার কাছে রবিবারের ম্যাগাজিন

সেকশন। রাজ্য সরকার ফিল্ড অফিসার চাইছে। চাই অর্গানাইজেশনাল এবিলিটি। আরও যেন কি কি।

শীতের গোড়ায় বাবার সোয়েটারটা গায়ে অরুণ বাটার শো-কেসে দেখল তার চেহারার প্রতিচ্ছায়া। অর্জ্জুনকিশোর রায়ের চেয়ে বেঁটে। কি মনে হওয়াতে সে কেশব সেন স্ট্রীট ধরে রাজাবাজারের দিকে চলল। আজ তার সেই ফিল্ড অফিসারের ইণ্টারভিউ ছিল। কোত্থেকে ছ ছ'টা মাস কেটে গেছে।—আরে এই তো ভুজঙ্গবাবুদের বাড়ি। সিধে ভেতরে গিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ল্যান্ডিংয়ে মিনতির সঙ্গে দেখা। সরু পাড় শাড়ি, হাতে শাঁখা নেই।

অরুণ বলল, সব শুনেছি মাসিমা।

ওপরে এসো বাবা।

মাধুরী কোথায় মাসিমা? শ্বশুরবাড়ি?

না, ওতো এখানেই। যাও, ভেতরে যাও। বোধ হয় রেকর্ড বাজিয়ে গান শুনছে।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল অরুণ। আগেকার সেকেলে একখানা ফার্নিচার ও নেই। তার বদলে নতুন নতুন সোফা, নীচু পালঙ্ক, মেঝে জুড়ে পারসিয়ান কার্পেট।

অরুণদা, তুমি?

উঠে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারে বেগম আখতারকে থামাল মাধুরী।

অরুণ কথা বলবে কি, সে মাধুরী আর এ মাধুরীতো অন্য লোক। মাধুরীর মুখে, শরীরে সেই করুণ, অসুস্থ, বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে কিছু-কাল আগে ওর বাবা শেষ রাতের ট্রেনের বাথরুমে সুইসাইড করেছে। গাল রক্তে ফেটে পড়ছে, চোখে চমক, পরণে শাড়িটাও রীতিমতো দামী। পায়ে বোধ হয় ভেলভেটের চটি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলে?

আসানসোল তো অরুণদা! আমি আর ওখানে যাই না।

অরুণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মানে?

সে তুমি জানতে চেও না। আমার স্বামীটি একটি রত্ন।

তা তোমাদের চলছে কি করে?

হো হো করে হেসে উঠল মাধুরী।

সে খোঁজে তোমার দরকার কী? এসেছ, বোসো। কি খাবে বলো।

আজ চাকরির পরীক্ষার ইনটারভিউটা তার ভালোই হয়েছে। হেঁটে হেঁটে আসতে আসতে খিদেও পেয়েছিল। কিন্তু সে তো এখানে খেতে আসে নি। চেনা বাড়ি বলে আচমকাই ঢুকে পড়েছে।

দাঁড়িয়ে উঠে মাধুরী বলল, তোমরা, পুরুষরা তো মাংস টাংস খেতে ভালোবাসো। ফ্রিজেই আছে। বল তো কাবাব ভেজে দিতে পারি।

না না, কোনো দরকার নেই।

এই দ্যাখো না পাশেই আমার ছোট রান্নাঘর।

অরুণ ঘুরে তাকাল। সেই পুরণো বাড়ি ভেঙে চুরে সেখানে একদম আনকোরা দামী সব রান্নাবান্নার ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি।

ছ্যাকছোঁক করে মাধুরী সত্যি ভেজে আনল চারটে কাবাব। সঙ্গে শশা টমেটো।

অরুণ খাবে কি। তার মনে হচ্ছিল সে ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

সবে একটা কাবাব তার শেষ হয়েছে, মাধুরী বলল, তোমার তো এখন এম. এ পড়ার কথা।

অরুণ হেসে বলল, কথা তো অনেক কিছুই ছিল, কটা আর সম্ভব হলো? তা তুমি?

মাধুরী সামান্য হেসে বলল, আমি তো! মা আলাদা থাকেন। আমি এদিকটায় আছি। আমাদের ভাড়াটে নন্দ কালোয়ারের বড় ছেলে আমায় এখন দেখাশোনা করে। কি, কথাটা পছন্দ হলো না অরুণদা?

অরুণ ঠক করে প্লেটটা টেবিলে রাখল। জলের গ্লাসটা হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে তার নিজেরই হাত কেঁপে উঠল।

ভুবন বড় ভালো ছেলে। আসানসোলের মতো মারধোর খেতে হয় না। বাংলা গান খুব ভালোবাসে। আমিও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে শোনাই। অবিশ্যি নাচতে বলে নি কোনোদিন এখনও।

অরুণ উঠে দাঁড়ালো। তাঁর ঠোঁট কি বলার জন্যে যেন বিড় বিড় করছিল।

বসা অবস্থাতেই মাধুরী বলল, আমি পড়াশুনোয় তো তোমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লাম। অসুখও আমাকে ছাড়ল না। বাবার অর্ডার সাপ্লাই ও ভালো চলে নি। কেন যে তখন বাবা আমার বিয়ে দিতে গেল।

আমি আজ আসি মাধুরী।

যাবে ? আচ্ছা—

মেদিনীপুর শহর থেকে খড়্গপুরের বাস রুটে মাঝামাঝি জায়গায় নেমে পড়ল রিনি। নতুন সাব-ইন্সপেকটর অফ স্কুল। পাঁচ টাকায় সাইকেল রিক্সার সঙ্গে রফা করে চলল সাহসগ্রাম। যা কিনা রিক্সাওয়ালার মুখে সাহস গাঁ। সেখানেই নাকি কোনোকালে একটা নদীও ছিল। ছিল নদীর ঘাট, এখন জল নেই। আছে ভাঙা ধাপ। তার পোয়াটাকের ভেতরে সাহসপুর সেকেণ্ডারি ইস্কুল।

রিনি রিক্সায় বসে মনে মনে ঠিক করে নিল রিক্সাভাড়ার টি এ বিলটা কিভাবে করতে হবে। তখনই তার চোখে পড়ল গাঁয়ের খুব গরীব এক বহুরূপী পাউডার আর রঙের অভাবে শুধু ছাই মেখে গামছা পরে মাঠের ভেতর দিয়ে শিব ঠাকুর হয়ে চলেছে। পরিষ্কার আকাশে কলাইকুণ্ডা থেকে একটা প্লেন উঠল। তার মনে পড়ল আমার এক ভাই আছে। সে কলকাতায় অধ্যাপক। মাকে বলেছে তার বন্ধুর কোনো বোনকে মনে ধরেছে। পুবির সামনে এম এ পরীক্ষা। দু'ধারে ধানকাটা মাঠ। একটা বড় হিমঘর বোধহয় তৈরী হচ্ছে। তারই ছায়া আল টপকে টপকে প্রায় রাস্তায় এসে ঠেকেছে। আর সেই রাস্তা দিয়ে আমি এখন দু'ধারের পৃথিবীকে চিরে সাইকেল রিক্সায় চাকরিতে যাচ্ছি। এই মাঠের শেষ দিককার গাছপালার ভেতর যাদের ঘরবাড়ি তারাই বোধ হয় এই ধান কেটে নিয়ে গেছে। আবার বছর ঘুরে বর্ষা এলে তারাই এ মাঠে ধান বুনতে ফিরে আসবে।

উল্টোদিক দিয়ে শহরমুখো ব্যাপারীদের ভিড়। সুদীপ নিশ্চয়ই এখন কলকাতায় কোনো বড় বাড়িতে তার অফিসঘরে কাজে ব্যস্ত।

আপনি মশাই কিস্যু জানেন না। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যে কোন্ দেশের রাজপুত্রকে জোড়াসাঁকোয় কবে আদর খাতির করেছিলেন— এসব গালগল্প কলকাতায় কাগজে গিয়ে লিখুন। নাম পয়সা দুই-ই পাবেন। আমাকে আমার সেক্সপীয়ার নিয়ে থাকতে দিন।

ইংরেজির টাটকা রিডার অসিত বসু রীতিমতো অপমানিত হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার সঙ্গে বিজু ঘোষের বউ শক্তির প্রায় ধাক্কা লাগছিল।

সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে শক্তি ঘরে ঢুকে স্বামীকে বলল, তুমি পুবিকে রাজি

করাও। এমন পাত্র আর পাবে না। রামপুরহাটে ওদের তেলকল আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘের ওপর জমি। ছেলে গ্র্যাজুয়েট। টাকায় কুমীর। তা চল্লিশ এখনও হয় নি। বিয়ে হলে পুষির কথায় উঠবে বসবে।

দ্বিজু ঘোষ হাতের 'টেম্পেস্ট' খানা বন্ধ করে বউকে বলল, আমায় না বলে তোমার মেয়েকে গিয়ে বলো। আমি এখন কোথায় লোহা, কোথায় বালি করে মরছি। বাঁশ কিনবে বলে মিস্তিরি ও হপ্তায় টাকা নিয়ে গেল, আজও এলো না।

পাশের ঘরে পুষির কানে সব কথাই যাচ্ছিল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল কোকোর ওপর। ঠাঁই করে তাকে এক চড় কষালো। তখনই দেখল তার মা খড় চিবোনো গরুর কায়দায় চাবর চাবর করে পান চিবোতে চিবোতে তার ঘরে ঢুকছে। সঙ্গে সেই জর্দার পচা গন্ধ।

মা কিছু বলার আগেই পুষি বইপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় চললি ?

আমি এখন লাইব্রেরিতে যাবো।

চান করিস নি, খাস নি, এখনই ?

হ্যাঁ এখনই যাবো। সরো।

তোর জন্যে একটা ভালো ছেলের খবর এনেছিলাম।

খুব ভালো ? তা হলে তুমিই বিয়ে করে ফেল না।

শক্তিকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেই বেগেই কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে পুষি উঠোনে নেমে পড়ল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি বলল, ছোড়দি খেয়ে যাও। সব রান্না শেষ।

গেট খুলে বেরিয়ে গেট বন্ধ করতে করতে পুষি বলল, তুমি খাও। গেট বন্ধ করে বেরনো ওদের অভ্যেস। নয়তো কোকো পেছনে পেছনে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি অব্দি চলে আসতে পারে।

পথে বেরিয়ে পুষি বুঝল, বিশ্বভারতীতে এখন সবই আছে। বাতাসে বোধহয় জ্ঞান আর প্রজ্ঞার গুঁড়োর ছড়াছড়ি। এই আবহাওয়াতেই তাকে শিখতে হয়েছে।

প্রিয় শোভনবাবু,

আমি মনের দিক থেকে আপনার চিঠি আর পেতে চাই না। আপনার তো কোনো অভাব নেই। চাকরি করেন, সংসার করেন। এবার টেলিফোন

ডায়রেকটারি দেখে পছন্দমতো নাম-ঠিকানায় ওসব চিঠি পাঠাবেন। আমাকে কেন ?

ক'দিন আগে নিজেরই ডাকে ফেলা চিঠির বয়ান নিজেরই মনকে যেন ডিকটেসন দিতে দিতে হাটছিল পুষি।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান গুরুদাসবাবু সব শুনে বললেন অরুণ তো কোনো ঠিকানা দিয়ে যায় নি।

পারিজাত ঘোষ অস্ফুটে শুধু বলল, ও।

বই খুলে পড়তে বসেও সে মন থেকে একটা শিউলিতলাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিল না সেখানে একটি ছেলে একটি মেয়ের হাত জোর করে ধরেছিল। ক' বছর আগের কথা। তখন নিশুতি রাত। আর আজ এখন ওদের সে বাড়িতে বছর খানেক হলো ভাড়াটে এসে পুরনো হতে চলেছে।

বইয়ের অক্ষরগুলো পারিজাতের চোখে ঝাপসা হয়ে এলো। আমি কি সুন্দরী ? আমি কি দেমী ? আমি কি অহংকারী ? খোলা জানলার বাইরে তাকিয়ে বুঝল তার ভেতরে ধস নামলেও ঐ গাছপালা মাঠ, ওদের কিছু হয় নি। ওরা যা ছিল, তাই আছে।

নিজের ভাইয়ের সঙ্গে দল বেঁধে ট্রেনে করে রিনি আর পুষি এই প্রথম বেড়াতে বেরলো। সঙ্গে আরও তিন জন। কমপিউটার সায়েন্সের শংকর মুখার্জি আর তার বোন সুপর্ণা। আর সদ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাম ক্লাসফ্রেণ্ড অনাদি কর। কালীপুজোর পর রিজার্ভ করা কাপ। ছ'জনের দলে আনন্দ ছিল, চলন্ত কামরার জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া আলো ছিল। আর ছিল শীতের আরাম।

পুষির দাদা বলল, সুপর্ণাকে তোরা বৌদি ডাকবি।

সুপর্ণা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। পুরু লেন্সের চশমা চোখে তার দাদা শংকর বলল, গেট ইজি।

পুষি বুঝতে পারল না কাকে এই সহজ হতে বলা।

কেন না এখন শংকরের ভারি হাতখানা তারই উরুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে।

ঠিক এমনি সময় রিনি আর পুষির ভাই বলল, হ্যাঁরে, তোরা সহজ হচ্ছিস না কেন ? শংকর আমার ক্লাস মেট। অনাদিও তাই। তোরা ওদের সঙ্গে

হাসবি, কথা বলবি, গান গাইবি। তা না কেমন গুম মেরে আছিস।

রিনি হেসে বলল, কোথায়। এই তো আমি হাসছি।—বলে আবারও হাসল।

পরদিন সকালে নুলিয়ার ডোঙায় অনেকটা গিয়ে শংকর তীরে ফিরে এসেই জলের ভেতর ডুবে পুষির পা ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে পুষি জল ছেড়ে একদম বালিতে, কি হচ্ছে ?

জাঙিয়া পরা খালি গা শংকর সুঠাম বুকে ঢেউ বুঝে লাফ দিতে দিতে বলল, আমাকে তোমার খারাপ লাগে ?

জানি না। বলে পুষি আরও পিছিয়ে শক্ত বালিতে উঠে দাঁড়ালো।

দূরে দেখল অনাদিদার সঙ্গে তার দিদি রিনি সামান্য জলে ডুব দিয়ে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মুখে হাসি। বোধহয় দাদার সেই অর্ডার দেওয়া হাসি। ক্লান্ত হাসি। সারা মেদিনীপুর জেলাটা দিদিকে রিক্সায় টো-টো করে বেড়াতে হয়। তার ভেতর সময়, ছুটি, পয়সা করে তবে দিদির এই বেড়াতে আসা।

ডান দিকে তার ভাই সুপর্ণার সঙ্গে বালিতে বসে গল্প করছিল। সামনে সমুদ্র থেকে উঠে আসা কোনো মূর্তির মতোই শংকর আবার দু'খানা হাত এগিয়ে দিল।—এসো আমাকে ধরে সাঁতরাও।

না আমার ঢেউয়ে অভ্যেস নেই।

ভয় কি. ঢেউ এলেই লাফাবে।

না।

আর ক'দিন বাদেই এম এ-র রেজাল্ট বেরোলে তুমিও কোনো কলেজে পড়াবে পারিজাত। গায়ের জামাকাপড় নিয়ে এত লজ্জা ? সমুদ্রের সামনে ওসব কেউ গায়ে মাখে না।

আমি মাখি।

সেদিনই গভীর রাতে সি বিচ হোটেলে অন্ধকার ছাদে পুষির দাদাকে শংকর বলল, পারিজাতের সঙ্গে আমার বিয়ে না দিলে, সুপর্ণার সঙ্গেও তোর বিয়ে হবে না।

ডোন্ট বি সো ক্রুয়েল। আমি তো ওদের সহজ হতেই বলছি।

আরও ভালো করে বল।

পুরীতে সমুদ্রকে মনে হয় আকাশের দিকে উঠে গেছে। নুলিয়ারা ফিরে ফিরে এসে সামুদ্রিক ট্যাংরা বিক্রি করছিল। এখন সকালবেলা। সমুদ্রের

সামনে ওদের ছ'জনের চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে। এই ট্যাংরার ভয়ংকর কসফরাস। ভেজে খেলেও পেট ফাঁপবে।

ওরা ছ'জনের ভেতর দু'জন—মানে সুপর্ণা আর রিনিদের ভাই একটু আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। শংকর আর অনাদি ওদের বন্ধুর দু'বোনের সঙ্গে খুব সহজ হবার চেষ্টা করছিল—যাতে কিনা সান্নিধ্য ঘন ক্ষীরের মতো নেমে আসে।

আচমকাই রিনি আর পারিজাত একসঙ্গে চেঁচিয়ে দৌড়তে লাগল—ওই তো দাদু। ওই তো দাদু।

আর সে চীৎকার শুনে ছেঁড়া শার্ট গায়ে খালি পায়ে এক বুড়ো—গালে ভুল ভুল করছে সাদা দাড়ি, প্রাণপণ আরও দূরে ছুটে চলে যেতে লাগল।

রিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, নিশ্চয়ই আমাদের দাদু।

পারিজাত কেঁদে ফেলল।—দাদু দাঁড়াও। আমি পুষি। তোমার পুষি—দাঁড়াও—

নাইতে নামা মানুষজন স্নান থামিয়ে ওদের দৌড়নো দেখছিল।

দৌড়তে দৌড়তে শংকর আর অনাদি দু'বোনকে ধরে ফেলল।

করছ কি? পা ভেঙে পড়বে। শংকরের জাপটানো হাতের ভেতর পারিজাত হাঁফাতে হাঁফাতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল—আমাদের দাদু। আমাদের দাদামশায়।

অনাদি বলল, এখানে তিনি কোত্থেকে আসবেন?

রিনি বলল, আমি নিশ্চয়ই জানি আমার দাদু।

শংকর চেঁচিয়ে বলল, সামনেই গাছপালা আর বালির ঢিবিতে ওদিকটা ঢাকা পড়ে গেছে। তোমাদের দাদু হলে নিশ্চয়ই থামতেন।

পারিজাত শংকরের দু'হাতের বাঁধন এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি যাবো আমি দাদুকে ধরব।

রিনি দেখল সমুদ্র যেমন ছিল তেমনই আছে। মানুষজনের স্নান বা কথাবার্তা কোনোটাই থামে নি। আকাশের উঁচুতে জল এক জায়গায় গিয়ে একটা মেঘকে ধরার চেষ্টা করছে শুধু।

কৃষ্ণনগরে ডি এম, বি. ডি. ও-দের সঙ্গে মিটিং করে অরুণ সরাসরি বাসে জাগুলিয়ায় মোড়ে এসে নামল। এবছর গরুর খাবার ঘাসে ভীষণ টান। প্রচুর

ফলনের ধানের খড় গরুদের মুখে রোচে না। তাই সরকারি নির্দেশ যেখানে যতোটা জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানেই বীজ ছড়িয়ে ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন সন্ধ্যেবেলা। ফিল্ড অফিসার অরুণকিশোর রায় কনজিউমার কো-অপারেটিভের খাতা খুলে হেরিকেনের সামনে বসল। আজ তিন দিন জাগুলিয়ায় ইলেকট্রিক নেই। বছর দেড়েক এই চাকরিতে এসে সে অনেক মানুষের সঙ্গী। ধান, সার, বীজ, পোকামারার ওষুধ, হালের বলদ কেনার ঋণ আর জলের ট্যাক্স আদায়ের সরাকারি প্রতিনিধি।

এখানে মানুষের চেষ্টা, দুঃখ, আনন্দ, ফসল ফলানোর গর্ব দু'ধারের বড় বড় গাছের পাতায় যেন লেগে থাকে। যেন তা টের পায় অরুণকিশোর।

সন্ধ্যেবেলা কোয়ার্টারে ফিরলে মা বলে, হ্যাঁরে, তোর ডিগ্রিটা আনলি না? কনভোকেশন তো কবে হয়ে গেছে।

সময় পেলেই, যাবো।

চল না অরুণ. আমায় একবার নিয়ে। একবার গিয়ে মোহিতবাবু, পুষিদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

গেলেই হয়। যাবো একদিন মা।

পুষি তোকে চিঠি লেখে?

ঠিকানা তো দিই নি মা, জানবে কোত্থেকে? আর পুরনো কথা কে-ই বা মনে রাখে?

হেরিকেনের সামনে থেকে যেন এই চিন্তাগুলোকে বাদুলে পোকার মতো অরুণ বাঁ হাতে তাড়িয়ে দিয়ে আজকের মিটিংয়ের ডায়েরি লিখে রাখল। তারপর আজকের যাতায়াতের টি. এ বিল করতে বসল। টি. এ বিল করতে করতে হঠাৎ নজরে পড়ল তার নামে আসা চিঠি পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে পিওন।

খুলে দেখল—আরে, এ যে তার প্রিয় লেখক কমলেশ সরকারের চিঠি। ঔপন্যাসিক কমলেশদার জড়ানো হাতের লেখা।

প্রিয় অরুণ,

তোমার দীর্ঘ চিঠিখানা পড়লাম। জীবনে যে অবস্থার ভেতর দিয়েই যাও, তা সবসময়ই তোমার মনের দরজায় ফিরে যাওয়া ঢেউয়ের মতো ফেনার দাগ রেখে যাবে। তোমাকেও নিজের অজ্ঞাতে কোনো না কোনো এমন বিপদে পড়তে হবে, যা কিনা তোমার সম্মান আর অস্তিত্ব দুই-ই নিশ্চিহ্ন করে দিতে

পারে। তার ভেতর থেকে ফিরে এলে তোমার কলমের কালিতে দেখতে পাবে লেখা কি সোজা, জীবন কত গভীর, পাঠকের মনযোগ কত দুর্লভ। এর ভেতর কোথায় কোন মানবী, কোন পরাজয় তোমাকে পরাস্ত করল, তা কোনো বড় ব্যাপার নয়। কেননা বহস্তা জীবনের চেয়ে বড় জিনিস এখনও মানুষ আবিষ্কার করতে পারে নি। যাক গিয়ে, কবে আসছ?

অরুণ বিড়বিড করে বলল, কালই যাবো কমলেশদা।

ইনটারভিউ বোর্ডে বাবার বন্ধু ডঃ ভট্টাচার্য ছিলেন। এমনিতে রেজাল্টও ভালো পারিজাতের। আজ তিন মাস হলো পারিজাত ঘোষ বেলেতোড কলেজে লেকচারার। থাকার জায়গার কষ্টটা সে কোনোমতে কাটিয়ে উঠেছে। লোকাল স্কুলের লাইফ সায়েন্সের টিচার সুনন্দাদির সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। কমন কাজের লোক। ইঁদারার জল। বাজার কাছেই। শুধু অসুবিধা যা, স্টাফ রুমে কিছু তরল পুরুষ কলিগ বড্ড গায়ে পড়া। নয়তো এই তিনমাসে সে বাঁকুড়া থেকে ফৈয়াজ খাঁ, বেগম আখতার, লালন ফকির—নানান রেকর্ড আনিয়ে বাড়ির নির্জন সময়টায় ফিয়েস্টা বাজিয়ে কাটিয়ে দেয়। গরমের শুরুতে এখন সে ফৈয়াজকে তার রেকর্ডে ছায়ানট গাইতে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের মুণ্ডুটা দেখছিল। শুশুনিয়া এখান থেকে পঁচিশ তিরিশ মাইল তো হবেই। ওখানে নাকি রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি রয়েছে।

এক একদিন পারিজাতের বড ইচ্ছে করে দিনের আলোয় পাহাড়ে উঠে সেই শিলালিপির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অরুণদা থাকলে শিলালিপির ঠিক পাঠোদ্ধার করে দিত। এম এ টা যে কেন পড়ল না অরুণদা!

ছোট্ট জায়গা বেলেতোড়। কাছেরই জঙ্গলে রানীবাঁধ থেকে গভীর রাতে জল খেতে আসে হাতীরা। ঝর্ণার জল। এক একদিন আবার কলেজ ফিরতি সাইকেল রিক্সায় বসে পারিজাত মাথার ওপর দিয়ে টিয়ার ঝাঁককে সাঁই সাঁই করে জঙ্গলের দিকে উড়ে যেতে দেখেছে।

পারিজাত এখন বোঝে একজন মানুষ শুধু নির্জনতা, শুধু রেকর্ডের সূক্ষ্ম রাগ-রাগিনীর ভেতর একা একা টিকে থাকতে পারে না। এক এক সময় শুশুনিয়া পাহাড়কে দেখে তার মনে হয়, এরই নাম পরিবর্তন। আবার এক এক সময় মনে হয়, কি একঘেয়ে। রাজা চন্দ্রবর্মার আমলে এই পাহাড়ের

গায়ে যারা তাঁর বাণী কুঁদে রেখেছিল, তাদের হাসি, কথা, ঘন-গম্ভীর বাটালি আর ছেনি-ধ্বনি আজও কি ওই পাহাড়ের বাতাসে স্তব্ধ করে ধরে রাখা আছে ?

মধ্যবয়সী কমলেশ সরকার অরুণকে বলল, মানুষ সমেত সব জন্তুরই তার নিজের শরীরের প্রতি ভালোবাসা আছে অরুণ। আর এই শরীর নিয়ে তার এক রকমের অহংকারও থাকে। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

কিন্তু কমলেশদা, পারিজাত ছিল অন্যরকমের মেয়ে।

তাই যদি হয়, তবে সিধে গিয়ে দেখা করো।

না, তা হয় না এই চার পাঁচ বছরে আমিও অনেক পাল্টে গেছি। পারিজাতও নিশ্চয়ই পাল্টে গেছে।

পরমের ছুটিতে দ্বিজেন ঘোষ ভাবছিল নতুন বাড়ির ভাড়াটে তুলে দিয়ে এবার সে গৃহপ্রবেশ করবে দিনক্ষণ দেখে। কলকাতা থেকে ছেলে, ছেলের বৌকেও আসতে বলবে। কিন্তু চিঠি লেখার আগেই মেদিনীপুর থেকে রিনি আর বেলেতোড় থেকে পারিজাত এসে হাজির। পারিজাতের গায়ে বেশ জ্বর।

ডাক্তার এলো। শাশুড়ি পারিজাতের মাথার নিচে অয়েলক্লথ বালিশ অব্দি ঝুলিয়ে দিল হাই ফিভার। জল-ধারানির ভেতর পারিজাত দু'হাতে শক্তিকে জাপটে ধরল।

ওর মা মুখের কাছে মুখ এনে বলল, কি হয়েছে মা ?

পারিজাতের ঠোঁটে অস্ফুটে ফুটে উঠল, অরুণদা। আমি অরুণদার কাছে যাবো।

এর কোনো কথাই শক্তি বুঝল না। কেন না পারিজাতের ঠোঁটই নড়েছে শুধু, কথা ফোটে নি।

কলকাতায় কি কাজে এসেছিল অরুণ। কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলায় লেখক কমলেশ সরকারের বাড়ি এসে হাজির !

অরুণকে দেখে কমলেশের কি এক রকমের আনন্দ হয়।—কি অরুণবাবু, কি মনে করে?

আপনার লেখার কোনো ক্ষতি করলাম না তো?

না হে না, বোসো। তোমার বৌদি বাজারে গেছেন, এখুনি আসবেন।

তাহলে কমলেশদা আমি একটু বাজার করে আসি। আজ রাতে এখানেই থাকব।

কমলেশের গলায় পরিহাস খেলা করছিল।—তার চেয়ে বরং অরুণ একশোটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি, বাজার থেকে একটা পারিজাত নিয়ে আয়। তোর মন থেকে তাহলে এই দুঃখু দুঃখু ভাবটা কেটে যায়।

নাঃ, তা আর হয় না কমলেশদা।

তা হলে চল রিক্সা করে কুঠিঘাটে যাই।

কুঠিঘাটে বড্ড ভীড় থাকে কমলেশদা। ইমারতি কারবারের থাক থাক টালি নামছে হয়ত বজরা থেকে।

তাহলে চল সর্বমঙ্গলা ঘাটে।

সেখানে চানের ভীড বড্ড। তার চেয়ে বরং কোনো নাম নেই সেই ঘাটটায় চলুন।

কোনটা?

সেই যে একটা অশ্বত্থতলা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সামনেই নদীর ওপারে কলকাতার যমজ বোন।

বেশ, তাই হোক। তোর বৌদি এলে বেরবো। আচ্ছা অরুণ, আমি মারা গেলে আমার লেখা কেউ পডবে?

এ নিয়ে ভাবছেন কেন?

ভাবছি। কেন? আমার লেখা যে তোর পারিজাত!

এবার অরুণ গলা খুলে হাসল।

আজ রিনি স্কুলে যায়নি। সাহসগাঁ থেকেও মেঠো পথে চার মাইল গিয়ে একটা প্রাইমারি গার্লস স্কুলে ইন্সপেকশন ছিল। শহরের বাস স্টপে হঠাৎ অরুণের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে অনেক চেষ্টার পর আজই অরুণের ঠিকানা পেয়েছে।

নানা চাকরির তিন জন মহিলা নিয়ে রিনিদের এই মেস। বিছানায় বসে

ট্রাঙ্কের ওপরে পোস্টকার্ড রেখে সে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখল।

প্রিয় অরুণ,

আজ ক বছর ডুমুরের ফুল। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা পেয়েছি। পুষি বেলেতোড় কলেজে পড়ায় এখন। আমাদের ভাই, ভাইয়ের বৌ কলকাতায় দু'জনেই স্কটিশে পড়ায়। তুমি পত্রপাঠ এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ইতি তোমার দিদি।

কমলেশ সরকার ভাবল জীবনে এই তিরিশ বছর সাপ ব্যাং কি লিখলাম কে জানে? সবই কি পণ্ডশ্রম? একটা ডায়েরী রাখলে হয়। তাতে এসব কথা লিখে রাখলে, মন্দ কি?

ঠিক এই সময় কমলেশের ঘরে অরুণ এসে হাজির।—এই দেখুন, পুষির দিদির চিঠি। আপনি সেদিন যে বলেছিলেন, চল যাই, একশো টাকা দিয়ে পারিজাতকে কিনে আনি। তা কেমন যেন সেই দিকেই সব যাচ্ছে। আমি এই বজ্রমুক্তাটা ধারণ করার পর থেকেই সব যেন শুদ্ধ হয়ে আসছে।

ওরকম একটা মুক্তা আমায় এনে দিবি? তাহলে হয়ত ধারণ করার পর এমন লেখাই লিখব, পাঠক না পড়ে পারবে না।

ধ্যুত। আপনার ওসব কিছু দরকার নেই। আপনার দরকার লিখে যাওয়া।

আর তোমার দরকার এখন ভায়া মেদিনীপুর দিয়ে বেলেতোড় চলে যাওয়া।

আপনি তাই মনে করছেন কমলেশদা?

হ্যাঁরে গাধা! আমি কি পানিপথ যুদ্ধের বৈরাম খাঁ? ওয়ার ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে সব ডিসিশান নেব? তোর ডিসিশান তোকেই নিতে হবে। আমি তো নভেল লিখি। আমার মনে হয় এ চিঠির পরিণামে তোকে বেলেতোড়ও যেতে হবে।

তাই বলছেন? তা হয় না কমলেশদা।

জীবনে কিন্তু তাই হয়। তুমি ভাই উঠে ওই বইয়ের পেছনে একটা ছোট্ট হুইস্কি আছে, বের করে আনো। আর খাবার টেবিল থেকে দুটো গ্লাস!

এখুনি খাবেন?

তোমার কোনো আপত্তি আছে?

না, না।

পারিজাত বিকেলবেলা লাল সুরকির পথে সাইকেল রিক্সায় বাড়ি ফিরে এলো। গরমের বন্ধের পর আজই কলেজ খুলেছে। হাতে বাঁকুড়া থেকে আনানো বিসমিল্লার সানাইয়ের এল. পি। এ রেকর্ডটা সে আগেও শুনেছে। নিজেকে এখন তার ভালো ভালো গান-বাজনার মজুতদার মনে হয়। বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল ডুবন্ত সূর্যের আলো শুশুনিয়ার মাথাকেও লাল করে দিচ্ছে। বিসমিল্লার সানাইয়ে এই সব ছবিই ভেসে ওঠে। এক এক সময় তার মনে হয় বেনারসের গঙ্গায় সুদূর ধূ-ধূ চর বিসমিল্লা তাঁর বাজনায় জাগিয়ে তুলছে।

লাল মাটির দেশে সূর্যের লাল আলো মাটিতে পড়েই শুষে যাচ্ছে।

হঠাৎ এপথে কার সাইকেল রিক্সা? এখানে সাইকেল রিক্সা চড়ার বাবুয়ানি কি বিবিয়ানি শুধু তো তারই। এ জন্যে স্টাফরুমে পারিজাতকে দু'কথা শুনতেও হয়েছে -হাঁটবেন। একটু হাঁটবেন।

পারিজাত অবাক হয়ে দেখল তাদেরই বারান্দার সামনে সাইকেল রিক্সা এসে থেমেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোতে সিটে বসে আছে—আর কেউ নয়—অরুণকিশোর, অরুণদা।

গায়ে হালকা কাপড়ের সাফারি বুশ শার্ট। রিক্সার পা দানিতে বেতের টুকরি, ল্যাংড়া আমে ভর্তি। অরু-ববরণ।

পারিজাত, এই ব্যাগটা ধরো। আট আনা খুচরো হবে?

সবার বসার জন্যে বারান্দা ঘিরে সিমেন্টের বেঞ্চ। পিলার ধরে নিজেকে সামলাতে গেল পারিজাত। বসে পড়ল সেই বেঞ্চে। চোখে এখন তার আলো নেই। সামনে লালচে শুশুনিয়া একদম মুছে গেল। অরুণদার মাথার বেয়াড়া চুল, বাস জার্নির ধুলো, ছাই ছাই। কেন না, এখন তো কোনো ট্রেন নেই।

মাছের পেটে আংটি

কলকাতার সম্পন্ন গেরস্থদের পাড়া। এখন এখানে এক ছটাক জমিও মাথা খুঁড়লে পাওয়ার উপায় নেই। স্বাধীনতার দু এক বছরের ভেতর—যখন টাকা এত সস্তা হয়ে যায়নি—ইনফ্লেশনের তেমন দাপট ছিল না—তখন সাত-আটশো টাকা করে কাঠা গেছে এখানে। সেসব দিনে এ টাকাও অনেকের ছিল না। রিয়েল এস্টেটের দাম যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে, সে খেয়াল অনেকেরই ছিল না। যাদের খেয়াল ছিল, টাকা ছিল, তাদের কপালে মেওয়া ফলেছে।

এখন এখানে এক কাঠার দাম সওয়া লাখ—দেড় লাখ।

পয়সাওয়ালা রিটায়ার্ড বাঙালী আর নতুন অবাঙালী ধনীরাই এখন এখানকার বাশিন্দা। হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটা খুঁজছিল অশেষ। গরমের বিকেল। বাড়ি বাড়ি কাজের মেয়েরা বিকেলের শিফটে যাচ্ছে—তাদের পায়েও ভাল স্যাণ্ডেল। মানে যারেকটু ময়লা পাড়ায় যেসব স্যাণ্ডেল ভদ্রলোকেরা পায়ে দেয়।

বেশির ভাগ বাড়ির সামনের দরজা-জানলা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। রোদ পড়ে যেতে একে একে সেসব খুলে যাচ্ছিল। নম্বর মিলিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল অশেষ। কোন্ তলায় থাকে? বাড়ি তো চারতলা। নিশ্চয়ই ভাড়া দিয়েছে।

বেল টিপল। উৎকট আওয়াজ। অনেকটা গলা খাঁকারির ঢং। পুরনো মোটরের যে হর্ন শুনে রাস্তার ষাঁড় জোড়পায়ে লাফাতে থাকে ঠিক তেমন।

মেজানিন ঘর থেকে একটি কাজের লোক বেরিয়ে এল।

কাকে চাই?

নাম বলল অশেষ।

আপনি?

বলবে মিস্টার মজুমদার—

তবু লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে অশেষ বলল, মিসেস বোস আমায় চেনেন। গিয়ে বললেই হবে—

লোকটা দোতলায় উঠে গেল। অশেষের হাত-ঘড়িতে সওয়া চারটে।

চারতলা অব্দি সিঁড়ি উঠে গেছে। খাঁ-খাঁ নির্জন। কোন ঘর থেকেই কোন আওয়াজ নেই।

অবস্থা ফিরে গেলে লোকে আস্তে কথা বলে।

কে ?

অশেষ ওপরে তাকাল। তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। সিঁড়ির মাথা থেকে আবার সেই গলা ভেসে এল, কাকে চাই ?

আপনাকেই। মানে—তোমাকে—

কে ? বলতে বলতে তিনধাপ নেমে এল—রেলিংয়ে হাত।

আমি অশেষ।

ওঃ! কি মনে করে ? এসো। ওপরে এসো --

অশেষ ওপরে উঠতে উঠতেই বলল, টেলিফোন গাইডে তোমার ঠিকানা পেয়েছি অনেকদিন। আসা হয়ে ওঠেনি।

ওপরে উঠে বেশ উদার ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে তবে রাস্তামুখো বিরাট বসার ঘর। সেখানে ঠিক কোথায় বসে আছে—বোঝা যাচ্ছিল না—একটি ছোট মেয়ের মিষ্টি গলায় কে যেন গুনগুন করে গাইছে।

বোসো। কি করে জানলে—এখন মিস্টার বোস থাকেন না ?

মাপ করো দীপা। আমি কোনকিছু জেনে-শুনে আসিনি—বলে উঠে দাঁড়াল অশেষ।

আহা! রাগ করছ কেন ? বোসো বোসো। কতদিন পরে দেখা হল! সেই যে একবার ফোনে কথা বলেছিলে—কতদিন আগে—আমাদের আজ মুখোমুখি দেখা তা প্রায় বিশ বছর বাদে—কি বল।

মনে মনে একটা হিসেব করে অশেষ বলল, তা হবে।

আমি এসেছিলাম—

আগে বোসো।

বিরাট লিভিং রুমের এক কোণে কাশ্মীরী ওয়ালনাটের ঝরোকা। যেখানে আড়াল দরকার—সেখানে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসানো যায়। সেই আড়াল থেকেই গানের গলাটি গান থামিয়ে জানতে চাইল, কার সঙ্গে কথা বলছ মা ?

মিথ্যে রাগের ভান করে সেদিকে তাকিয়ে দীপা বলল, ওরে আমার পাহারাদার রে!

কে এসেছে মা ?

বেরিয়ে এসে দেখে যাও। আমি বলতে পারব না। হোয়ার ইজ আ বিগ সারপ্রাইজ ফর য়ু—

এতক্ষণে গুমোট কাটল। অশেষ হাসিমুখে চাপা গলায় বলল, তোমার মেয়ে? ডাকো।

দীপা বলল, সেবারে তোমার ফোন পেয়ে ওর বাবাকে সব কথা বলে দিয়েছিলাম।

বলে দিয়েছিলে?

হুঁ।

সব?

হুঁ। সব শুনে বলেছিল—এখুনি দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক হবে না। তাতে নাকি আমার ভেতর ফের চাঞ্চল্য আসতে পারে!

চাঞ্চল্য? আমায় দেখে? তোমার!

তাই তো বলেছিল ওর বাবা। আরো বলেছিল—তাড়াতাড়ির কিছু নেই। দেখা তো একদিন হবেই। সময় তো পড়েই আছে। বয়স আরেকটু বাড়ুক। তখন চাঞ্চল্য কেটে যাবে—দেখা হলেও কিছু যাবে আসবে না।

অশেষ বলতে যাচ্ছিল—শুধু একবার চোখের দেখা দেখব বলে—দেখা হলে শুধু একবার বলব বলে—কলকাতায় কত নির্জন রাস্তা একা হেঁটে হেঁটে ফুরিয়ে দিয়েছি—

কিন্তু এসব কথা বলার আগেই একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। চোখ-মুখ একদম ছলাৎ ছলাৎ করছে। ঝকঝকে কালো দুই ভ্রু। নিশ্চয়ই ভেঙ্গিলে ভিজিয়ে প্লাক করছিল। অশেষকে দু-চোখ ভরে দেখে বলল, কে মা?

দীপা বলল, গেস্ট—!

বল না মা। প্লিজ—

হাত বাড়িয়ে দিল অশেষ। এসো। এখানটায় বোসো। আমিই বলছি—আমি কে—

ওঃ! বলেই আহ্লাদের একটা অদৃশ্য ঝোল কোঁৎ করে গিলে ফেলল মেয়েটি। বুঝেছি। আর বলতে হবে না। আপনি আমার মায়ের—

অ্যাই! বলে হাত তুলে শাসাতে গেল দীপা।

এ শাসানী একদম ভান বলেই মেয়েটি একটুও আমলে নিল না। পরিষ্কার সতেজ গলায় বলল, আমার মা আপনার ওল্ড ফ্লেম! তাই না?

হ্যাঁ বা না—কিছুই না বলে চুপচাপ হাসতে লাগল অশেষ। পাঞ্জাবির পকেট দুটোয় বার-বার হাত ঢোকাতে ঢোকাতে হাতের ময়লায় সেখানে কালো। মাথায় সিঁথির কাছটায় বেশ কয়েকটা পাকা চুলের জটলা। বুক-পকেট নানা রকমের ফর্দের টুকরো টুকরো কাগজে ফুলে আছে। অশেষ এই অবস্থায় পায়ের জুতোয় আর তাকালো না। কিন্তু ·াবুলি জোড়ায় পা গলালেই যে পেরেক ফোটে—একথা সে আরামে বসে থেকেও ভুলতে পারল না।

মেয়েটি অশেষের পাশে এসে বসল। আমার নাম সঙ্ঘমিত্রা।

কি পড়ছো?

উঃ! আপনারা যে কি! সেই পুরনো প্রশ্ন। কি পড়ছো? কোথায় পড়ছো?

সরি! খুব ভুল হয়ে গেছে।

না না। আমিই আপনাকে আগে বলে দিতাম। লোরেটোতে পার্ট ওয়ান পড়ছি। ইংলিশে অনার্স নিয়েছি। দেখেই বুঝেছি—আমার মায়ের বয়েস ছিল। আপনি এক সময় বেশ হ্যাণ্ডসাম ছিলেন—

দীপা চোখ কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকাল। এখনো নয় নাকি?

এখনো নিশ্চয়ই। শুনেছি আপনার মেয়েরা খুব সুন্দরী। নিয়ে এলেন না কেন সঙ্গে?

কার কাছে শুনলে?

কেন? মায়ের কাছে—

তোমার মা তো ওদের দেখেননি।

দমবার পাত্র নয় সঙ্ঘমিত্রা। বলল, যে দেখেছে—তার কাছ থেকে শুনেছেন নিশ্চয়। আর—না শুনলেও বলা যায় না নাকি?

দেখল না—শুনলো না—বলবে কি করে? থটরিডিং! না, আন্দাজে?

কেন? আপনাকে দেখেই তো বলা যায়। আনলে পারতেন সঙ্গে—

দীপা বলল. ঠিকই তো বলেছে মিত্রা—আনলে না কেন সঙ্গে করে?

আনিনি—কারণ, ক'দিন পরেই আমার বড় মেয়ের বিয়ে—

ওমা! তুমি শ্বশুর হয়ে যাচ্ছ। এইতো সেদিন!

সেদিন নয় দীপা। মেঘে মেঘে প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর হতে চলল—

কাছে একটা রেল-স্টেশন থেকে সার্কুলার রেলের ইঞ্জিন কু দিয়ে কাঁদল। আকাশের একখানা মেঘ এ-পাড়ার মাথায় এসে রোদকে কিছুক্ষণ আড়াল করে ভাসল।

জানলা দিয়ে দেখা যায়—দূরে হাইওভারের গায়ে বিশাল হোর্ডিংয়ে রেড অক্সাইডে আঁকা এক নর্তকী।

ঘরের ভেতর আহ্লাদের স্রোতটা খানিকক্ষণের জন্যে নিশ্চুপে জমাট বেঁধে গেল। ঝুল পকেট থেকে নেমন্তন্নর চিঠিটা বের করে অশেষ সেণ্টার টেবিলে রাখল। বন্ধুকে নিয়ে তিনজনে যাবে তোমরা—

এখানেই তো গণ্ডগোল।

দীপার এ কথায় অশেষ খোলা গলায় বলল, কেন? ডাক্তাররা নেমন্তন্ন রাখেন না?

রাখবে না কেন? অবিশ্যি আমি—

আমি কি? যা বলছিলে বল না—

আমি সব জায়গাতেই যেতে চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু ওর তো—

ওসব শুনছি না।

শোন অশেষ। ওর তো অপারেশন থাকে। ওর সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমি যেতে চেষ্টা করি। আমার তো অত ঝক্কি নেই—

তুমিও তো ডাক্তার দীপা।

হুঁ। কিন্তু আমি তো শুধু অজ্ঞান করি। ওকে অ্যাসিস্ট করি। অপারেশন করার আগে ভাল করে অজ্ঞান করানোই আমার কাজ—

যেভাবে আমায় অজ্ঞান করে রেখেছিলে।

একথা অশেষ আস্তে করে বললেও কানে নিল না দীপা। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। বাপের হয়ে একটা কান নিশ্চয়ই এদিকে এগিয়ে রেখেছে।

বিশ বছরের ওপর অব্যবহারে জং ধরা রিলেশনের মরচে তুলতেই যেন অশেষ একই চাপা গলায় বলে যাচ্ছিল—বছরের পর বছর—অজ্ঞান করে রেখে ছিলে আমায়।

সঙ্ঘমিত্রা কখন উঠে গিয়েছে—দুজনের কেউই লক্ষ্য করেনি। নজর গেল—যখন লিভিংরুমের এক কোণ থেকে স্টিরিও চালিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একা একাই সে পা মিলিয়ে—শরীর ঢেলে দিয়ে খুব আলতো করে নাচতে শুরু করে দিল।

চুপ কর। মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে এসব কি কথা!

অশেষ চুপ করে দেখছিল—দীপার মুখ দিয়ে বাংলা কথাগুলো কীভাবে বেরিয়ে আসে। আশ্চর্য। আর পাঁচজনের মতই তো ও কথা ওগরায়। একদম অর্ডিনারি ভাবে। অথচ এই দীপাকে অশেষ এক সময় ভাবতো—ও

আর পাঁচজনের চেয়ে একদম ভিন্ন। ও যেখান থেকে হেঁটে যেত—সেখানে অশেষের মনে হত—না জানি কিছু একটা পড়ে আছে।

পদরেণু? উঁহু। না। তাহলে? তাহলে কি? ও যে ছিল এখানে—তার একটা অদৃশ্য ছাপ। ও ওখানে আলো ফেলে চলে গেছে। এমন একটা ভাবনায় এক সময় বিশ্বাস করত অশেষ।

তবে কি দীপা অলৌকিক কিছু?

তাই তো মনে হত অশেষের। পাশাপাশি দুজন হাঁটতে হাঁটতে বটানিকালে অপরাজিতা লতা খুঁজেছে। অপরাজিতা খুঁজতে বেরনো এই দীপা নিজেই তো অপরাজিতা। সহজে ওকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে পায়—সে তো মহা ভাগ্যবান।

আমার এ ভাগ্য বেশিদিন সয়নি। তাইতো এতকাল ভেবে এসেছে অশেষ মজুমদার। এখন সে একজন দাগী গেরস্থ। সংসার করে করে মনে মুকুল বেরোবার জায়গাগুলোয় সে কড়া ফেলে দিয়েছে। এখন একটু বেমকা কিছু রোমান্স ভাবতে গেলেই তার সেসব জায়গায় ব্যথা লাগে।

আজ এতকাল পরে নিজের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসে খুব ব্যথা পেল অশেষ। দীপা কি এতখানি অর্ডিনারি ছিল! কোথায়? আমি তো কোনদিন টের পাইনি।

অশেষের এই সব স্বপ্নভঙ্গের ভেতর সঙ্ঘমিত্রার বাবা একদম ডবল স্বপ্নভঙ্গ হয়ে আচমকাই দেখা দিল। এই যে দীপা, তিন নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে রাতারাতি টিটেনাস। এখন তাই ক'দিন সবরকম অপারেশন বন্ধ। পোস্ট, প্রি—দু' রকমেরই কিছুটা সুস্থ পেসেন্টদের আমরা ক'দিনের জন্যে ছুটি করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বিপদটা কাটুক—তারপর ওরা সবাই ফিরে আসবে আবার হাসপাতালে।

নিজের মনেই বেশ জোরে জোরে কথাগুলো বলতে বলতে ডক্টর বোস নিজেরই লিভিংরুমে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরছিলেন—আর কি খুঁজছিলেন।

হঠাৎ হাতের ইসারায় সঙ্ঘমিত্রাকে টিভিও থামাতে বললেন। তারপর দীপার এত কাছাকাছি বসে থাকা ভদ্দরলোক প্যাটার্নের মানুষটার কাছাকাছি এসে হেসে ডক্টর বোস বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারছি না। আগে দেখেছি কি?

অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়ে অশেষ বলতে চেষ্টা করল, আজ্ঞে না। এই আমাদের দু'জনের প্রথম দেখা হল—

কিন্তু তার কথার ভেতরই সঙ্ঘমিত্রা ফোড়ন কাটল, ওমা! ওঁকে তো তোমার দেখার কথা নয় বাপি। ও যে আমার মায়ের বয় ফ্রেণ্ড! এক সময় ভদ্রলোক খুব হ্যাণ্ডসাম ছিলেন—

নিজেকে রীতিমত গুটিয়ে নিয়েও ডক্টর বোস বেশ ভারি গলায় বলল, কী করে বুঝলি?

কেন? ফিচার্স বলে দেয়—

এতক্ষণে অশেষ মজুমদার উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, আমার মেয়ের বিয়ে। আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম।

এতবড় মেয়ে আছে আপনার? দেখে তো বোঝার উপায় নেই। চেহারাটি দিব্যি কাঁচা রেখেছেন বলতে হবে।

না ডক্টর বোস। আমার বয়স হয়েছে। আর—আমি কিছু অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলাম।

এবার সঙ্ঘমিত্রার বাবা সিধে তাকাল অশেষের মুখে। তারপর একগাল হেসে বলল, আরও তো অল্প বয়সে বিয়ে হতে পারত।

পারত কিন্তু তা হয়নি ডাক্তারবাবু।

হয়নি। কারণ—দীপার আর ভাল লাগল না আপনাকে!

একথায় অশেষের মনে হল—সে যদি এই কথাটার সময় একটা খাটের নিচেও লুকিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাছাড়া—তার এই সব কাঁচা ব্যথার জায়গাগুলো খুচিয়ে দেওয়াই যেন ভদ্দরলোকের ইচ্ছে। তাই যেন ডাক্তারবাবু তার বড় মুখখানায় রীতিমত গোল করে হাসছেন।

নিজের স্বামীর হাসির ভেতর দীপা গোঁজ হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাইরে দূরে পার্কের ভেতর বাচ্চাদের কচি গলার গোলমাল। ওদের বাবারা মায়েরা বিয়ে না করলে এই সব আওয়াজ শোনাই যেতো না। চাই-ই-ই কুলপি বরফ। কত কি মিশে যাচ্ছিল বিকেলের কাঁচা অন্ধকারে।

সঙ্ঘমিত্রা এগিয়ে এসে ঘরের ঝাড় জ্বেলে দিল। মানে ঝাড়ের ভেতর লুকোনো ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল।

দীপা বলল, বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন ভদ্দরলোক। বসাও। চা খেতে বল। তা নয় পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসে গেলে—

যত্নআত্তি নিশ্চয়ই করেছ তুমি। আমি বলি কি অশেষবাবু—আমি একজন কাঠখোট্টা ডাক্তারমানুষ। এক মন ছাড়া—সবই চিরে দেখেছি। এটাই আমার প্রফেশন।

দীপা বলল, থাক। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। নেমন্তন্ন করতে আসাই ঘাট হয়েছে ভদ্রলোকের। চলুন অশেষবাবু—আপনাকে দোর অব্দি দিয়ে আসি।

থাম দীপা। দিয়ে আসবার হলে আমিই দিয়ে আসব।

অশেষ এতক্ষণে কথা বলল, আমার হাত পা আছে। নিজে হেঁটে এসেছি। নিজে নিজেই হেঁটে চলে যেতে পারব। পারলে আপনারা আমার মেয়ের বিয়েতে আসবেন। এসে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে যাবেন।

দাঁড়ান। আমার কথা শেষ হয়নি অশেষবাবু।

আঃ! কি করছ বাপি? বলেই সজ্ঞমিত্রা ছুটে এসে অশেষ মজুমদারের ডান হাতখানা ধরল। নিচে আমার কাজও আছে একটা। চলুন তো। মা বাবা এখন নিরিবিলিতে মন খুলে খানিকক্ষণ ঝগড়া করুক।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া মাঝবয়সী অশেষ মজুমদারকে অ্যাড্রেস করেই সজ্ঞমিত্রার বাপি পরিষ্কার গলায় বলতে থাকল, খুনী আর প্রেমিক ঘুরে ফিরে অকুস্থলে হানা দেবেই! জানেন তো অশেষবাবু!

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে নামতেই মাঝবয়সী অশেষ মজুমদারও ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, জানি ডাক্তারবাবু। এরকম একটা ক্লু, কোনো একটা গোয়েন্দা গল্পে পড়েছিলাম যেন।

ওপরে দাঁড়ানো দীপার চোখে নেমে যাওয়া অশেষ মুছে যাচ্ছিল। কেন না, তখন তার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। একবার মনে হল—অশেষের পিঠের দিকটা নিশ্চয়ই কোন ব্লটিং পেপার। যে ব্লটিং পেপার ওপর থেকে বর্ষানো অপমান চেটেপুটে শুষে নেয়। আশেপাশে কোন দাগ রাখে না।

ওপর থেকে ডক্টর বোস বলল, আমি জানতাম—একদিন না একদিন আপনি ঘুরে যাবেন।

অত কিছু ভেবে আসিনি ডাক্তারবাবু।

না ভেবে আসাটা আপনার ঠিক হয়নি কিন্তু।

স্বামীর এই শেষ কথায় একদম তেতো হয়ে গেল দীপা।

সে জোরে জোরে বলতে লাগল—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! বলতে বলতে ছুটে গিয়ে লিভিংরুমের পাশেই বড় শোবার ঘরে একটা আগুন লাগা শুকনো ডালের মত ঢুকে গেল।

ভীষণ পরিতৃপ্ত ডক্টর বোস তখনও সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। এবার তিনি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলেন! যকৃতের জারক রস বিষয়ে চটি বই

অনেকদিন খুলে দেখা হয়নি। এখন সেই বইখানা দু'হাতে মেলে ধরে বাইফোকাল কাচ ফুঁড়ে পড়তে চেষ্টা করতে লাগলেন। সোফায় শুয়ে শুয়ে। পায়ের জুতো—গায়ের কোট না খুলেই।

রাস্তায় নেমে সঙ্ঘমিত্রা বলল, বাপির কথা গায়ে মাখবেন না। মাকে ভীষণ ভালবাসে তো। তাই ওরকম। নয়তো খুব ভাল লোক। আমি জানি। বিশ্বাস করুন।

না না। মনে করার কি আছে। তোমরা তো আমার পর নও। বলেও উল্টো রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অশেষ মজুমদারের প্রথমেই মনে হল—সঙ্ঘমিত্রা তো বয়স আন্দাজে রীতিমত বুঝদার মেয়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে অশেষ মজুমদার দেখল—এই সাজানো গোছানো পাড়ার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া সুন্দর রাস্তাটা বাড়ির জঙ্গলে যেখানে হারিয়ে গেছে—সেখান থেকে আট দশ ফুট উঁচুতে—একেবারে নীচের আকাশে সবে পূর্ণিমা পেরনো চাঁদ রীতিমত অনুতপ্ত—নেশা কেটে আসা হাফ মাতালের চোখেই যেন পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করছে। ভাঙা হলুদ থালার ওপরে নানা দাগদাগালী।

সন্ধ্যায় সম্পন্ন ঘরবাড়িতে হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের ঘরে ফেরার মধুর কলরোল। এক একটা বসতি প্রায় এক একটা সভ্যতা। এরকম কত বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে এই বাতাসেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে আছে। তেমনি মানব-মানবীর ভালবাসার অনেক প্রেম তো বিয়ে সংসার জীবন করতে গিয়ে নিত্যদিনের ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল। তার ভেতর অশেষের মনে হচ্ছিল—আমার বিশ পঁচিশ বছর আগেকার প্রেম ভালবাসা যদি চাপা পড়ে গিয়েই থাকে—তা হা-হুতাশেরই বা কি আছে। বরং মধুর কোন স্মৃতি হিসেবেই তাকে তোলা থাকুক না। শুধু যা ডক্টর বোসের বিহেবিয়ার। মানুষের অপারেশন করেন। অথচ ওঁর স্নায়ু এরকম?

কে? চমকে ফিরে তাকাল অশেষ।

তার হাত দু'খানা ধরে ফেলে সঙ্ঘমিত্রা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাথা নিচু।

ও কি? তুমি কাঁদছ কেন? কখন এলে—

কান্নায় গলা বুঁজে যাচ্ছিল। তার ভেতরে সঙ্ঘমিত্রা বলল, ছুটতে ছুটতে এসে আপনাকে ধরলাম।

রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। তার ভেতর যতটা কম নজর কাড়া যায়—এমন ভাবেই অশেষ সঙ্ঘমিত্রাকে সান্ত্বনা দিয়েও একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

সঙ্ঘমিত্রা বলল, আমার বাবাকে ক্ষমা করবেন। বাবা কিন্তু খারাপ লোক নয়। মাকে ভালবাসেন কিনা—

তাই বুঝি তোমার মাকে খুব সন্দেহ করেন! ফস করে বলে ফেলে নিজেই খুব লজ্জায় পড়ল। হাজার হোক সঙ্ঘমিত্রা তার কাছে মেয়েরই মত।

সব সময় নয়। বিশ্বাস করুন। কোন কোন সময়ে হয়তো—

রাস্তার আলোয় সঙ্ঘমিত্রার চোখ চক চক করছিল। শাড়ির খুঁটে চোখ মুছে বলল, দেখবেন—নিজেই একদিন বাড়ি বয়ে গিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসবেন বাবা।

না ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। তুমি বাড়ি যাও।

যাই না। আপনাকে একটু দিয়ে আসি।

দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্ঘমিত্রার চোখে তাকাল অশেষ। এই সময় তুমি বেরিয়ে এলে—তোমার বাবা মা খুঁজবেন না?

এখন তো খানিকক্ষণ ওঁরা ঝগড়া করবে। তার চেয়ে ঘুরে আসি না আপনার সঙ্গে—

অশেষ দেখল, সঙ্ঘমিত্রার চোখের নিচে জলের ছাপ আর নেই। ভারি তো বয়স। তার বড় মেয়ে রুনুর চেয়ে ছোটই হবে। এটা ধরে ফেলার একটা কারণও আছে অশেষের।

তখনকার দীপা বলেছিল, আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছি অশেষ। বন্ধুই থাকব আমরা।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অশেষ। ভেতরে ব্যথাটা তখন আগুনের মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু চুপ করে ছিল।

দীপা আবার বলেছিল, আমার বিয়েতে তাই তোমাকে বন্ধু হিসেবেই হাজির হতে হবে।

তোমার বিয়ে? কার সঙ্গে?

অতটা ভেঙে পড়া উচিত নয় তোমার অশেষ। আমায় ভুলে যাও তুমি।

কেন? এসব কি বলছ তুমি?

আমি যেভাবে বড় হয়েছি—আমার বাবা চাইবেন না, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

এসব কথা এতদিন পরে দীপা ?

এক সময় তোমাকে বলতামই। সামনের ফাল্গুনেই আমার বিয়ে অশেষ। তাই অশেষ পড়িমরি করে ফাল্গুন আসার আগেই অন্যত্র বিয়ের বসে পড়েছিল। পরে শুনেছিল, দীপা সে ফাল্গুন পেরিয়ে পরের ফাল্গুনে বিয়ের পিঁড়িতে বসে।

তাই তার একটা আন্দাজ হয়—তার নিজের মেয়ে কন্থুর চেয়ে এই সঙ্ঘমিত্রা নিশ্চয়ই ছোট।

আপনি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেন না বুঝি ?

খুব বলি। দীপার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কথাই তো বলতাম।

মা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিল।

তা জানি না। তবে আমার চোখে খুব সুন্দর লাগতো। তখন সবে ফার্স্ট ইয়ার এম. বিতে ভর্তি হয়েছে দীপা।

আপনার চোখে যে সুন্দর লাগতো তা আমি জানি।

জায়গাটা মোড়ের মাথা। এখানেই এই সম্পন্ন বসতি এলাকা সাধারণ কলকাতার সঙ্গে ট্রাম, বাস, ঠেলা, ট্যাক্সি, লরিতে একাকার হয়ে গেছে।

তুমি এত সব জানো কি করে ? বোঝোই বা কি করে ?

বাঃ! আমি এখন একজন লেডি। আগেকার ঋষিদের ভাষায় রীতিমত ওম্যান—যুবতী হতে চলেছি। আমি বুঝবো না তো কে বুঝবে।

কিন্তু সেই কবে দীপাকে আমার কেমন লাগতো—তা তো তোমার জানার কথা নয় সঙ্ঘমিত্রা। তখন তো এ পৃথিবীতে তুমি আসোনি।

খুব অলৌকিক লাগছে ?—তাই না! খুব সিম্পিল। তবে শুনুন। মায়ের পুরনো ট্রাঙ্ক খুলে গুছিয়ে তুলে রাখা প্রায় দেড়শো চিঠি আমি একখানা একখানা করে পড়েছি।

ওরে দুষ্টু।

মোস্ট থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স। পড়া ইস্তক আপনাকে দেখার জন্যে আমার মনটা টান-টান হয়েছিল। বলতে পারেন—শুধু বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মি—চিঠিগুলো পড়ে আপনাকে না দেখেই আমি আপনার প্রেমে পড়ে যাই।

কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না অশেষ। সে এখন পঞ্চাশ। সঙ্ঘমিত্রার কি কুড়ি হয়েছে ? কে জানে! একি অসম্ভব—আজগুবি কথাবার্তা বলছে মেয়েটা।

সঙ্ঘমিত্রা তখন বলছিল, আপনার চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম—

আপনি কেমন দেখতে হবেন। মাথার সি থিতে একটু সাদা। ঢোলা হাতার পাঞ্জাবি। পায়ে কাবলি। কথা বলার সময় ঘাড়ের কলার-বোন পাঞ্জাবির বাইরে বেরিয়ে পড়বে খানিকটা। কেমন? মিলে যায়নি!

ঠিক এমনি করেই দীপা কথা বলতো একদিন। সেসব দিন, সন্ধ্যা—সব ভুলে গেছি। কিছুই আজ আর মনে পড়ে না। তোমার কথায় একটু-আধটু মনে পড়ে যাচ্ছে সঙ্ঘমিত্রা।

উঁহু। শুধু মিত্রা—শুধু মিত্রা বলবেন। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যায় না।

আমি যে কাজ নিয়ে বেরিয়েছি অনেক।

মেয়ের বিয়ের কাজ তো। করবেন। সব বাবাই করে। আমার সঙ্গে খানিক ঘুরুন তো। কতদিন আপনাকে দেখার ইচ্ছেটা পুষে রেখেছিলাম বলুন তো।

তুমি ছেলেমানুষ সঙ্ঘমিত্রা।

আবার?

হ্যা। তোমায় আমি পুরো নাম ধরেই ডাকবো। এমন সুন্দর একটা নাম। তার আবার কাটছাট হয় নাকি।

বাঃ। আপনি তো ভীষণ সুন্দর কথা বলতে পারেন।

তা তো হল সঙ্ঘ। কিন্তু ওদিকে তোমার মা-বাবা ঝগড়া করে বাড়িতে বসে থাকলেন। আর তুমি সেই ফাঁকে বেড়াতে বেরিয়ে এলে—শেষে খোঁজা-খুঁজি না শুরু হয়ে যায়?

রাখুন তো। ডাক্তারে ডাক্তারে ঝগড়া হয়ই। ওরা যতখানি স্বামী-স্ত্রী—বিশ্বাস করুন—ওরা ততখানিই ওয়ার্কিং পার্টনার। এখুনি সব মিটে যাবে। আর আমি তো একা একা বেরোই।

একটা ট্যাক্সি হাত তুলে দাঁড় করালো অশেষ। ভেতরে দু'জনে বসতেই ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইল—কোনদিকে যাবে?

অশেষ সঙ্ঘমিত্রার মুখে তাকাল। কোন্‌দিকে?

কেন? আপনার দীপার সঙ্গে যেসব জায়গায় যেতেন—তার একটা বলুন।

সেসব তো মনে নেই কিছু। তুমি আমায় ঠাট্টা করছো সঙ্ঘমিত্রা।

ঠাট্টা করতে কেউ এভাবে এতটা চলে আসে? আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। তোমায় বলতে হবে না। বোসো চুপটি করে—

তাকে তুমি বলায় পঞ্চাশ বছরের অশেষ ট্যাক্সির সিটের গর্তে আরও ডেবে

বসে গেল। তখন সঙ্ঘমিত্রা বলছিল—গোয়ালিয়র ঘাটের কাছে চলুন তো।

অশেষ বলল, ওখানে তো সেই ফ্লোটিং রেস্তোরাঁ। আর নেই—দীপা গান গেয়েছিল।

জানি। রেস্তোরাঁ ভেসে যায় একদিন ঝড়ে। দীপার গানের লাইন তুমি চিঠিতে লিখেছিলে অশেষ—

মেয়ের বিয়ের হিসেবপত্তর, টানাহ্যাঁচড়ায় রীতিমত ক্লান্ত অশেষ মজুমদার এই সদ্য যুবতী মেয়েটির মুখে তুমি তুমি শুনে বেশ আরাম পাচ্ছিল। মজাও পাচ্ছিল। এ একটা খেলা নিশ্চয়ই। সম্পন্ন বাড়ির মেয়ের এক বিকেলের খেলা। মায়ের প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের চিঠির তাড়া খুঁটে খুঁটে ভালবাসার দুঃখ-কষ্টের দানা সঞ্চয় করেছে অনেক। এখন সেই চিঠির ম্যাপকুট ধরে সঙ্ঘমিত্রা কি ভালবাসার কবরগুলো ইন্সপেকশন করতে চায়? কিংবা ওকি ওর মায়ের খোলসে ঢুকে পড়ে একটা বাসি ভালবাসার ঘুম ভাঙাবে—আর একটু একটু করে তার স্বাদ নেবে? স্মৃতি-বিস্মৃতি, ব্যথা-বিষাদে চুবিয়ে রাখা এইট ইয়ার্স ওল্ড? না, টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড?

গোয়ালিয়র ঘাটে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অশেষ বলল, সঙ্ঘ এসো। এ জায়গাটায় বসি।

না। এখানে অনেক লোক। চল জলের ধারে নেমে যাই—

না। ওখানটা অন্ধকার। নির্জন। ছিনতাই হতে পারে।

অত ভয় কিসের অশেষ! দীপা না হয় লেডিজ ছাতা হাতে সেদিন সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে ওখানে এসে বসেছিল। না-ই বা থাকলো ছাতা—কে আসবে আসুক। অত সহজে আমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।

প্রেমিকার ভূমিকায় এতটা সঙ্কল্পবদ্ধ—অথচ বয়স মোটে ওইটুকু—তারপর ভালবাসার উৎস আমারই লেখা নিরুপায় ভালবাসার কিছু চিঠি—এসব ভেবেই অশেষ আঁতকে উঠল! কী হচ্ছে সঙ্ঘ? উঠে এসো বলছি। তোমার মা-বাবা এতক্ষণে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন?

কোন জবাব না দিয়ে সঙ্ঘমিত্রা খোলা গলায় আস্তে আস্তে গাইতে শুরু করল। নদীর জলে ভাসন্ত নৌকোয় হেরিকেন। এই গানটাই দীপা এখানে বসে আস্তে আস্তে গেয়েছিল। তাও চিঠি পড়ে জেনে নিয়েছে সঙ্ঘমিত্রা।

তোমার পথের থেকে
আমার এ পথ
গেছে বেঁকে—গেছে বেঁকে-এ

চুপ কর সঞ্জু। চুপ কর। থামো বলছি—

কি'সের এক উত্তেজনায় অশেষ সঞ্জমিত্রার কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জু তাকে টেনে কাছে নিয়ে নিল। হ্যাঁচকা টানে টাল সামলে অশেষ বসতে না বসতেই দু-খানা হাতে শক্ত করে সঞ্জমিত্রা তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ছিঃ! ছিঃ!—বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেল অশেষ। বসার জায়গার দোষেই হয়তো—অশেষ একটু কাৎ হয়ে যেতেই সঞ্জমিত্রা ঝুঁকে পড়ল। তারপর নিজের গলার গান নিজেই অশেষের ঠোঁটে মুখ ঘষে মুছে ফেলল।

অ্যাই! বলে ছিটকে গেল অশেষ। এসব কি হচ্ছে? অ্যাঁ?

একথা শুনে একটুও চমকালো না সঞ্জমিত্রা। বরং আমলই দিল না অশেষকে। তারপর খুব আস্তে বলল, চুপ করো। ষাড়ের মত চেঁচিয়ো না। এটাই তো হবার কথা!

এই অবুঝকে কি বলবে ভেবে পেল না অশেষ। শুধু অবুঝ নয়। এঁচোড়ে পাকা। ওর জন্মের আগের একটা রোমান্সের রিপ্লে চায়—শুধু তাই নয়—তাতে আবার মেইন রোলে থাকতে চায়। যেমন আজগুবি। তেমনই পাগলামি। অশেষ চেঁচিয়ে বলল, উঠে এস। তোমায় মিনিবাসে তুলে দিয়ে তবে আমায় যেতে হবে। রাত হয়ে গেছে—

তাই নাকি!—বলে একদম আলোর ভেতর এসে দাঁড়াল সঞ্জমিত্রা।

সেদিকে তাকিয়ে অশেষ মজুমদারের চোখ ঝলসে গেল। সঞ্জমিত্রা এখন হাসিতে-ভঙ্গিতে একদম নায়িকা।

তখন জলের গা ঘেঁষে নৌকোয় দাঁড়িয়ে এক মাঝি বলল, নৌকো লাগবে সাহেব? নৌকো?

অশেষ ধমকে উঠল। না—।

সঞ্জমিত্রা মিষ্টি গলায় বলল, হ্যাঁ লাগবে। দাঁড়াও--বলেই অশেষের হাতখানা ধরে গোয়ালিয়র ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ভীষণ তাড়াতাড়ি নামতে লাগল। ধাপের কাছেই নৌকোর গলুই এসে লাগল।

এ যেন দীপারই মেয়ের বিয়ের আয়োজন।

তার মাঝখানে গিয়ে পড়েছে যেন অশেষ। এখুনি ডক্টর বোস এসে বলবেন, আবার আপনি? আপনি আবার কেন? আপনাকে না—?

রুণু ব্লাউজের লেডিজ দর্জিকে হাতার মাপ দিচ্ছিল। অশেষকে ঢুকতে দেখে

বলল, এ কি উড়নচণ্ডী চেহারা হয়েছে তোমার বাবা ?

অশেষ বলতে যাচ্ছিল, তোমার ভুল হচ্ছে সঙ্ঘমিত্রা। তোমার বাবা এখুনি এলেন বলে। আমি শুধু একটা কথা বলেই চলে যাব।

কিন্তু কিছু বলার আগেই কণু বলল, এত রাত করলে ? ক্রিম ডেলিভারি দিয়ে গেছে। কিন্তু স্ট্যাণ্ড দিয়ে যায়নি।

অশেষ কোন কথা না বলে খোলা ইজিচেয়ারটার বুকে নিজেকে ঢেলে দিল।

কণুর মা আর ছোট বোন টুমু ঘরে ঢুকল একসঙ্গে। ঢুকেই ওদের মা চেঁচিয়ে বলল, সেখানে নেমন্তন্ন করতে যাওনি ?

হ্যাঁ। গেছি। যাব না কেন ?

ওরা তো তোমায় পোছেও না।

এইতো ওদের সঙ্ঘমিত্রার বিয়ের বাজার দেখতে এলাম—বলেই অশেষ বুঝল, কতবড় কেলেঙ্কারি করে বসল সে।

কণু, টুমু ওদের মা কৃষ্ণা বলল, সঙ্ঘমিত্রা ? কে সঙ্ঘমিত্রা ?

ধ্যাৎ ! খাটাখাটনিতে মাথার ঠিক নেই। ওদের মেয়ের নাম সঙ্ঘমিত্রা। ভারি ভাল মেয়ে। আজই প্রথম দেখলাম। নেমন্তন্ন করতে গিয়ে আলাপ হল।

কত বড় হয়েছে ?

কলেজে পড়ে। কণুর চেয়ে অল্প ছোট।

দীপা ছিলেন ?

সবাই ছিলেন।

তাইতো বলি। নিজের মেয়ের বিয়ের কাজকর্ম থেকে একদম উধাও—কোথায় গেলেন ! তা একদম জমে গিয়েছিলে সেখানে—

টুমু বলল, কেন মা বাবাকে শুধু শুধু হুল ফোটাচ্ছ ? পুরনো বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করতে গেলে একটু বসতে হয়। তুমি গেলেও তাই হোত।

ওসব জায়গায় যেতে হলে আমায় নেয় নাকি সঙ্গে।

বাজে কথা বলছ কেন কৃষ্ণা ?

টুমু, কণু—একই সঙ্গে তাদের বাবার দিকে তাকাল। বাবা—

অশেষ মজুমদার কোন জবাব দিল না।

মেয়েরা আবার একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। ও বাবা—কি হয়েছে তোমার ?

কৃষ্ণা একটুও তাকাল না স্বামীর দিকে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

বলল, বুড়ো বয়সে ভীমরতি! আগেকার বদমাইসি যাবে কোথায়?

সাধারণ গেরস্থপাড়ার ভাড়া বাড়ি। রাত পৌনে দশটা। সব ঘরে আলো জ্বলছে। গরম বলে পাখাগুলোও ঘুরছে। সব ঘরেই বিয়ের কেনাকাটার জিনিস কিছু কিছু ছড়ানো। কিছু গোছানো। আর ক'দিন বাদেই বিয়ে। গয়না এসে গেছে। এসে গেছে বেনারসী, প্রণামী, কসমেটিক্স। সারা ঘরবাড়িতে নতুন জিনিসের গন্ধ।

রুণু খাটে বসে কোন শব্দ না করে কাঁদতে লাগল।

আর ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অশেষ বলতে লাগল, তোমার সঙ্গে তো কোনদিন বদমাইসি করিনি কৃষ্ণা।

আঃ! হচ্ছে কি! ক'দিন বাদে বড় মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ—আর নিজের গুণপনা নিজেই সাত কাহন করে গাইতে বসলে?

কৃষ্ণার এ কথায় ধপাস করে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল অশেষ। পরে সবার সঙ্গে খেতে বসল। কিন্তু একটিও কথা বলল না। সবাই শুয়ে পড়লে নেমন্তন্ন করার নামের তালিকা নিয়ে বসল। কাকে রাখা যায়। কাকে বাদ দেওয়া যায়। খরচ কোথায় কতটা কমানো যায়—

ভদ্রতার মলম মাখিয়ে তারই এক নিঃশব্দ কুস্তি চলতে লাগল।

এক জায়গায় লেখা—ডঃ দীপা বসু—৩

তার মানে দীপা, দীপার মেয়ে আর ডক্টর বোস। খানিকক্ষণ নামটার দিকে তাকিয়ে হিসেবপত্তর ফেলে উঠে দাঁড়াল অশেষ। তার টেবিল-ল্যাম্পের বাইরে সারাটা বাড়ি অন্ধকার এখন। সবাই ঘুমে।

অশেষ পাশের ঘরে গিয়ে বাইরের লোকের ওঠা বসার চৌকির তলা থেকে একটা পুরনো বেতের ঝাঁপি টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে একপাল আরশোলা উঠে এসে তাদের পক্ষে আরও নিরাপদ অন্ধকারে চলে গেল।

রুমালটায় টোকা দিতেই ধুলো উড়ল। বিশ বাইশ বছর আগেকার গিঁট। ফাল্গুনে বিয়ে করব বলেছিল দীপা। সাত তাড়াতাড়ি তাই মাঘেই বিয়েতে বসতে হয়েছিল অশেষের। সেই তখনকার রুমাল দিয়ে গিঁট বেঁধে তুলে রাখা দীপার লেখা চিঠির তাড়া।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় যতটা দেখা যায়—নয়তো এ ঘরও অন্ধকার।

লোডশেডিংয়ের ছোট টর্চটার বোতাম টিপল। ফ্যাকাশে হয়ে আসা কালি? না, চোখের চশমায় ময়লা পড়ল? পয়লা লাইনটা পড়া গেল—

ওগো। তুমি যে আমার একেবারে নিজের।…

আরেক জায়গায় কয়েক লাইন লেখার পর অনেকটা জুড়ে দুটি ঠোঁটের দাগ। দীপা তখন নিজের ঠোঁটের লিপস্টিকের ওপর চিঠির পাতা চেপে ধরে ছাপ তুলে নিত। সেই ছাপের নিচে ফাঁকা জায়গায় কখনো ইংরিজি কবিতার লাইন লিখে দিত—কখনো লিখত—আর কতদিন? আর কতদিন এভাবে? বলতে পার।

চিঠি পড়তে পড়তে অশেষ মেঝেয় বসে পড়ল। অমনি দুটো ধেড়ে ইঁদুর ছুট লাগাল। তাদের পায়ের গুঁতোয় উল্টো করে রাখা একটা কাচের গ্লাস ভেঙে গেল। সেই শব্দে বিছানার ভেতর থেকে কৃষ্ণা ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল, আবার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসলে? রাতে যে একটু ঘুমুব—তারও কোন উপায় নেই।

কৃষ্ণা আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরতেই অশেষ আবার টর্চ জ্বালল। এবারে সেই চিঠির লাইন ভেসে উঠল—আজ দেড় বছর হল বিলেতে পড়তে এসে একটি দিনও আমার ভাল লাগে না। হ্যাম্পস্টিড হিথের এই সাজানো রাস্তা-ঘাটে সবুজ গাছপালার ভেতর মোড় ঘুরতে গিয়ে মনে হয়—এই বুঝি তুমি উল্টোদিক থেকে তোমার বিশেষ ভঙ্গীতে হেঁটে আসছো। এক্ষুণি দেখা হবে।

টর্চ নিভিয়ে অশেষ নিজের টেবিলে এসে বসল। তারপর ভূতে পাওয়া স্পীডে একটানা লিখে গেল—

প্রাণের দীপা,

ভাগ্যিস আমাদের দু'জনের কারও আজও বিয়েই হয়নি। অথচ তুমি আর আমি কি এক বিরাট ভুলের মাশুল গুণে যাচ্ছিলাম। যেন বিয়ে করে আমার ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে—বউ আছে একজন! আশ্চর্য! এসব কিছুই যে নেই তা আজ বুঝলাম গোয়ালিয়র ঘাটে গিয়ে—তোমার সঙ্গে।

ঠিক তেমনি তোমারও একটা বড় ভুল ধারণা—যেন তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। আসলে কিছুই হয়নি তোমার। ডক্টর বোস বা সঙ্ঘমিত্রা বোস বলে তোমার কিন্তু কেউ নেই। ওরা অন্য কেউ।

আবার আমরা আগের মত হয়ে গেছি। ভুল বোঝাবুঝিতে অনেকগুলো বছর বয়স বেড়ে গেছে।

কাল বেলা তিনটেয় ন্যাশনাল লাইব্রেরির বারান্দায় দেখা হচ্ছে। চুমু নিও।

তোমারই অশেষ

ভোর হতেই মেয়ের বিয়ের টিকিট লাগানো খামে চিঠিখানা ভরে মুখ বন্ধ করল। তারপর ঠিকানা লিখে নিজেই পাড়ার মোড়ের ডাকবাক্সে গিয়ে

ফেলে দিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, কৃষ্ণা তার আর নিজের জন্তে চা করছে। নিজেকে এই আয়োজনের বাইরে রাখতেই যেন অশেষ ভাড়া-বাড়ির বারান্দায় রাখা বারোয়ারি বেঞ্চে গিয়ে বসল।

চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে আসতে আসতে অশেষকে ওখানে বসতে দেখে কৃষ্ণা অবাক হল।

কি ব্যাপার? তুমি এই বাইরের বেঞ্চে?--কৃষ্ণার এ কথায় অশেষ কোন জবাবই দিতে পারল না। কেন না, কৃষ্ণা হাতের কাপটা ছুঁড়তে যাচ্ছিল।

সেটা দু-হাতে আটকে দাঁড়াল অশেষ। এই ভাবেই অশেষ নিজেকে বাঁচিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছো? আমি হাসব না কাঁদব? ক'দিন বাদে তোমার মেয়ের বিয়ে। কাল থেকে কাজের মেয়েটা আসছে না—আর তুমি ভান করছ যেন বেড়াতে এসেছো। তার ওপর কাল রাত থেকে কি নতুন থিয়েটার শুরু করেছো···

ময়না কাজে আসছে না?

ময়না আসেনি। আসেনি ময়নার মা।

ময়নার বাবা হয়তো দু'জনকেই পিটিয়েছে।

কৃষ্ণা বলল, ওতো ময়নার বাবা নয়।

কি বলছো কৃষ্ণা? ময়নার মায়ের স্বামী তো লোকটা—

আমি কিছু বুঝতে পারছি না—না তাও নয়।

তাহলে এই বিয়ে আমার মেয়েরও নয়। কারণ, আমার বিয়েই হয়নি।

শোন। শোন—কোথায় চললে সাতসকালে—

প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে অশেষ গঙ্গার গায়ে সাধুঘাটে হাজির হল। কাছাকাছি গানসেল ফ্যাক্টরি। ব্যাটারি কোম্পানী। গঙ্গার জল ঘেঁষে শিবের মন্দির। এখানেই—এখানেই তো নীলামদার রামেকাবাবুর গুদাম। নীলামে দুনিয়ার তাবৎ মাল কিনে এনে রামেকাবাবু সেখানে জমা করেন। আর ময়নার বাবা এই ফাঁক: গোডাউনে বসে একা একা সেইসব মালের জং ছাড়ায়—সেইসব মাল রোদে শুকোয়—কিংবা রং করে নতুন করে ফেলে। দশ টাকা রোজে।

একেবারে গোড়ায় ময়না অশেষদের বাড়ি কাজ করতে আসে। তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে। মুখে কোন চাওয়া নেই। হাসি নেই। কান্না নেই।

কাজটি করে নিঃশব্দে চলে যেত। নিচের কল থেকে খাবার জল এনে দিত। কাপড়ও কেচে আনতো নিচের কর্পোরেশনের জলে। বাড়ির ডিপ টিউবয়েলের জলে বাসনমাজা—ঘর মোছা।

এই ময়নাই একদিন কৃষ্ণাকে বলেছিল—জানো—বাপটা আমার হারামি আছে। কোথাও শুনেছ—মেয়েকে নিয়ে বাপ এক বিছানায় শোয়? ঘুম থেকে উঠে মেয়ের গালে বাপ চুমা খায়?

কৃষ্ণা একথা অশেষকে ব'লে বলেছিল খবর্দার কাউকে বোলো না। ময়না বিশ্বাস ক'রে আমায় বলেছে। ওর বাপের কানে কথাটা উঠলে ময়নার কিন্তু রক্ষে থাকবে না।

ময়না যদি ওর মেয়ে না হয়—ময়নার মা যদি ওর বউ না হয়—তাহলে বিরিঞ্চি সিং তো অবিবাহিত। এই বিরিঞ্চি—বিরিঞ্চি—বলতে বলতে অশেষ মজুমদার পুরনো মালে ঠাসা গোডাউনে ঢুকে পড়ল।

ফর্সা সাদা রঙের বিরিঞ্চি সিং এই চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন। সাদা কালো গোঁফে মোম দিয়ে তার খুব চেকনাই। সে উবু হয়ে বসে জমা সিমেন্টের ডেলা হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করছিল। সামনেই লোহার মিহি চালুনি। গুঁড়ো সিমেন্ট এই চালুনিতে ছেকে আবার যে কে সেই করে ফেলা হবে। এই গোডাউন থেকেই নরম সিমেন্ট, ভিজে এসাচ কিংবা কিছুটা লাল হয়ে যাওয়া ইউরিয়া বাজারে যায়।

এই বিরিঞ্চি সিং--

কেয়া?—বলেই একলাফে উঠে দাঁড়াল লোকটা। বসা অবস্থা থেকে ঘুরে উঠে দাঁড়াল—হাতে সিমেন্ট গুঁড়ো করার হাতুড়ি—লাল চোখ। অশেষ একটু পিছিয়ে গেল।

তোমার মেয়ে বউ—কেউই কাজে যায়নি কাল থেকে—কি ব্যাপার?

সে হাপনার মনকে পুছ করুন। হাপনাদের ভদ্দর লোকের মন।

বিরিঞ্চির মুখে হাসি—চোখ লাল—হাতে হাতুড়ি—লুঙির নিচে পায়ে জিভ বেরকরা বুট—গায়ে এই ভোরবেলাতেই ঘামে ভিজে হলদে ফাইন গেঞ্জি।

কি আবার পুছ করবো? কাজের বাড়ি ডুব দেবে কেন? তোমাদের অসুখবিসুখে—কাজকর্মে সবসময় আমরা অ্যাডভান্স দিয়ে যাচ্ছি।

অ্যাডভান্স পাইপয়সা কেটে লেন তো?

হাঁ। তা তো নেবোই।

তাহলে বলুন কেন—হাপনি ভদ্দরলোক হইয়ে হামার জেনানার হাত

চেইপে ধরেছেন ? কেন ?

আমি ? কখন ?—অবাক হয়েও চোখ রাখলো অশেষ ! বলা যায় না—হয়তো দু'ষা হাতুড়ি বসিয়ে দিল।

ময়নার মা হাপনার ঘর মুছছিল। হাপনি টেবিলে বসে বড়দিদির বিয়ের ফর্দ লিখছিলেন। এমন সময় ময়নার মা যখন টেবিলের নিচে গেল মুছতে—হাপনি পা দিয়ে ময়নার মায়ের হাত চেইপে ধরেননি ?

কি মুস্কিল ! আমি কি দেখতে পেয়েছি ওর হাত ? আমার কি কোন মতলব থাকতে পারে ? হিসেব করছি টেবিলে বসে—নিচে আমার পা তো যেখানে সেখানে লাগতেই পারে।

বিষয়টা এমনই যে জোরে বলা যায় না। কেউ যদি ফস করে মিটমাট করিয়ে দিতে আসে—তো কেলেঙ্কারি ছড়াতে বেশি দেরি হবে না।

ময়নার বন্ধু পাড়ারই রিক্সাওয়ালা আর সিনেমা হলের ব্ল্যাকারবা। তার দু'জন দু'জন করে ময়নাকে জয়শ্রী, অনন্যা নয়তো রিজেন্টে নেমন্তন্ন করে আগে থেকে টিকিট কেটে রাখে নতুন ছবির। সাইকেলে রডে বসে ময়না পায়ে চটির ওপর পাইজোড় চিকচিক করে। পায়ের আঙুলে চুটকি। গায়ে টাইট সালওয়ার কামিজ। হাতে কনুই অব্দি কাচের চুড়ি, নাকে কাচ বসানো নাকছাবি, চোখে কাজল। রিক্সাওয়ালাদের একজন সাইকেল চালায় —অন্যজন পেছনের সিটে বসে গান গায় আর তুড়ি দেয়। এরাই সিনেমা হলে দু'জনের মঝেখানে ময়নাকে বসায়।

এসব একদিন বিরিঞ্চিই বলেছিল অশেষকে। তখনও অশেষ জানে না—ময়না আসলে বিরিঞ্চির মেয়ে নয়।

ময়নাকে কাজে পাঠিয়েও সুস্থির থাকত না বিরিঞ্চি। ছুটে ছুটে আসত। এসে জানতে চাইত—ময়না কুথায় বাবু ?

এই তো ছিল। বাড়ি গেছে—

হামি বাড়ি থেকে আসছি। ও তো বাড়ি যায়নি। বড় বদমাইস বনে গেছে। কুথা থেকে ছেলে জুটাইয়ে সিনেমায় ভি যায় আজকাল।

ওর তো সাধ আহ্লাদ আছে। ওইটুকু মেয়ে কি সারা-জীবন ঘর মুছবে ? কাপড় কাচবে ?

হ বাবু। সে তো হামি ভি বুঝি। ঘুম থেকে উঠলে দিনভর হাত-খরচা

দো রূপেয়া দিয়ে থাকি।

কি বলছ বিরিঞ্চি? আমার বাড়ি মাসভর কাজ করে পায় চল্লিশ টাকা তিন বাড়ির ঠিকে ধরলে না হয় একশো টাকা পায়। আর তাকে হাত-খরচ দিচ্ছ মাসে ষাট? তাও তোমার দিন মজুরি দশ থেকে?

বিরিঞ্চি চলে যেতেই সেদিন কৃষ্ণা চা দিতে এলে কথাটা ব'লে অশেষ বলেছিল, মেয়েকে ভীষণ ভালবাসে বিরিঞ্চি।

কৃষ্ণা বলেছিল, ভালবাসে না ছাই।

কি বলছ কৃষ্ণা?

ঠিকই বলছি। দশ টাকা যার রোজ—সে সেই দশ টাকা থেকে দু'টাকা দেয় মেয়েকে হাত-খরচ করতে?

তাইতো দিচ্ছে।

সে জন্যেই তো বলছি—ছাই ভালবাসে। পুরুষ মাত্রেই বদমাইশ। পুরুষের গুণে নুন দেবার জায়গা নেই।

নির্জন গোডাউন। বাইরেই জলে যাওয়া রোদ। ভেতরে হরেক দামী জিনিসের পাহাড়। তবে সবই খুতো জিনিস। হয় জলে ভেজা—না হয় রোদে পোড়া—কিংবা দলা পাকানো।

খুব ভারি গলায় অশেষ মজুমদার জানতে চাইল—হলফ করে বলতে পার—ময়না তোমার মেয়ে? ময়নার মা তোমার বউ? সত্যি করে বল তো বিরিঞ্চি। তুমি বেনারসের লোক। আর ময়নার মায়ের দেশ তো বালিয়া জেলা—

ময়না আমার মেয়ের চেয়ে বেশি। এতটুকু যখন—তখন ওর মা ওকে নিয়ে হামার সঙ্গে চলে আসে।

চলে আসে! তার মানে অন্য কারও বউ ছিল?

ছিল তো। কি হবে তাতে? হামার খাটাল ছিল। ময়নার দিদিমা গোবর নিত। তখন ময়নার মা ময়নাকে কোলে নিয়ে শশুরাল থেকে ফিরে আসে। আমি তখন বাচ্চাশুদ্ধ মেয়েটাকে নিয়ে নিলাম।

আর দেশে যে তোমার বউ ছিল।

এখনও ভি আছে। পাঁচ ছেলে আছে। তাদের লড়কালড়কি ভি আছে। তাতে কি হইল? ওরা সব ভি জানে। লেড়কাদের মা এসে ফি বছর দেখে

হামাকে। তিন-চারদিন থাকে। তখন ময়না—ময়নার মা অন্য জায়গায় চলে যায়।

অ।

অতি সম্প্রতি কলকাতার দুটি নার্সিংহোমে অপারেশনের আগে ঠিকমত অজ্ঞান না করায় দু'জনরোগী অপারেশনের পর আর চোখ মেলেনি।

ডক্টর পরিতোষ বোস এসব ব্যাপারে তাই খুব খুঁতখুঁতে। তিনি তার স্ত্রী ডক্টর দীপা বসুকে চোখের ইসারায় প্রশ্ন করলেন—সব ঠিক আছে তো?

ডক্টর মিসেস ডি বসু আভাসে জানালেন, চিন্তার কিছু নেই। গো অ্যাহেড।

অ্যানাসথেসিস্টের কাজ অজ্ঞান করা। পেসেণ্ট অজ্ঞান হলে অ্যানাসথেসিস্ট অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু দীপা তা করল না। সে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল—তার স্বামী কী নিখুঁত অঙ্কে মানুষ কেটে আবার জোড়া দেয়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে নার্সিং হোমের টপ ফ্লোরে দু'জন মুখোমুখি বসল। খোলা জানলার বাইরে চমৎকার বিকেল। গরমকালের পাগলা বাতাসে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দু'জনই জানে—দু'জনের ওয়ালেট একশো টাকার নোটে ফেটে পড়ছে। বাড়ি গাড়ি দুই-ই আছে। আছে সাজানো চেম্বার। উপরন্তু এই নার্সিং হোম। নীরোগ শরীর। পড়াশুনোয় ভাল একটি মেয়েও আছে। দু'-জনই নার্সিং হোমের ক্যান্টিন থেকে পেপে মেশানো কচি মুরগির স্টু নিয়েছে। সঙ্গে আঙুর চটকে তৈরি রস। অঙ্গিরা।

খাবার পর পরিতোষ জানতে চাইল. তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন?

বাড়িতে। তুমি?

আমি একটু রোটারি ক্লাবে যাব। চেকটা দিয়ে আসি।

একসঙ্গে বাড়ি ফিরি চল। অনেকদিন সন্ধ্যেবেলা বসে গল্পগাছা হয় না।

উপায় নেই দীপা। এই চিঠিটা নাও। তোমায় লেখা। যেতে যেতে পথে পড়ে নিও।

চমকে গেল ডক্টর মিসেস দীপা বসু। চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখল, শুভ-বিবাহের খাম।

খামের ভেতর কি আছে তখনো তা জানে না দীপা। দু'জন একই সঙ্গে

লিফ্‌টে নিচে নেমে এল। একখানা ফিয়েট চলে গেল রোটারি ক্লাবের দিকে। আরেকখানা মারুতি—নিউ আলিপুরের দিকে।

লিণ্ডলা প্ল্যানেটোরিয়াম পার হতে না হতে চিঠি পড়া হয়ে গেল দীপার। কী সর্বনাশ। এসব কথা কি অশেষ সুস্থ অবস্থায় লিখেছে? পরিতোষ, সজ্ঞমিত্রা—ওরা আমার কেউ নয়। ওরা অন্য কেউ। ওর নাকি বিয়ে হয়নি। আমারও নাকি হয়নি। ও তাহলে কার মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিল? আচমকা মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? এ বয়সে বদ বুদ্ধি নিয়ে এমন চিঠি লেখার মানুষ অশেষ কোনদিনই নয়।

দোতলায় উঠেই মেয়েকে ডাকল দীপা। অতক্ষণ কি করছিলি সেদিন অশেষের সঙ্গে?

কিছু না গো মা। কেন? ভদ্রলোকের ঘোর তাই কাটে না। যেন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। আসলে মানুষটা তোমায় ভীষণ ভালবাসত। একদম ভুলতে পারেনি।

ধমকে উঠল দীপা। পাকামি করতে হবে না।—আবার নিজের মনে মনে বলল, অশেষ আমায় এখনো ভালবাসে? আমাকে খানিক পেলেও ভোলা কঠিন।—আমার কথা কিছু বলেছিলি?

না তো।

এখন কি করছিলি?

সেই চিঠিগুলো দেখছিলাম মা—

আবার? তোকে না বারণ করেছি—ধরবি না। কি দরকার ছিল সেদিন ওর সঙ্গে সঙ্গে বেরোবার—

এখন তো আর অশেষবাবু তোমার প্রেমিক নয় মা। এখনো তাকে তুমি দখলে রাখতে চাইছ? কতদিক একসঙ্গে আগলাবে।

সজ্ঞমিত্রার মুখে হাসি—নেহাৎ রসিকতা? না, বিয়ের এতদিন পরেও একজন পরপুরুষকে বেঁধে রাখার ক্ষমতায় মাকে মেয়ের ঈর্ষা—তা ধরতে পারল না দীপা।

সজ্ঞমিত্রা আবারও হাসতে হাসতে বলল, খুবই সাধারণ সরল মানুষ। একটু আসকারা দিলেই গলে পড়েন ভদ্রলোক।

কি বলছিস? অশেষের সঙ্গে তোর আবার আসকারার প্রশ্ন কিসের?

নাঃ। তা বলছি না। ভদ্রলোক ভারি নরম। সিধে—

এত অল্প সময়ে এতটা বুঝলি কি করে?

তার আগে বলতো মা—কি করে না বলেছিলে অমন লোককে।—অতটা এগিয়ে গিয়েও ফেরার পথ রাখতে একদম ভুলে যাওনি।

চুপ কর। খানিকক্ষণ একসঙ্গে থেকে কী না কী করে দিয়েছিল লোকটায় —দেখ এই চিঠি পড়ে—

কলকাতার গরমকালের আরেকটা সন্ধ্যা এসে গেল। দূরে রাস্তায় বাসের পাদানীতে অফিস-ফেরৎ বাঙালী ভদ্রলোকদের ভিড়। বহু কষ্টে যারা মধ্য-বিত্ত হয়ে টিকে থাকার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে - তাদের বাড়ির বউয়েরাও কয়লার উনুনে এবার আঁচ দেবে। অনিচ্ছুক বেকার যুবকরাও সন্ধ্যের টিউ-শনিতে বেরিয়ে পড়ল বলে।

চিঠি পড়ে চোখ তুলল সঙ্ঘমিত্রা। এর আমি কি করতে পারি?

তুই ই জানিস।

না মা। এজন্যে তুমিই দায়ী।—একথা বলেও মনে মনে সঙ্ঘমিত্রা শিওর হল - এ চিঠি আমাকেই লেখা আমাকেই লেখা। সেদিন সন্ধ্যায় আমিই ছিলাম দীপা। সঙ্ঘমিত্রার তখনই ইচ্ছে হল—একা ছাদে গিয়ে ওঠে। ফাঁকা ছাদে সন্ধ্যার এলোপাথাড়ি বাতাসের সঙ্গে মাথার চুল খুলে দিয়ে থাকে—আর গায়—একটিই গান—

এ চিঠি আমাকেই লেখা
আমাকেই লেখা-আ
এজন্যে আমিই দায়ী
আমিই দায়ী-ই
সে সন্ধ্যায় যে আমিই ছিলাম দীপা
আমিই ছিলাম দীপা-আ

খোলা চিঠিখানা সামনের হোয়াট নটের ওপর পড়ে থাকল। তার দু-পাশে দুজন রমণী। একজন অন্যজনের মা। একটু অন্যরকম হলেই এই একজন আরেকজনের মা হতে পারত। এই একজন আরেকজনের মেয়ে হতে পারত।

খানিক বাদে দীপা উঠে এসে চিঠিখানা হাতে নিল। নিয়ে নিজের ঘরে যাবার আগে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল - তুই। তুই-ই। নিশ্চয়ই তুই—

না মা। তুমি। তুমি-ই। নিশ্চয়ই তুমি—

উঁহু। আর কেউ নয়। একা তুই।

না মা। আর কেউ নয়। একা তুমি।

ব্যর্থ, পরাস্ত ডক্টর মিসেস দীপা বসু মেয়ের ওপর একরকম আক্রোশ নিয়েই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রোটারি ক্লাব থেকে ফিরে পরিতোষও নিশ্চয়ই এ চিঠির ওপর একহাত নেবে তাকে। সত্যি সত্যিই অশেষের মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো।

সজ্যমিত্রা একা একা ছাদে উঠে গেল। অন্ধকার ছাদ থেকে সে ফাঁকা মাঠের বাতাস টের পেল। দু'হাতে খোঁপা এলো করে দিয়ে বাতাসের মুখে দাঁড়াল। তারপর একটু আগে মনে মনে তৈরি করা গানটা খুব চেনা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে বসিয়ে বসিয়ে গাইতে লাগল—

এ চিঠি আমাকেই লেখা-আ-আ
আমাকেই লেখা—
এজন্যে আমিই দায়ী-ই-ই—
আমিই দায়ী-ই

আকাশ কালো করে মেঘ ওঠার চেষ্টা করছিল। বালিগঞ্জ স্টেশনের দিক থেকে। বাতাস দিব্যি থাপ্পড় মেরে মেঘদের উঠতে দিচ্ছিল না। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দীপা বুঝল—পাঁচ ছ'টা হাই রাইজের ফাঁক দিয়ে ওদিককার দিগন্ত যেটুকু—তা দিয়ে এখন পাখিদের ঘরে ফেরা দেখা যাবে না। অন্যদিন তার এই সময় মনে হয়—ফেলে আসা জীবন থেকে ধুলো মেখে পাখি-গুলো সিধে তার দিকে উড়ে আসে সন্ধ্যের মুখে। দিগন্ত থেকে উড়তে উড়তে তারা এসে দীপার চোখে ঢুকে যায়। তখনই ঝুপঝাপ সন্ধ্যে নামতে থাকে।

নিজের মেয়ে পর্যন্ত তার কথা শোনে না। সজ্যমিত্রা এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে তার মাকে লেখা চিঠিগুলো পড়ে—মা হয়ে দীপার এটা একদম অপছন্দ। চিঠিগুলো পড়ছে আর মেয়েটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কেমন কথায় কথায় হাসে। অথচ অত হাসি তো সব কথায় থাকে না। সেই সঙ্গে একরোখা ভাব। কেমন বলল—মা—তুমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে অমন নরম মানুষকে শেষে না বলে সরে এলে কি করে?

অশেষ কতটা নরম—তার তুই জানিস কি! না তোর জানার সময় হয়েছে। আর অশেষ দিব্যি লিখে দিল—আমাদের বিয়েই হয়নি। তার মানে আমাদের আগের অবস্থাতেই আমরা আছি। আমি বিদেশে আমার স্পেশাল কোর্স করছি কলম্বো প্ল্যান স্কলার হিসেবে—আর দেশে বার বার

খোঁজ নিচ্ছি—আমার হবু বর অশেষ মজুমদার কোন ভদ্রস্থ চাকরি পেল কিনা? উঃ! সে কি টেনশন। চাকরির জন্যে অপেক্ষা। ভাল খবরের আশায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা। ঠিক এই সময়েই ইণ্ডিয়া হাউসের বারান্দায় একদিন পরিতোষের সঙ্গে আলাপ। যদি এ আলাপ না হত।

আকাশে বহু উঁচুতে যখন একটা তারা খসে পড়ে—ঠিক তখনই অনেক নিচে জি টি রোডে কালিয়ার মোড়ে দুই লরিতে হেড অন কলিশন হয় অনেক সময়। অথচ তারা জানল না লরির দশা। লরি জানল না তারার দশা।

দেখাই যাক না—ঠিক এই মুহূর্তে দীপার পাশাপাশি অন্যরা কে কি করছে?

সন্ধ্যের মুখে লোডশেডিং হওয়ায় হেরিকেন ধরাচ্ছিল কৃষ্ণা। ফিতে পরাবার মুখে মনে হল—ময়না মেয়েটা হেরিকেনগুলো ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রাখত। ময়না আর আসে না কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার অনেককিছু মনে পড়ল।

ময়না কাজে এলেই রামেকার গোডাউন থেকে বিরিঞ্চি আসত। ময়না হ্যায়?

হাঁ। আছে। কেন?

না। আছে কিনা জানলাম মাইজি। বড় বদমাইশ আছে। আপনার বাড়ির নাম করে বদ ছোকরাদের সঙ্গে সিনেমায় যায়। কুথা কুথা চলে যায়। রাত দশ বাজে ঘুমে ফিরে তবে বাড়ি ফেরে।

আবার কোনদিন হয়তো খোঁজ নিতে এসে বিরিঞ্চি সিং কৃষ্ণার মুখে শুনল, ময়না? ময়না তো কাজ সেরে দিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে—

একথা শুনে বিরিঞ্চি সিংয়ের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ত। কি বলছেন মাইজী? এখন হামি কোথায় ওকে খুঁজে পাব মাইজী? ইতো বড় শহর—

কৃষ্ণার মনে হত—পরের বাচ্চাকে একদম নিজের মেয়ে করে মানুষ করেছে তো। কিন্তু ময়না যেদিন তাকে বলল আমার বাবাটা জানো বড় হারামি আছে। কোন বাপ কি তার মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শোয়। ঘুম থেকে উঠে গালে চুমু দেয়?

সেদিন থেকেই লোকটাকে দেখলে ঘেন্না হয় কৃষ্ণার। এতদিন দরকার ছিল ময়নার মাকে। এখন দরকার ময়নাকে। মেয়েটার সবে বুক ফুটছে।

সারাদিন বেয়াড়া গরমের পর সন্ধ্যার ঠাণ্ডা অন্ধকার মাঠে অর্ডিনান্স ক্লাব সরগরম। ক্লাব বাড়ির বারান্দায় ঝাড় লণ্ঠন। সে বারান্দায় থালার ওপর

গ্লাস সাজিয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেয়ারার দল অন্ধকার মাঠের টেবিলে টেবিলে এসে পসরা নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

তারই একটার টেবিলে বসে রোটারিয়ান ডক্টর বসু তার সঙ্গী ডাক্তার রোটারিয়ানকে বলল, আচ্ছা শান্তিদা—আজ যদি কেউ তোমার বউকে বলে—এই ডাক্তার শান্তি দত্ত—তার মেয়ে রেখা দত্ত তোমার কেউ নয়। ওরা অন্য কেউ। তাহলে তোমার কী ইচ্ছে করে?

অন্ধকারের ভেতর ডক্টর শান্তি দত্ত চারটে পেগ খাবার জলের মত খেয়ে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। মেডিসিনে এম ডি। সে খুব শান্ত গলায় বলল, লোকটা কে?

ধর তোমার ওয়াইফের এক্স লাভার—

তাহলে সে। গুলিই করে দিতাম।

আমি উঠছি শান্তিদা—

এখুনি? আরে। কোথায় চললে?

যাই গুলি করে আসি।

হ্যাঁ। যাও। তাড়াতাড়ি করে এসো। হয়ে গেলেই চলে আসবে কিন্তু।

রবি বলল, বিয়ের কনে হবে আর ক'দিন বাদেই। এভাবে বেরিয়ে আসতে পারলে? তারপর এটা একটা মদের দোকান।

মেয়েরাও তো আসে দেখছি। আর তোমায় এখানে সিওর পাব জানতুম। নয়তো সারা শহর খুঁজে বেড়ানো যায় নাকি।

বোসো। ঠিকই করেছো। ঠিক সন্ধ্যের মুখে অফিস ফেরত বাসে ওঠা যায় না। তাই এখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাই রোজ। কিছু খাবে?

না। শোনো।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে রুনু। ঠিক ছিল বিয়ের আগে আমাদের দেখা হবে না। সেই শুভদৃষ্টিতে আবার। তা আজকের দেখাদেখি তো উপরি পাওনা। এসো—একটা ব্রান্ডি মেরি নাও তুমি। আমি নিচ্ছি আমার হুইস্কি—তাই দিয়ে সেলিব্রেট করি।

তা করো। কিন্তু আমি তো মদ খাইনে—

হো হো করে হেসে উঠল রবি। জিনসের ভেতর হাফসার্টের খানিকটা

গুঁজে দেওয়া। কাঁধের ওপর সরু স্ট্র্যাপে ঝোলানো ব্যাগের ভেতর তিন-চারখানা লিটিল ম্যাগাজিন, কিছু প্রুফ আর হয়তো ফ্রেদেরিকো গারথিয়া লোরকার হাফডজন অনুবাদ নিউজপ্রিণ্টে। চোখের চশমাটা ঘামে স্লিপ করছিল। হাতের আঙুলে চশমা পিছিয়ে দিয়ে রবি বলল, ব্লাডি মেরি কোন ড্রিঙ্কস্ নয় রুনু। টমেটোর রস আর—

শোন। বিয়ের পর আর এখানে তোমার আসা হবে না কিন্তু।

মাঝে মাঝে আসবো রুনু। দুজনে একসঙ্গে আসবো।

হ্যাঁ। আসবে। শুধু আমার সঙ্গে আসবে। হ্যাঁ—কেমন।

বেশতো। শোনো রুনু। পূর্ববঙ্গে আমাদের বিয়ের একটা গান শোনাই তোমায়। মাথাটা কাছে আনো। গুন গুন করে গাইছি কিন্তু—শোন—

গলাতে চন্দ্রহারো
দেখিতে বাহার লাগোরে—
বিয়ায় বাদ্দ্য বাজোরে—

বেয়ারা এসে ব্লাডি মেরি দিল আগে। তারপর জানতে চাইল, কোন্ হুইস্কি?

তুমি তো জানো ভাই। বলে রবি রুনুর দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে রুনু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যে কথা বলতে এসে ভুলে গেছি—

বোসো। বসেই বল।

বাবা সেই সকালে বেরিয়ে এখনো ফেরেননি।

চিন্তার কিছু নেই। মেয়ের বাবা তো। চাদ্দিক ঘুরতে হচ্ছে তাকে। বাড়ি গিয়ে দেখবে ফিরে এসেছেন। কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

না। তেমন নয়। তবে মায়ের সঙ্গে একটু খিটিমিটি।

এই সময় একটু অমন হয়েই থাকে রুনু।

এমন ভাবে কথা বলছ—যেন তুমি সাত মেয়ের বাবা। আমার কথাটা শোনো আগে।

এক সিপ হুইস্কি গলায় নিয়ে রবি খুব গম্ভীর হয়ে বলল, বল।

বাবা না যৌবনে একটি মেয়েকে ভালবাসতো।

সবাই বাসে।

তার সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়নি।

এমন হয়েই থাকে রুনু।

তোমারও হয়েছে নাকি!

বলে যাও।

কাল রাতে বাবা বাড়ি ফিরে বলল—তার নাকি বিয়েই হয়নি! অথচ সারা বাড়ি আমার বিয়ের জন্যে কেনা নতুন জিনিস ঠাসাঠাসি।

বসা অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠল রবি। লম্বা চেহারার মানুষ। মুখের হুইস্কি ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে পড়ে আর কি। হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে হাসি সমেত হুইস্কিটা গিলে ফেলল বটে—কিন্তু সেই গোঁজামিলে ভীষণ বিষম খেল। কাশি আর থামে না। রুনু ঘুরে ওর পাশে গিয়ে বসলো। আর মাথায় থাবা দিতে দিতে বলল, নাক চেপে ধরো। এত কি হাসির কথা বলছি? অ্যাঁ? আমরা মরছি দুশ্চিন্তায়—কোথায় আমায় হেল্প করবে—তা না—

দাঁড়াও দাঁড়াও রুনু। এই জন্যে তোমাকে আমার এত ভাল লাগে। উঃ! হাসতে হাসতে মরে যাব। অশেষ মজুমদার কাল রাতে বাড়ি ফিরে বললেন—আমি অবিবাহিত। অথচ তারই পকেটে মেয়ের বিয়ের ফর্দ। ওঃ! মরে যাব রুনু।

চুপ কর বলছি।

শুনে তোমার মা তো ক্ষেপে যাবেনই—

গেলেনও।

একদম আধুনিক কবিতার মত। ওঁকে এবার আমাদের কাগজে লিখতে বলব। জানো রুনু—লোরকা তখন নিউইয়র্কে—শীতকাল—একদিন সকালে লোরকা ঘুম থেকে উঠে—

আবার লোরকা?

ডক্টর বোস খুব সাবধানে নিজের বাড়িতে ঢুকলেন। সার্ভিস লেন দিয়ে। বাড়ি তৈরির পর এদিকটায় আসা হয়নি অনেককাল। এমারজেন্সি সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে ওপরে উঠলেন। ভেতর দিকে উঁকি দিয়ে অবাক। তার নিজের বউ ডক্টর মিসেস দীপা বসু উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেয়ে সঙ্ঘমিত্রাকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।

বক্সরুমের বেশির ভাগই জুড়ে পড়ে আছে মেডিক্যাল লিটারেচার, স্যাম্পেল আর কঙ্কাল। কোণে ঝোলানো থ্রি নট থ্রি। বুলেটের মালাটাও রুদ্রাক্ষের

মতই দেওয়ালের পেরেকে ঝুলছিল। সব খপ করে তুলে নিল ডাক্তারবাবু।

অনেকদিন আগে পরিতোষ শুনেছিল—দীপার মুখেই—এই অপদার্থ কুষ্মাণ্ডটি নাকি কোন্ কাগজে কাজ করে। প্রথমেই দৈনিক প্রভাতের অফিসে গিয়ে হাজির হল পরিতোষ।

সন্ধ্যের মুখে সেখানে ভীষণ ভিড়। টেলিপ্রিন্টারের খটাখট। কেউ হ্যা-হ্যা করে হাসছে। তারই পাশে আরেকজন মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছে।

গাড়ির পেছনের সিটে পায়ের কাছে থ্রি নট থ্রি শুইয়ে দিয়ে তবে ভাল করে গাড়ি লক করেছে পরিতোষ। আচমকা পুলিস ধরলে কিন্তু অস্ত্র আইনে চালান করে দিতে পারে।

অশেষের নাম বলতেই একজন বলল, হ্যাঁ। বিশ বছর আগে দৈনিক প্রভাত ছেড়ে দিয়ে ডেইলি শুভ-সকালে জয়েন করেন। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলেই পাবেন। বোধহয় এখন ফিচার এডিটর।

শুভ-সকালের অফিসে গিয়ে পরিতোষ তো অবাক। ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপর রাখা খোলা প্যাডের পাতা দিব্যি ফ্যানের বাতাসে ফরফর করে উড়ছে। চেয়ার ফাঁকা। অশেষের কোন কলিগই বলতে পারল না—কখন অশেষ অফিসে থাকে। তাদের মতামতগুলো অনেকটা এরকম—

কখন থাকেন বলতে পারব না।

কাল তো এই সময় ছিলেন।

লাস্ট ওকে দেখেছি পার্টিস্থ।

ফিচার যোগাড় করেন ঘুরে ঘুরে।

মেয়ের বিয়ে বলে ছুটিতে আছেন।

না না ছুটিই নেয়নি মজুমদার।

বসুন না খানিকক্ষণ, এসে যাবেন।

খানিকক্ষণ বসে থেকে ডক্টর বোস সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। দোতলার বাঁকে একদম অশেষের মুখোমুখি। পরিতোষ দাঁড়িয়ে পড়ল, শুনুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার। নিচে চলুন—

যে স্পীডে অশেষ ওপরে উঠছিল—সেই স্পীডেই সে পরিতোষের পেছন পেছন গাড়ি অব্দি নেমে এল। যেন আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

সাদা পাঞ্জাবীর ওপর মাথাটা উস্কোখুস্কো। টুকরো কাগজের ফর্দে ফর্দে বুক পকেট উঁচু। চোখের দুই কোণই লালচে। নিজে সিটে বসে বাঁ হাত দিয়ে পাশের সিটের দরজা খুলে দিল পরিতোষ। বসুন—। কাচটা তুলে দিন।

বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে।

কোথায় বৃষ্টি? নামগন্ধ নেই!

আচমকা আসতে পারে কিন্তু। বলেই খেয়াল হল পরিতোষের—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি—কেন নিয়ে যাচ্ছি—আমি ওকে নিয়ে যাবার কে?—আমার কথায় চলেই বা আসবেন কেন? —এসব কোশ্চেনে ডক্টর বোসের মন এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছিল। অথচ পেছনের সিটের পায়ের কাছেই ফুললি লোডেড্ থ্রি নট থ্রি শোয়ানো রয়েছে!

বি বা দি, বাগে নিলহাট হাউসের সামনে গাড়ি থামালো পরিতোষ। পেছনের সিটে মাথার কাছে রাখা ছাতাটা বের করল আগে। তারপর তার ভেতর ভাঁজ করা থ্রি নটকে গস্ত করে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিল। এই সময়টায় বি বা দি বাগে মানুষজন থাকেই না। স্থায়ী দোকানের বয় বাচ্চারা হাইড্রেণ্টের জলে বাসন মাজছিল। আলো বলতে করপোরেশনের হ্যালোজেন—বড় বড় রূপোলী খুটির ডগায় ঝোলানো। দরজা খুলে দিল পরিতোষ। আসুন—

প্রায় লাফ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল অশেষ মজুমদার। বেশ তিড়িং করেই। পরিতোষের মনে হল—এই লোকটা নিজের ভেতরে কোথাও একটা স্টেশনে মগ্ন হয়ে আছে। তার নিজের ভেতরের সে জায়গাটায় অশেষ এতটাই তদ্গত যে—তার এই গাড়িতে চড়ে নির্জন বি. বা. দি. বাগে আচমকাই চলে আসা—তাকে তার সে-জায়গা থেকে একদমই সরিয়ে আনতে পারেনি।

নিন্। ছাতাটা শক্ত করে ধরুন।

সঙ্গে সঙ্গে অশেষ থ্রি নট থ্রি সমেত ছাতাটা বগলদাবা করে নিল।

আসুন—বলে ডক্টর বোস পেছন দিক দিয়ে অতিকায় স্টিফেন হাউসে ঢুকতে লাগল। মার্বেলের সাহেবমূর্তি. তার পায়ের কাছে জংধরা বিকল ফোয়ারা—ফোয়ারার চৌহদ্দির বাইরেই নির্গন্ধ পাতাবাহার বসানো কাঁসার ঝকঝকে ডাবরে।

বাড়িতে বক্সরুম থেকে টোটার মালা পেড়ে আনার সময়েই পরিতোষ মনে মনে অশেষের জন্য এ জায়গাটা ভেবে রাখে। একেবারে শহরের বুকে। গাড়ি করে ফস করে যেকোনো জায়গায় বেরিয়ে যাওয়া যায় এখান থেকে। অথচ রাত আটটার পর এসব জায়গা বনের চেয়েও নির্জন। অশেষের ভেতরকার সেই মগ্ন স্টেশনটার মতই প্রায়।

স্টিফেন হাউসের কোর্ট ইয়ার্ডে এখন কোন লোক নেই। পায়ের নিচের

মার্বেল সারাদিনের ব্যবসাপাতিতে একদম ময়লা। মাথার ওপরের ঝোলানো ডুমেও আলো সামান্যই। ছাতাটা দিন—

অশেষ এগিয়ে দিতেই পরিতোষ ছাতাটা ফেলে দিল। এবার থ্রি নট থ্রি বেরিয়ে পড়ল। সার্ভিসের জিনিস। চাইনিজ অ্যাগ্রেশনের সময় পরিতোষ ডাক্তার হিসেবে ফ্রণ্টে যায় বলে রিলিজের দিন লাইসেন্স সমেত জিনিসটা রাখার অধিকার হাতে আসে তার।

ভাঁজ খুলে পুরো জিনিসটা লম্বালম্বি ধরলো ডক্টর বোস। যেভাবে সবাই গুলি চালাবার সময় রাইফেল ধরে। এক চোখ বন্ধ করে ব্যারেলের ডগার মাছিটাকে দেখার চেষ্টা। এবার শট করার আগে পরিতোষ জানতে চাইল বলুন—আমি কে ?

অশেষ মজুমদার একগাল হেসে বলল, কেন ? আপনি তো ডক্টর বোস। কি হয়েছে বলুন তো আপনার ? শুকনো শুকনো লাগছে—

উঁহু। অত ইন্টিমেট হবার মত কিছু ঘটেনি। আর এক পা এগোবেন না—

কেন ? কি হয়েছে ?

দেখছেন—আমার হাতে এটা কি এখন ?

বন্দুক।

থ্রি নট থ্রি। এর বুলেটে হাতি অব্দি রুখে দেওয়া যায়।

ওরে বাব্বা! নলটা ফেরান এদিক থেকে ডাক্তারবাবু।

উঁহু। তার আগে আপনাকে ক'টা কোশ্চেন করবো। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন অশেষবাবু

ওদিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় ?

ঠিক পারবেন। আচ্ছা—দীপার বিয়ে হয়েছে ?

না।

তাহলে আমি কে ?

আপনি একজন ডাক্তার।

দীপা আমার কে ? সঙ্ঘমিত্রা আমার কে হয় ?

কেউ না। আপনিও ওদের কেউ নয়। পৃথিবীতো আবার আগের জায়গায় চলে গেছে—

কবে থেকে বলতে পারেন অশেষবাবু ?

এই তো ক'দিন হল। আমি নিজেই ১৯৬১, ১৯৬৩ আর ১৯৬৪তে ঘুরে এলাম।

কিসে করে ঘুরে এলেন।

কেন? পায়ে হেঁটে।

ঠিক কোন্ জায়গাটায় ১৯৬৩ আছে।

ভেরি সিম্পল। চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে অরফ্যানগঞ্জ বাজারের দিকে যেতে আদিগঙ্গা ঘেঁষে ১৯৬৩ রয়েছে—অজান্তেই নল সমেত ভাঁজ করে ফেলল পরিতোষ ডাক্তার। কেমন অবস্থা?

ভাল। প্রায় সেইরকমই আছে।

আর ১৯৬৪ কোথায় আছে?

পোর্টট্রাস্টের চার নম্বর ডকে। সেখানে আগে জাহাজ ভিড়তো। এখন সেখানকার একটা বড় স্ট্রাকচার ভেঙে জাহাজী মালের ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট হচ্ছে। পাশ দিয়েই তো চক্ররেলের গাড়ি যাচ্ছে—মল্লিকঘাটের ব্রিজটা পেরিয়েই।

একবার দেখা যায়?

স্বচ্ছন্দে ডাক্তারবাবু। চলুন না বি. বা. দি বাগ থেকে চক্ররেল ধরি। একটা স্টেশন এগিয়েই বাবুঘাট। সেখানে নেমে পোর্টের জায়গার ভেতর দিয়ে খানিক পেছিয়ে এলেই ১৯৬৪ পড়ে আছে দেখবেন।

চলুন।

কাস্টমস্ হাউসের সামনে গাড়ি লক করে ফেলে রেখে দুজনে ছুট ছুট। প্রায় ফাঁকা রাতের চক্ররেল এসে দাঁড়াল। ঠিক তিন মিনিটের ভেতর ওরা বাবুঘাটে এসে নামল। তারপর জোর পায়ে দুজনেই পোর্টের জমি দিয়ে পেছনে হাঁটতে লাগল।

বাঁহাতে গোডাউনের পর গোডাউন। দুই গোডাউনের গ্যাপে গঙ্গা। তাতে গাধাবোট। লঞ্চ। কুপি ধরানো নৌকো।

অশেষ বলল, ওই যে। ওই যে একটা গোডাউন ভাঙা হয়েছে—আগের সেঞ্চুরির কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে—ও জায়গাটাই চার নম্বর। ওখানে আগে জাহাজ ভিড়তো। ওই গোডাউনে মাল থাকত। এখন ওখানে চোদ্দতলা বাড়ি হবে। ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রি শিপিং সেণ্টার হবে। ওরই পেছনে সেই ১৯৬৪ আছে।—একদম গঙ্গার গা ঘেঁষে—

কথাটা শুনেই ভেতর থেকে থির থির করে কেঁপে উঠল পরিতোষ। তখন দীপার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে রাত আটটা বেজে একাত্রশে ১৯৬৪-র সামনে

এসে দাঁড়াল। অতবড় একটা সাল—খুব কনডেন্স করেও অতিকায় কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতই গঙ্গায় গায়ে পড়ে থেকে সান্ধ্যনদীর বাতাস খাচ্ছিল—আর নিজের আঘাতের জায়গায় গোপনে মাঝে মাঝে চেটে দেখছিল। এতগুলো বছর এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ওর আর ফুটে ওঠা হবে না।

তার ভেতরেই ডক্টর বোস দেখল—সে আর দীপা লোহার রডের এক দোকান থেকে বেরোচ্ছে। দু'জনে খুব আহ্লাদ করে ছাদ ঢালাইয়ের লোহা কিনতে বেরিয়েছে। হুঁ। পি ব্লকের বাড়িটা তখনই তৈরি হচ্ছিল। সঙ্ঘমিত্রা কি হয়েছে তখন?

ডক্টর পরিতোষ বোস আরও দেখল—অশেষ মজুমদার প্রায় হুমড়ি খেয়ে ১৯৬৪ কে দেখছে।

গান সেল ফ্যাক্টরির পেছনেই গঙ্গার ওপর মধুঘাট। এরই আশেপাশে রামেকাদের গোডাউন। বিরিঞ্চিদের ডেরা। ডেরা বলতে দু'খানা টালির ঘর আর বড় একটা এজমালি উঠোন—তাতে বর্ষায় ফুল ধরে এমন একজোড়া কদমগাছ।

কাল সন্ধ্যেবেলা দেশ থেকে বউ এসেছে বিরিঞ্চির।

বাড়ির সামনে ঘোড়ারগাড়ি এসে থামতেই বিরিঞ্চি বুঝতে পারে। এই ময়না। ময়না—উঠ্। এই ময়নার মা—উঠ্। কন্ধা মেল আয়া।

কন্ধা মেল মানে বউ। কেন না ওই ট্রেনটায় করে তার বউ দেশ-গাঁ থেকে এসে হাওড়ায় নামে। তখন ময়নাদের দিকে বিরিঞ্চি সিংয়ের সব মায়া-মমতা মুছে ফেলতে হয়।

এখন সকালবেলা। বিরিঞ্চির বউ যাঁতিতে সুপুরি বেটে সারি সারি পানের পাতায় সাজাচ্ছিল। সারাদিনের পান বানিয়ে রাখছিল। বানারসী বিলকুলি পাতা। কৌটো থেকে একটা নেশালু জর্দার গন্ধ ভেসে আসছিল।

এ মুখিয়া—মখিয়া রে—এক পান খিলু?

উঠোনে ছাইগাদায় বাসন মাজতে মাজতে ময়নার মা দেখল—খুব সোহাগ করে বিরিঞ্চিকে তার বউ পান খেতে ডাকছে।

ঘরের ভেতর থেকে জবাব এল। তু খিবই ঘা বিজলি—

বিজলিকে ভাল করে দেখল ময়নার মা। বড় সাইজের বুড়িয়ে আসা এক ধাড়ি মেয়েমানুষ। হাতে পায়ে রূপোর আঙটা। গলায় তামার পয়সা দিয়ে

বানানো নেকলেশ! বাঁহাতের বাজুতে বিরাট এক উল্কি। এরই পেটে বিরিঞ্চির ছ'ছটা ছেলে। তাদেরও বিয়ে হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে। বুড়ি বয়সকালে খারাপ দেখতে ছিল না।

এ হারামজাদী ইধার আ—

বিজলির বাজখাঁই ধমকে উঠে দাঁড়াল ময়নার মা। ময়না হওয়া থেকেই তার স্বামী তাকে ফেলে চলে যায়। সেই থেকে সে বিরিঞ্চির আশ্রয়ে। তাই কোনরকম ব্যক্তিত্ব তার কোনদিন গড়ে ওঠেনি। হামে বোলতি?

তো আউর কোন্ চুড়েল কো বলতি! লে জলদি কর—

ছুটতে ছুটতে অপমানে ধ্যাবড়ানো ময়নার মা সামনে এসে দাঁড়াল।

পওয়া ভর কড়ুয়া কা তেল লে আ—যাঃ।

সর্ষের তেল? অতটা কি হবে?

নিজের হাড় হাড় পা দু'খানা বের করে দিয়ে বলল, আচ্ছাসে মালিস করকে পুরে দো ঘড়ি দাবাবি।

হামি পা টিপতে পারবনি। দাবানা হো তো আপনা মরদানা কো বোলা লিজিয়ে—

ক্যা?—বলেই তড়াক করে সেই হাফ বুড়ি উঠে দাঁড়াল—আর ছুটে এসে ময়নার গালে এক চড়। তারপর ক্যাডর ক্যাডর করে যা বলে গেল—তার অর্থ বা অনর্থ হল—আমি এ বাড়ির মালকিন—আর আমাকেই চাকরাইন হয়ে সলাহা দেনা!

সলাহা মানে পরামর্শ। ঝি হয়ে আমায় পরামর্শ দিচ্ছিস? এতবড় সাহস!

বিজলি ময়নার মায়ের চুলের মুঠি ধরে রান্নার জায়গায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল। তারপর বলল, ঢুণ্ডলে কড়ুয়া কা তেল—

ওই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে ময়নার মা তেলের শিশি খুঁজে বের করল।

একটু বাদেই দেখা গেল—বিজলি দরজায় হেলান দিয়ে বসে। দু'খানা পা ঘাগরার বাইরে অনেকটা বেরিয়ে। আর সেই পা টিপে দিচ্ছে ময়নার মা। তেল মাখিয়ে নিয়ে।

আরামে বিজলির চোখ বুজে এসেছে। উল্টোদিকের ঘরখানার মেঝেতে বসে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে সব দেখে নিচ্ছিল বিরিঞ্চি সিং। সাতসকালেই বিজলির বাঁহাতে হাতপাখা। গালে বিলকুলি পানের ঢিবলি।

ময়নার মায়ের হাত থামলেই হাতপাখার ডাঁটি সমেত বিজলি বাঈয়ের হাতখানা চালু হচ্ছে।

সব দেখে বিরিঞ্চি সিং ঘরের ভেতর থেকে দরজা ভাগ করে ভেজিয়ে দিল। দিয়ে মনে মনে বলল, একটু মেনে নে ময়নার মা। আর তো তিনটে দিন মোটে। কব্বা মেল ছাড়লেই তুই আবার পাটরানী। আভি তু ম্যাথরানী। একটু সহে যা ময়নার মা—

এমন সময় ময়না বড় এক চাঙাড়ি জিলিপি নিয়ে উঠোনে ঢুকলো। এজমালি উঠোনে একটা কুয়ো। সম্ভবত গত শতাব্দীর। কেন না তার কড়িকাঠে কোম্পানী আমলের পতাকার খোদাই। ভিড়ভাট্টার ওপর দিয়ে মাথা তুলে ময়না হেসে বলল, ঐ বড় মাঈ—জিলিপি খাবি?

একথায় রীতিমত বিরক্ত হয়ে বিজলীবাঈ মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। তাতে ময়নার কিছু এলো গেল না। কিন্তু যেই তার চোখে পড়ল—তার মাকে ওই মোটকা বুড়িটার পা টিপতে হচ্ছে—অমনি সে হাতের জিলিপির চাঙাড়ি কুয়োতলায় ছুড়ে দিয়ে বিজলীবাঈয়ের ওপর ঝাঁপ দিল।

তেরো চোদ্দ বছরের পাকানো শরীর। সালোয়ার কামিজে ঢাকা। একদম পাকা বিদ্যুৎ। পয়লা ঝোঁকেই জিলা: মৈনপুরী, থানা: মহুয়া, গাঁও: কাজলকৈলাসের সিংঘরানার এক নম্বর বাঘিনী বিজলী বাঈ পানের ডিবিয়া, হাত পাংখা সমেত ছিটকে পড়ল।

দু'হাতে চোখ দু'টো তুলে নিতো ময়না।

বাধা দিল ময়নার মা। মেয়ের গালে এক চড় কষিয়ে তাকে দূরে টেনে নিল। এ সবই হচ্ছিল নিঃশব্দে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে কাণ্ডটা দেখতে দেখতে বিরিঞ্চি বেরিয়ে এল। অমনি ময়নার মায়ের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ভয় নেমে এল।

স্বামী-স্ত্রীর ঘর গেরস্থালী পেতে বিরিঞ্চির সঙ্গে থাকলেও সে তো আর সত্যি সত্যি বিরিঞ্চি সিংয়ের বউ নয়। যেকোন সময় তাকে টেনে বের করে দিতে পারে বিরিঞ্চি। তাছাড়া এখুনি তো এগিয়ে এসে তার পাছায় লাথ কষাবে। বলবে—তুই তোর মেয়েটাকে আগে ভাগে সামলালি না কেন? তোর ছানা—তুই আগাম বুঝবিনে—!

আসলে সত্যি সত্যিই তো বিজলীবাঈ এ বাড়ির মালকিন। বিরিঞ্চি এদিককার একটা মানী মানুষ। কখনো ঘর ভাড়া বাকি ফেলবে না। এক সময় এক ডবজন ভৈসার খাটাল ছিল নিজের। দুধের দাম বাকি পড়ে যাওয়ায়

আদায় করতে পারত না। তাই না মানুষটা আজ রামেকাজীর গোডাউনে। কী দরকার ছিল তার ময়নার মায়ের মত ঝড়তি পড়তি মেয়েলোককে রাখনী রাখবার। দুনিয়ায় কি আর মেয়েমানুষ ছিল না।

ময়না তার মায়ের হাতের ভেতর চিতা হয়ে ফুঁসছিল। আর ঘেন্নায় নিজের মায়ের গায়েই থু থু দিচ্ছিল। ছেড়ে দে মা—তুই কি মা? তুই গোড় দাবাচ্ছিলি ডাইনের—আর তুই হামকে ধরে রাখছিস!

একসময় মায়ের হাত ছিটকে বেরিয়ে গেল ময়না।

আর অমনি বিরিঞ্চির বাজখাঁই গলা—এ ময়না—খুব বাড় বেড়েছিস? আমার বউয়ের গায়ে হাত?

ময়নাও পিছপাও নয়। সে ক্ষেপিয়া হয়ে বলল, কোন বউয়ের কথা বলছিস হারামি!

ময়নার এ মূর্তি কোনোদিন দেখেনি বিরিঞ্চি। তাছাড়া নিজের বউয়ের সামনে অনেক বউয়ের কথা? সে কি কথা। বিরিঞ্চি দমে গিয়ে বলল, ঘরে আয় হারামজাদি, এদিকে আয় হারামজাদি—

ময়নার মা একজায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে জানে সব মার তার জন্যে জমা হচ্ছে। তার এখন চেহারা নেই। নেই জৌলুস। নাহয় ময়নাকে নিয়ে আরও দশটা বছর মানুষটা মজে থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল না। ততদিনে তার নিজের জীবনের অনেকটাই কেটে যেত। যে লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল—তার মুখ একবারের জন্যে মনেও পড়ে না। শেষমেষ বুড়ো হয়ে গিয়ে বিরিঞ্চি নিজেই নিশ্চয়ই যোগাড়যন্তর করে ময়নার একটা বিয়ে দিয়ে দিত। একটু তর সইলো না মেয়েটার। এত সহজে মাথা গরম করে কেউ। বিশেষ করে বাজার যা পড়েছে। এক পউয়া আটা হয়ে গেছে খুচরা ১০ পয়সা।

বিজলীবাঈ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে চলে গেল। অমনি বিরিঞ্চি সিং উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। তবে রে হারামজাদী। আমারই খাবি—হামাকেই লাথ কষাবি?

তেরো চোদ্দ বছরের ময়না এখন কালো ঝলকানো বাঁশের লাঠি। সে তার এই সরকারী বাবাটার মুখোশ খুলতে রেডি হচ্ছিল।

আর আর সব ঘর থেকেও লোকজন বেরিয়ে পড়েছে কুয়োতলায়।

বিরিঞ্চিকে এগিয়ে আসতে দেখে ময়না পরিষ্কার গলায় বলল, পরশু রাতে হামাকে কি করেছিস শুয়োর? আমি না তোর মেয়ে? হামি না তোর মেয়েমানুষের মেয়ে—

বিরিঞ্চি বাঘ এক সেকেণ্ডে বিরিঞ্চি কেঁচো হয়ে গেল। তার চোখের সামনে সারা কুয়োতলা দুলে উঠল। এখন তার রামেকাজীর গুদামে যাওয়ার কথা। এই সময় ময়না রোজ দোকান থেকে জিলাপি, মুড়ি আর চা নিয়ে আসে। কিনে আনা জিনিসে নাস্তা সেরে ওরা তিনজন যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে।

আজ যে কি হল। এই হারামি। এদিকে আয়—

ধমকাতে গিয়ে বিরিঞ্চি দেখল তার নিজেরই গলা বিশেষ উঠছে না। তবু বাপের ভঙ্গীতেই বলতে লাগল, বাপ হইয়ে আদর করেছি। আদর করব না তুকে? তোর নিজের বাপ তো তোকে কোন সুহাগ করে নাই।

সে হারামিকে পাই একদিন—

মাথা গরম করিস না ময়না।

না! ঠাণ্ডা মাথায় তোর কোলে উঠে বসে থাকব?

হারামজাদা—

লে! যা ইচ্ছা কর। হামি চললাম···

একটা ভাঙা পাথরের গুঁড়োগাডার ওপর দাঁড়িয়ে ময়নার মা এতক্ষণ সব দেখছিল। সে বুঝল, ময়নার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বিরিঞ্চি উঠোন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে নিজের কুকর্মে পাতানো বাবার প্রলেপ দিয়ে গেল।

আমি পাগল হয়ে যাবো রবি। আমার বিয়ে হতে চলেছে আর বাবা বলছে তার বিয়ে হয়নি। আমায় বাঁচাও রবি।

চক্ররেলের প্রিনসেপ ঘাট স্টেশনের তারের জালের ওপাশটা সন্ধ্যের এ সময়ে রীতিমত সুন্দর। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া। রঙিন পোশাকে মানুষজন। সাদা আইসক্রিম। নিওনের ফ্লাডলাইট। কোকোরঙের চকলেট। তার ভেতর জলে প্যাসেঞ্জার লঞ্চ। ডাঙায় কু-ঝিক-ঝিক—

রবি আজ ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে। শান্ত গলায় বলল, অত ভাবনা কিসের রুনু। সবাই জানে তুমি অশেষ মজুমদারের প্রথম সন্তান। মা তো বলছিলেন —তোমার হাসপাতালের বার্থ কার্ডও আছে।

ভয় তো সেখানে নয় রবি।

ভয়?

হুঁ। বাবা যদি পাগল হয়ে যায়। যদি পাগল হয়ে ঝাঁপটাপ দেয় তাহলে?

না না। সেরকম ভিরুলেণ্ট কিছু করবেন না। কিন্তু এরকম হল কি করে ?

খুব সিম্পল লোক। বিয়ের আগের এক প্রাক্তন প্রেমিকাকে আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে যে কি হল ? কেউ বলতে পারে না।

কিছু খাইয়ে টাইয়ে দেয়নি তো ?

না না। তাঁরা সেরকম লোক নন। প্রেমিকা একজন ডাক্তার—ম্যারেড টু অ্যানাদার ডক্টর।

তাহলে ?

হয়তো এমন কোন কথা হয়েছে—যাতে নার্ভের ওপর চাপ পড়ে এই কাণ্ড।

ঠিক এই সময়ে নিজের নার্সিং হোমের টপ ফ্লোরের ক্যান্টিনে বসে ডক্টর পরিতোষ বোস পেপের স্লাইস মেশানো চিকেন স্টু খাচ্ছিল। চোখ জানলায় কলকাতার আকাশে। সেখানে কাদের এক ঝাঁক গোলা পায়রা উড়ছে। কতকাল পায়রার মাংস খাওয়া হয় না। হেলদি পায়রা ভেরি ডিলিসাস। এরকম পায়রা সে ১৯৩৯ সনে স্কুলে পড়ার সময় ধরে আনতো। মা কেটেকুটে রেঁধে দিত। ১৯৩৯-টা একবার দেখা দরকার। সেই চার নম্বর ডকে পড়ে আছে নিশ্চয়ই। ১৯৬৪, ১৯২১, ১৯৬৭-দের ভেতর গাদাগাদি করে হয়তো একেবারে তলায় পড়ে আছে।

এই যে দীপা। বোসো।

আজ অপারেশনের সময় মাস্কের ভেতর কী বিড় বিড় করছিলে বলতো ?

কিছু না।

হুঁ। তুমি বিড় বিড় করছিলে—নামতার মত।

হ্যাঁ। বোধহয় ১৯৬৪-৬৫-৬৬-৬৭—এসব হয়তো বলেছি।

কেন ? ওটা কি তোমার অপারেশনের নামতা ?

না দীপা। আমি জীবনের কয়েকটা সাল মনের নির্যাস দিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি ইদানীং।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল বোধহয় ১৯৬১-তে।

এতে আর বোধহয়ের কি আছে ? বিয়ে তো আমাদের ওই সালেই হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা আর আজ তত বড় নয়।

তার মানে ?

উঠে দাঁড়ানো দীপার দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বলল, ধর আমাদের বিয়েই হয়নি।

মানে ? তাহলে সঙ্ঘমিত্রা কে ?

আমাদের দু'জনের জ'নাশুনোর নির্যাস।

বিয়েটা তাহলে কিছু না ?

বিয়ে তো তোমার অশেষবাবুর সঙ্গেই হবার কথা।

এই বয়সে ? লরেটোতে পড়া মেয়ে কোলে নিয়ে বিয়ে !

সঙ্ঘমিত্রাকে মেয়ে না ভাবলেই পারো।

আমার ডাক্তারি পড়া—তোমার বউ হয়ে থাকা—এসবও ভুলে যাবো ?

যাবে। সময়টাকে ফিরিয়ে এনে দেখতে শেখো। দেখবে সব কত সহজ। সেদিন অশেষবাবু আমায় ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৭—এইসব দেখালেন। সময়ের সম্পর্কগুলো ছিঁড়ে মানুষজনকে আলাদা করে দেখতে শিখলাম। অশেষ মজুমদারকে সুবিচার করা হয়নি দীপা।

খোদার ওপর খোদকারী ! তুমি পুরনো সময়কে রিমেক করতে চাও নাকি ?

আমি চাইবার কে ! আপনাআপনিই তো সব হয়ে যাচ্ছে।

রবি বা রুনু দুজনেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দেখতেই পেল না—ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন মাঝবয়সী মানুষ ভূতে পাওয়া মানুষের ধাঁচে গোয়ালিয়র ঘাটের দিকেই যেন উড়ে চলেছে।

কয়েক ধাপ নেমে আসতেই সঙ্ঘমিত্রা তাকে থামালো. আর নয় অশেষ। এর পরে জল।

ওঃ ! তুমি এসে গেছ দীপা। কতক্ষণ হল ?

বাইশ বছর অশেষ !

ওঃ। খুব লেট করে ফেলেছি। এলগিনের মুখে এমন জ্যাম। সব বাস দাঁড় করিয়ে দিল। জওহরলাল যাচ্ছিলেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোয়।

তুমি হরিশ মুখার্জীতে ট্যাক্সি ধরলে পারতে।

বিধানবাবুর অর্ডারে এমন সব তোরণ হয়েছে নেহরুর জন্যে—ওপথে নেহরুকে দেখতে পাবলিকের সুবিধার জন্যে আজ বিকেল থেকেই ট্যাক্সি চালানো বারণ।

নেহরুকে বাদ দিয়ে ভারতের কথা আমরা ভাবতেই পারি না অশেষ। তাই না?

বলেছিলেন—দেশ স্বাধীন হলেই দেশ থেকে বেকারী দূর করবেন। কিন্তু আমি তো আজও কোন চাকরি পেলাম না।

পাবে। পাবে।

কবে পাবো? পেয়ে কবে তোমায় সঙ্গে বিয়ে হবে? তুমি তো ইণ্টার্নি পিরিয়ড শেষ হলেই মেডিক্যালে হাউস সার্জেন হয়ে যাবে। নাহয় ডাক্তারি সার্ভিসেও জয়েন করতে পার। কিন্তু আমি?

আমি এখুনি কোন চাকরি নেব না অশেষ। তুমি চাকরি পাওয়ায় আরও সময় পাবে।

কি রকম?—বলেই অশেষ সঙ্ঘমিত্রার কাছাকাছি এসে বসল।

আমি আরও দু'তিন বছর বিদেশে স্পেশালাইজেশন করব। কমপ্লিট হলে সেখানে—তবেই বিয়ের কথা ভাবব অশেষ। তাই একটা ভাল চাকরি বাগাবার টাইম এখনো তোমার হাতে আছে।

ওঃ!—বলেও মনে মনে অশেষ কিন্তু হাঁফ ছাড়তে পারল না। একজনের সামনে জীবন একেবারে খোলা মাঠ। কিংবা নতুন সেট। একটাও ঢেড়া পড়েনি। অন্যজনের কাছে জীবন যে কবন্ধ-প্রায়। অশেষের পক্ষে এটা একটা গ্লানি—আবার টেনশনও বটে।

ইলেকট্রিক চলে গেল বেলা দশটাতেই। অশেষ দিব্যি পেয়িংগেস্টের মত খেয়েদেয়ে পাউডার মেখে অফিস চলে গেছে ঘণ্টাখানেক। অমন স্বামীকে আর ঘাঁটায় না কৃষ্ণা। শুধু একবার বলেছে—পুরনো প্রেম এমন উথলে উঠল কেন গো!

অশেষ মজুমদার যেন অন্য কোন মহিলার স্বামী—এমন একটা দূরত্ব রেখেই জবাব দিয়েছিল—এসব নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। তবু শর্টে বলছি—প্রেম কখনো পুরনো হবার নয়।

ও বাবা! এ যে গোঁসাই বাণী বেরুচ্ছে। তা কার্ড ছাপিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ের কথা রটাবার পর বাপ হয়ে এতটা পাপ করছ কেন? মেয়ের মুখ চেয়ে আমি মা হয়ে তো পিছোতে পারব না।

যে যা ভাল বুঝবে তাই করবে এই জগতে।

তাই নাকি ?—বলে কৃষ্ণা নিজে হবু জামাইকে ডেকে সব বলেছে। বলেছে—আমার ছেলে বলতে তুমি। এমন গুণধর শ্বশুর যার—তাকে তো নিজের বিয়ের যোগাড়যন্তর নিজেই করতে হবে বাবা—

রুমু উত্তরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। ঘেমে একাকার। তবু জাগাল না কৃষ্ণা। কাজের মেয়েটি দু'দিন আসছে না। ঘরে ঘরে ধুলোর পাহাড়। নিজেই ন্যাতা নিয়ে মুছতে বসে গেল। জলের বালতি হাতে বসার ঘরে মুছতে শুরু করবে বলে সবে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে কৃষ্ণা—এমন সময় ঘরের সামনের দরজায় একটা ছায়া পড়ল।

কৃষ্ণা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। একদম অচেনা একজন মহিলা। বেশ সাজগোজ করেই এসেছেন।

আপনি ?—বলতে বলতে কৃষ্ণার মনে পড়ল—পিঠের দিকে ব্লাউজটায় একটা বড় ছেড়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে সে পিঠটা ঢেকে ফেলল।

তোমার বিয়ে হয়ে তক্ আমার নাম তুমি শুনে আসছ বোন। কিন্তু আমায় তুমি কোনোদিন দেখোনি।—বলতে বলতে মহিলা একদম অন্য কথায় চলে গেল, তোমার জন্যে কাজের লোক রাখেনি অশেষ ? এত সুন্দরী বউ তুমি—বলতে বলতে একদম কাছে চলে এসে মহিলা তার গালে একটা চুমু খেল। এবার বুঝেছো আমি কে ?

হুঁ। আমি দীপা।—হেসে বললেও মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেছে কৃষ্ণার। কাজের লোক আজ দু'দিন আসছে না—

বোন তোমার মুখখানা এত সুন্দর—একবারও তো বলেনি সেকথা অশেষ—

কি করে বলবে আপনার সামনে! দেখা হতেই নিজের মেয়ের বিয়ের কথাই ভুলে গেছে—

পাগল একদম। ও তো জানেই না—পরে হিসেব করে দেখেছি—আমি ওর চেয়ে দু'বছরের বড়। বয়সে বড় মেয়েকে বউ করে ও কিছুতেই সুখী হত না।

হয়তো সুখী হোত। বিয়ে করেই না হয় দেখতেন।

আমায় ঠেস দিয়ে কথা বোল না বোন—বলতে বলতে টকাস করে কৃষ্ণার গালে দীপা আরেকটা চুমু খেল। এই আংটিটা রাখো। রঞ্জনার বিয়েতে আমার আসা হবে কিনা তার কোন ঠিক নেই। তাই আগে ভাগে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। হাজার হোক অশেষের মেয়ের বিয়ে—

সে তো আপনি বলছেন। মেয়ের বাবা তো মেয়েকে স্বীকারই করছে না।

বিয়ের আগে, আগে ওসব পাগলামি কেটে যাবে দেখো বোন। আমি চলি—

যাবেন? কিছু একটু মুখে দিয়ে যান।

না। অন্যদিন হবে। এইতো আলাপ হয়ে গেল দুজনের।

সামনের দরজা খোলাই ছিল। দীপা যেমন এসেছিল—তেমনি চলে গেল।

ওদের বিয়ের তিন মাসের মাথায় সেদিন কলকাতায় খুব বৃষ্টি। সাউথ সিঁথিতে রবিদের বাড়িতে সব আছে। গাছ, পুকুর, পাখির বাসা, ফলের বাগান—সব। অনেক আগের বাড়ি। নেই শুধু মা। রুনু বিয়ে হয়ে এসে যেমন নতুন বউ হল—আবার বাড়ির মা-ও বটে। রবির বাবা রুনুকে খুব ভালবাসে। কিন্তু এই বৃষ্টির সকালেই রবি-রুনুতে ভীষণ ঝগড়া বাঁধলো। সামান্য কথায়। রবি বলছিল, তোমার বাবা আসেন না অনেকদিন।

বাবার কথা বোলো না। এত স্বার্থপর। বিয়ের খাটাখাটুনি সবটাই মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকল? বলে কিনা—আমি ওঁর মেয়ে নই।

মানুষটা একটু পোয়েটিক। পোয়েটরা স্ক্রিজোফেনিক হয় খানিকটা—

তাহলে কবিতা লিখলেই পারত। বিয়ে করা কেন?

আমি তো কবিতা লিখি। তাই বলে বিয়ে করা ঠিক হয়নি নাকি আমার?

তা যদি বল—খানিকটা ভুলই করেছো!—একথা মজা করেই বলল রুনু। কিন্তু মজা গিয়ে দাঁড়াল ঝগড়ায়। রবি বিশেষ ঝগড়া করতে পারে না। সে প্রথমে রেকর্ড প্লেয়ারটা ভাঙল। তারপর ভাঙল সেলাই কলটা। তখুনি রুনু কালির দোয়াত ছুড়ে ড্রেসিং টেবিলের মাঝের আয়নাটা ভেঙে দিল। তখন রবি টি. ভিটি চুরমার করতে শুরু করল।

এমন সময় পাশের বাড়ির এয়ার হোস্টেস চন্দ্রা আচমকা বেড়াতে এসেই অজান্তে টি. ভিটাকে বাঁচিয়ে দিল। এসেই বলল, রুনু বউদি—তোমার কাছে একটা চোদ্দ নম্বর ছুঁচ হবে?

আছে। কিন্তু দেব না।

কেন? কেন?

জানো না বুঝি! ছুঁচ আর রুমাল দিলে নিলে ঝগড়া হয়।

তাই ?

হুঁ।

চন্দ্রা যেমন এসেছিল—তেমনি চলে গেল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। শহরতলীর পাশাপাশি বাড়ির গাছপালার ভেতর দিয়ে। অন্যসময় ও এরোপ্লেনে ছুটোছুটি করে আকাশ দিয়ে।

এবার দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। চারদিক ভাঙা জিনিসপত্তর ছড়ানো। রবি হেসে ফেলল, আমরা ঝগড়া করছি কেন বলতো ?

তাই তো ভাবছি। কেন ?

কোন কারণ নেই কিন্তু রুনু।

সত্যি নেই। আমার মনে হয় কি জানো ?

কি ?

এই আঙটিটা যেদিনই হাতে থাকে—সেদিনই তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়।

দেখি। কোন্ আঙটিটা ?

হাতখানা রুনু রবির চোখের সামনে তুলে ধরল বাবার সেই দীপার দেওয়া আঙটি—

শ্বশুর মশায়ের ওল্ড ফ্লেম! সেই মহিলার ?

হুঁ। আমি বলি কি এটা পুকুরে ফেলে দিই—বলেই আঙটিটা খুলে পুকুরে ছুঁড়তে গেল রুনু।

আহা। থাম। দাও আমার কাছে—

তুমি কি করবে ?

বেচে যা পাব—তাই দিয়ে মাংস আনি। বাড়িসুদ্ধ সবাই খাব। অপর্ণা দোষও খণ্ডাবে। কাছাকাছি বয়সের ভাসুর রুনুকে বলল, এ বর্ষায় এখনো তো মাছ ফেলা হয়নি।

রবি বলল, তাহলে এক কাজ করি—বেচে যা আসবে তাই দিয়ে বরং মাছ ছাড়া যাক।

দিন দুই বাদে কৃষ্ণার ঠেলাঠেলিতে অশেষ মজুমদার তার মেয়ে জামাইকে দেখতে এল। বৃষ্টি মাথায় করে। বেলা তিনটে চারটে নাগাদ। ভ্যাপসা গরমের ভেতর সারা পুকুরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। আর মেঘলা

আকাশের কালচে রংয়ের একদম উল্টো—ঝকঝকে সাদা লেজ দেখিয়ে ফলুই মাছের ঝাঁক ডিগবাজি দিচ্ছিল—ঘাটলা ঘেষে।

রবি অফিসে। দোর বন্ধ করে কমু ঘুমোচ্ছিল। ছোট দেওর গিয়ে ডাকল ও বউদি। ওঠো। তোমার বাবা এসেছেন—

ঘুম চোখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বিছানায় বসে থাকল কমু। তারপর তড়াক করে নেমে দাঁড়াল। বাবা এসেছে। বাবা তো এ ক'মাসে একদিনও আসেনি। তাহলে ?

নিচে গিয়ে কমু দেখল, হ্যাঁ। তারই বাবা। নির্জন বারান্দায় একা খালি খাটটায় বসে আছে। পুকুরের দিকে তাকিয়ে।

কি দেখছ বাবা ?

চমকে ফিরে তাকাল অশেষ। তারই প্রথম সন্তান। এখন পরের বাড়ির বউ। বড় বড় ঘুমন্ত চোখ এক গোছা চুল অন্যমনস্ক মুখ বেয়ে নেমে আছে।

তোদের পুকুরে খুব মাছ—

ফলুই মাছটাই বেশি বাবা। ও হ্যাঁ—তোমাদের জামাই কাল অনেক মাছ ছেড়েছে—

অশেষ চুপ করে পুকুরের দিকে ফের তাকাল। বৃষ্টির ফোঁটার ভেতরেই মাছেরা লেজের ঘাই দিচ্ছে। বড় বড় ছেড়েছিস ?

হ্যাঁ বাবা। একটু বড় দেখে—গুণে গুণে ফেলেছে তোমার জামাই। ভাল কথা—তোমার সেই দীপা—তার দেওয়া আঙটিটা বেচে যা এসেছিল—তাই দিয়ে মাছ ছাড়া—।

কেন—ও ? বিয়েতে পাওয়া জিনিস আবার বেচা কেন ?

আঙুলে পরলেই ঝগড়া হোত খুব। তোমার জামাইও ঝগড়া করত। ভেবেছি আঙটিটা ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিই। শেষে ও বলল, দাও—বেচে দিয়ে সেই পয়সায় মাছ ছাড়ি ! উঠছ কেন ? বোস তো। আমার শ্বশুরও এখন অফিসে। বোস। চা করে আনি—

মেয়ে বাড়ির ভেতর চলে যেতেই অশেষ মজুমদার আবার পুকুরের বুকে চোখ রাখল। সারা পুকুর জুড়ে নানান জাতের মাছ বুড়বুড়ি কাটছে—রুপোলী লেজের ঘাই দিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। একসময় তার মনে হল—মাছগুলো কি তাহলে জলের নিচেও তুলকালাম ঝগড়া করছে ? কেননা জল থেকে উঠে আসা একটা অজানা শব্দ বৃষ্টির একটানা শব্দকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। এটাই বোধহয় মাছেদের ঝগড়ার আওয়াজ।